ন্যায়রত্নের নিয়তি

(উপন্যাস)

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(প্রথম সংস্করণ)

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়,
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স ;
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য দেড় টাকা

ন্যায়রত্নের নিয়তি

(উপন্যাস)

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(প্রথম সংস্করণ)

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়,
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স ;
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।
বাণী প্রেস।
১২।১, চোরবাগান লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা

পূজনীয় গ্রন্থকার মহাশয় তাঁহার এই উপন্যাসখানির ভূমিকা লিখিবার ভার আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত পুস্তকের ভূমিকা লিখিবার ধৃষ্টতা বা দুঃসাহস আমার নাই; তবে পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত আমাকে একাধিক বার আলোচনা করিতে হইয়াছে, এবং আমার ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই ইহার পরিচয়সূচক দুই একটি কথার উল্লেখ করিতে সাহসী হইলাম।

বঙ্গ সাহিত্যে গ্রন্থকার মহাশয়ের নাম সুপরিচিত, কিন্তু তাঁহার বৃহৎ উপন্যাস রচনার চেষ্টা এই প্রথম। তাঁহার এই চেষ্টা সফল হইয়াছে কি না, বঙ্গীয় পাঠক সমাজের হস্তে তাহার বিচার-ভার অর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। তিনি তাঁহার জীবনাপরাহ্নে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত এই পুস্তক প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই কুণ্ঠার কোন কারণ আছে কি না, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা, বঙ্গের রসসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায়, বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

'ন্যায়রত্নের নিয়তি' প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের, বাঙ্গলায় মুসলমান রাজত্বের অবসানকালের একটি চিত্র,—চরিত্র-চিত্র। গ্রন্থকার মহাশয় সেই সময়ের একজন নিষ্ঠাবান, ভগবদ্ভক্ত, পরোপকারী, নিঃস্বার্থপর, তেজস্বী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চরিত্র এই গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন। ন্যায়রত্নের চরিত্র আদর্শ চরিত্র। আদর্শ চরিত্র সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সমভাবে সমাদৃত, ও সম্মানিত; চিরদিনই তাহা মানব সমাজের শীর্ষ স্থানে অবস্থিতি

করিয়া সমগ্র জাতিকে সঙ্কীর্ণতার বহুঊর্দ্ধে মহত্তর কর্ত্তব্যের পথ প্রদর্শন করে। ন্যায়রত্নের চরিত্রও সেইরূপ মহৎ চরিত্র; তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি, সত্যানুরাগ, তাঁহার সংযম ও অপূর্ব্ব তেজস্বিতার পবিত্র কাহিনী আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাঁহার শোচনীয় নিয়তির কথা ভাবিয়া, পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে আমাদের চক্ষু পুনঃপুনঃ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছে; এবং কতবার মনে হইয়াছে—এই রোগকাতর, জীর্ণদেহ, দুর্ব্বল, দরিদ্র ব্রাহ্মণের হৃদয়ে যে শক্তি, যে তেজ, যে বিরাট মনুষ্যত্ব তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ মহিমায় বিরাজিত ছিল, তাহার বিন্দুমাত্র যদি আমাদের এই বিশাল সমাজ-দেহে আজ বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচণ্ড প্রভাবেও আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড এত শিথিল হইত না, মনুষ্যত্বের অভাবে দেশ এত নিঃস্ব হইত না, জাতীয় চরিত্রও এতদূর অবনত হইত না।

গ্রন্থকার মহাশয় প্রাচীন; সুতরাং তিনি যে নব্যতন্ত্রের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলাবিৎ উপন্যাস-লেখকগণের প্রবর্ত্তিত কলার অনুসরণে মনস্তত্ত্বের মনোরম বিশ্লেষণ দ্বারা 'আর্টে'র নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচারের সুরঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিয়া বঙ্গীয় যুবকসমাজের বাহবা লাভের চেষ্টা করিবেন, ইহা তাঁহার নিকট আশা করিতে পারি নাই। আজ কাল পিপে-বোঝাই উগ্র বিলাতী সুরা আর্টের 'লেবেল' আঁটিয়া আমাদের দেশের পাঠক-সমাজে যথেষ্ট আড়ম্বর সহকারেই ফেরি হইতেছে! এই জাতীয় আর্টের সহিত গ্রন্থকার মহাশয়ের পরিচয় নাই বলিয়া যদি তাঁহার নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত এই কলাকৌশলবিহীন অথচ সরল,

সুন্দর, মহত্ত্বগৌরবমণ্ডিত মানবচরিত্রের পবিত্র চিত্র বঙ্গীয় পাঠকসমাজে উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে গ্রন্থকার ও পাঠক এই উভয়ের মধ্যে কাহার দুর্ভাগ্য অধিক নিঃসন্দেহে তাহা নিরূপণ করা কঠিন।

'ন্যায়রত্নের নিয়তি' স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সম্পাদিত 'সাহিত্যে' ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল; উপন্যাসখানির শেষাংশ 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই সুরেশ বাবু অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। সুরেশ বাবুর ন্যায় নিরপেক্ষ, স্পষ্টবাদী ও রসগ্রাহী সমালোচক মহাশয় 'ন্যায়রত্নের নিয়তি'র পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া রসানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ গ্রন্থকার মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ন্যায়রত্নের চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। আমরা এখানে সেই পত্রখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"আপনি ন্যায়রত্নের নিয়তি সম্বন্ধে আমার অভিমত জানিতে চাহিয়াছেন। আমি অসঙ্কোচে লিখিতেছি, 'সাত্ত্বিকতায় ও শুচিতায়' 'ন্যায়রত্নের নিয়তি' নব্য বাঙ্গালী লেখকগণের আদর্শ হইলে দেশের ও সাহিত্যের, বিশেষতঃ, তরুণ ও তরুণী সম্প্রদায়ের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। তবে এই উচ্চ আদর্শও যে ন্যায়রত্নের নিয়তিকে লাভ করিতে পারে, এই টপ্পা-সাহিত্যের দেশে চাটনীর ও মুখরোচক চাটের সৌভাগ্য লাভ না-ও করিতে পারে, তাহা আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লেখককে বলিবার আবশ্যকতা দেখি না। ন্যায়রত্নের চরিত্র যেমন পবিত্র, তেমনই উচ্চ; তাহা সেকালের পণ্ডিতের ও ধর্মাত্মার প্রতিকৃতি।

"ন্যায়রত্নের চরিত্রে আর একটা ইঙ্গিত আছে ; তাহা যেন প্রাচীন বাঙ্গালার নব্য-বঙ্গের প্রতি গূঢ় ইঙ্গিত! এখন আমরা পড়ি ও শুনি। বড় বড় ভাবের জাবর কাটি। ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করি, কিন্তু ধার্ম্মিক হইতে পারি না ; দর্শনের অনুশীলন করি, কিন্তু জীবনে এক বিন্দু দার্শনিক সত্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না ; বড় বড় তত্ত্ব ও তথ্য ও ভাব লইয়া হাটে ফেরি করি, কিন্তু ময়রারা যেমন সন্দেশ খায় না, আমরাও তেমনই দৈনন্দিন জীবনে ভুলিয়াও সে-সকলের মর্য্যাদা রাখি না ; বরং স্বেচ্ছাসুখে পদদলিত করি। আমরা অন্যকে যাহা করিতে বলি, নিজে তাহা করি না। আপনার ন্যায়রত্ন সেরূপ 'ফ্রড্' নহেন; তিনি যে সকল সত্যের জ্ঞানসূত্রে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, জীবনে ও চরিত্রে তাহা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন; সর্ব্বস্ব পণে সেই সকলের মহিমা ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সুখদুঃখের আদর্শও বাঙ্গালীর চিন্তনীয়। এই কাঞ্চন-কৌলীন্য ও ঐহিক ভোগসুখ-পরায়ণতার যুগে ন্যায়রত্ন ঐহিক দুঃখ বরণ করিয়া এবং ঐহিক সুখকে হেলায় বর্জ্জন করিয়া যে সুখকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী যদি সে সুখের সন্ধান করে, তাহা হইলে এ দেশে 'বোল্‌সিভিজ্‌মের' প্রভাব কখনও বিস্তৃত হইতে পারিবে না, পক্ষান্তরে এই দুঃখী দেশও সুখের—সত্যসুখের মুখ দেখিতে পাইবে।"

স্বর্গীয় সমাজপতি মহাশয়ের এই মন্তব্যের পর আর কোন কথা বলা চলে না ; তবে তিনি প্রসঙ্গক্রমে 'বোল্‌সিভিজ্‌মে'র উল্লেখ করায় আর একটা কথা আমাদের মনে পড়িল ; আশা করি তাহারও উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিছু দিন

হইতে আমাদের দেশে 'অহিংস অসহযোগ' (নন্-ভায়োলেণ্ট নন্-কো-অপারেশন) প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে। যাঁহারা ইহার প্রবর্ত্তক, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগে ও স্বদেশানুরাগে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই ; কিন্তু তাঁহাদের গৌরব ক্ষুণ্ণ না করিয়াও বলিতে পারি, এই 'ন্যায়রত্নের নিয়তি' প্রকৃত অহিংস অসহযোগেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ; এবং ন্যায়রত্নের সংগ্রামক্ষত জীবন এই কঠোর সাধনায় উৎসর্গীকৃত। অবশেষে তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্তে সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার সর্ব্বজনবন্দনীয় চরণে সাফল্যের যে বিজয় অর্ঘ্য দান করিয়াছে তাহা দেবতারও প্রার্থনীয় ; এবং দেবব্রত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই জীবনব্যাপী দুষ্কর সাধনাই তাঁহার শোচনীয় নিয়তির গৌরব-সমুজ্জ্বল কণ্টকমুকুট—যাহা জগতের চিরস্মরণীয় আদর্শ মানবগণের প্রতি ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ !

মেহেরপুর, নদীয়া ;
১ বৈশাখ, ১৩৩০।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ন্যায়রত্নের নিয়তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে সময়ের ঘটনাবলম্বনে এই আখ্যায়িকার আরম্ভ, তখন হরিরামপুরের তারানাথ ন্যায়রত্নের বয়স ষাট বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা সকলেই এক একটী করিয়া তৎপূর্ব্বেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। এখন একটীমাত্র বিধবা কন্যা তাঁহার বার্দ্ধক্যের অবলম্বন; তাহার নাম সুমতি।

প্রাণাধিক পুত্র কন্যাগুলি একে একে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে, ন্যায়রত্নকে কেহ কোনও দিন সাধারণ লোকের ন্যায় শোক দুঃখে বিচলিত হইতে দেখে নাই। তাহারা অল্প দিনের জন্য এই ভব-সংসারে খেলা করিতে আসিয়াছিল, খেলা সাঙ্গ করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিয়াছে;—যিনি তাহাদিগকে

সংসার-রঙ্গমঞ্চে পাঠাইয়াছিলেন, কাল পূর্ণ হওয়ায় তিনিই তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে তাহাদিগকে টানিয়া লইয়াছেন, এই বিশ্বাসেই বোধ হয় ভগবদ্ভক্ত ন্যায়রত্ন পুনঃ পুনঃ শোকের কঠোর আঘাত ধীরভাবে সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; এবং তিনিও ইহ-জীবনের কার্য্য সমাপন করিয়া জগজ্জননীর ক্রোড়ে আশ্রয়-গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ এক দিন তাঁহার সাধ্বী পত্নী কল্যাণী দেবী সাত বৎসরের কন্যা সুমতিকে রাখিয়া, তাঁহার সংসার অন্ধকার করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। ন্যায়রত্নের একখানি পঞ্জর যেন চূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তথাপি কেহ তাঁহার চক্ষে জল দেখিতে পাইল না !

মাতৃক্রোড়চ্যুতা সুমতি কাঁদিয়া অস্থির হইল। সে এ-ঘরে সে-ঘরে মাকে খুঁজিয়া বেড়ায়, খাটুলিতে তুলিয়া তাহার মাকে যে পথে লইয়া গিয়াছিল, 'মা তুই কোথায় গেলি' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে সেই পথ ধরিয়া কত দূর চলিয়া যায়, কিন্তু মায়ের কোনও সন্ধান না পাইয়া চক্ষুর জলে বুক ভাসাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। কখনও সদর দরজায় একাকী বসিয়া মায়ের প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া থাকে, অবশেষে দুই চক্ষু জলে পূর্ণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শূন্য ঘরে ফিরিয়া আসে, মেঝেয় পড়িয়া হতাশস্বরে বলে, 'মা গো, মা !'

সাত বৎসর বয়সের মাতৃহীনা বালিকার মনের দুঃখ কিরূপ মর্ম্মান্তিক, তাহার হৃদয়ের হাহাকার কিরূপ তীব্র, তাহা আমাদের ন্যায় বয়স্ক পুরুষের অনুভব করিবার শক্তি নাই, এবং কোনও

পুরুষ লেখকের লেখনীমুখে তাহা ব্যক্ত হইবারও সম্ভাবনা নাই। তাহার খেলার ঘর অযত্নে পড়িয়া আছে; খেলিবার হাঁড়ি, পাতিল, হাতা, বেড়ি, শিল, জাঁতা ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। সুমতি আর সেখানে খেলা করিতে বসে না। পাড়ার মেয়েরাও আর তাহার সহিত খেলা করিতে আসে না। সোলার পাল্কী সাজাইয়া পুতুলের বিবাহ দিতে আর তাহার আগ্রহ নাই। তাহার পিতার সংসারের মত, তাহার খেলার সংসারও যেন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে! মা অভাবে বাবাই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছেন। সে আর এক দণ্ডও তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে না, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে বা অন্য কাহারও সহিত কথা কহিতে আর তাহার ভাল লাগে না।

সন্ধ্যা হইলে মা সুমতিকে কোলে লইয়া 'রাজা রাণী', 'সাত ভাই চম্পা', 'জীবনকাটি মরণকাটি' প্রভৃতি কত গল্প বলিয়া তাহার ঘুম পাড়াইতেন, এখনও সেই সময় মাকে মনে পড়িত এবং সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িত। অগত্যা ন্যায়রত্ন সন্ধ্যা-আহ্নিক ত্যাগ করিয়া সুমতিকে কোলে লইয়া বসিয়া থাকিতেন।

এক দিন সায়ংকালে ন্যায়রত্ন সুমতিকে কোলে লইয়া গৃহ-প্রাঙ্গনস্থিত তুলসীমঞ্চের নিকট বসিয়া আছেন। সুমতি তাঁহার বুকের উপর মুখ রাখিয়া কি ভাবিতেছে; তাহার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ভরিয়া আজ কি তুফান বহিতেছিল, তাহা কে বুঝিবে? সে তাহার প্রতিবেশীদের মুখে শুনিয়াছিল, তাহার মা মরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মানুষ মরিয়া কি হয়, কোথায় যায়, তাহা সে

জানে না, বুঝিতেও পারে না। প্রথমে সে মনে করিয়াছিল, তাহার মা অন্য কোথাও গিয়াছেন, তাহাকে ফেলিয়া অধিক দিন সেখানে থাকিতে পারিবেন না, আবার আসিয়া তাহাকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিবেন, আদর করিয়া দুধ খাওয়াইবেন, 'মাসী পিসী বনগাঁবাসী'র ছড়া বলিয়া ঘুম পাড়াইবেন; কিন্তু কৈ, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া গেল, আর ত তিনি ফিরিয়া আসিলেন না! তখনই তাহার মনে হইল, মা মরিয়া গিয়াছেন, আর ফিরিয়া আসিবেন না; কিন্তু মরিয়া কোথায় গিয়াছেন? সে কিরূপ স্থান?

বালক বালিকারা স্বভাবতঃই অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া থাকে। তাহারা বুঝিতে পারুক আর না পারুক, কোনও নূতন জিনিস দেখিলে বা নূতন কথা শুনিলে সে সম্বন্ধে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে; তাহাদের সেই সকল প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া অনেক সময়েই অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে।

আজ সুমতি তাহার পিতার বুকে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি ভাবিল; ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে সে মুখ তুলিয়া তাহার বিষাদপূর্ণ বড় বড় চক্ষু দুটি পিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, মানুষ ম'রে কোথায় যায়?"

পিতা উর্দ্ধে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "ঐ স্বর্গে।"

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল। মেদিনীমণ্ডল নৈশ অন্ধকারের কৃষ্ণ যবনিকায় সমাচ্ছন্ন। আকাশে অগণ্য নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে; কোনটি অত্যন্ত উজ্জ্বল, তাহার শুভ্র জ্যোতি জ্বল-

জ্বল্ করিতেছে ; কোনটির আলোক অত্যন্ত মৃদু, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের রশ্মির ন্যায় মিট্-মিট্ করিতেছে। সুমতি তাহার পিতাকে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি প্রসারিত করিতে দেখিয়া ভাবিল, তাহার মা ঐ নক্ষত্রলোকে গমন করিয়াছেন ! কিন্তু নক্ষত্র ত একটি নহে ; তাই সে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ নক্ষত্তরে, বাবা ?"

ন্যায়রত্ন এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন বুঝিয়া সমস্যায় পড়িলেন, কিন্তু কন্যার কৌতূহল ত দূর করিতে হইবে। এ অবস্থায় অন্যে যাহা বলিত, তিনিও তাহাই বলিলেন ; তিনি একটি সুবৃহৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ যে, যে তারাটি জ্বল্-জ্বল্ করছে, খুব বড় তারা, ঐখানে তোমার মা আছেন।"

এ উত্তরে সুমতির কৌতূহল প্রশমিত হইল না। সে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে, ঐ অত দূরে ! ওখানে মা কার কাছে আছেন, বাবা ?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "ওখানে তোমার মার এক মা আছেন ; তিনি তোমারও মা, আমারও মা, সকলেরই তিনি মা। তোমার মা তাঁরই কাছে আছেন।"

সুমতির প্রশ্ন শেষ হইল না, সে একটু ভাবিয়া বলিল, "তিনি কে বাবা ?"

ন্যায়রত্ন বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও, বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মমত লইয়া যে প্রচণ্ড বিদ্বেষ-ভাব দেখিতে পাওয়া

যায়, সেরূপ বিরুদ্ধ ভাব ও সঙ্কীর্ণতা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তাঁহার বাসগৃহের অদূরবর্ত্তী বাজারে গ্রাম্য বিগ্রহ চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কতকাল পূর্ব্বে কোন্ সাধক এই দেবীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যাইত। সুমতি কত দিন বাজারে গিয়া এই মূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছে। ন্যায়রত্ন আজ তাহাকে সেই মূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া বলিলেন, "বাজারে মন্দিরের মধ্যে যে মা আছেন, কতদিন তাঁকে প্রণাম করেছ, তিনিই ঐ নক্ষত্রে আছেন।"

সুমতি এবার জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে আর কে আছেন?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "ওখানে তোমার দাদারা আছে, দিদিরা আছে, আর তোমার সেই ছোট বোন্‌টির কথা মনে হয়,—সেই নেনা? সে-ও আছে।"

সুমতি তাহার অন্য ভাইভগিনীদের দেখে নাই, তাহার জন্মের পূর্ব্বেই তাহাদের মৃত্যু হইয়াছিল, তবে সে নেনাকে দেখিয়াছিল, এবং তাহার কথা একটু একটু মনেও ছিল; এ জন্য তাহার নাম শুনিয়াই সে ব্যগ্রভাবে বলিল, "নেনাও ওখানে আছে? মা বুঝি এখন তাকেই কোলে নিয়েছেন?"

হঠাৎ অভিমানে বালিকার চক্ষু ছল-ছল করিয়া উঠিল। সে ঊর্দ্ধে নক্ষত্রলোকে অনেকক্ষণ নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিল; যেখানে তাহার মা আছেন, দাদারা দিদিরা সকলেই যেখানে গিয়াছে, তাহার ছোট ভগিনী নেনাও যেখানে মায়ের কোলে

বসিয়া আছে—সে স্থান নিশ্চয়ই বড় সুখের স্থান! সেখানে যাইবার জন্য সুমতির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল; সে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া পিতার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল, "আমি ওখানে যাব, বাবা!"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "হাঁ, যাবে বৈ কি মা! তুমি যাবে, আমি যাব; সকলেই ওখানে যাব।"

সুমতি ব্যগ্রভাবে পিতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল, "কবে যাব, বাবা?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "মা জগদম্বা যে দিন যেতে বল্‌বেন, সেই দিন যাব; তিনি ডেকে পাঠালেই যেতে হবে, মা!"

সুমতি আর কোনও প্রশ্ন করিল না, জননীর সহিত পুনর্মিলনের আশায় সন্তুষ্ট হইয়া কত কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার পর প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সুমতি আকাশের দিকে চাহিয়া সেই নক্ষত্রটী দেখিত; সেখানে যাইতে পারিলেই মায়ের সঙ্গে দেখা হইবে ভাবিয়া সেই নক্ষত্রলোকে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু মা জগদম্বা কবে তাহাকে সেখানে ডাকিবেন, কিরূপেই বা সে অত দূরে যাইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না; তাই সে মধ্যে মধ্যে বাজারে চতুর্ভুজার মন্দিরে গিয়া দেবীমূর্ত্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া করযোড়ে একান্ত আগ্রহ-ভরে বলিত, "আমার মার কাছে আমাকে ডেকে নাও, মা! মার জন্যে আমার বড় মন কেমন করছে, আমি তাঁর কাছে যাব।"

কিন্তু দেবীর নিকট কোনও উত্তর না পাইয়া সে ক্ষুণ্ণ মনে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিত।

*　　　*　　　*　　　*

পত্নী বর্ত্তমানে ন্যায়রত্ন সাংসারিক সকল বিষয়েই নির্লিপ্ত থাকিতেন; কিন্তু পত্নী-বিয়োগের পর কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার জীবন-যাপন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল! সংসারে উদাসীন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনানিরত, ভগবৎচিন্তায় সদা-নিবিষ্ট, সংযতচেতা, মুমুক্ষু ব্রাহ্মণকে এই বৃদ্ধ বয়সে বিষ্ণুমায়ায় আচ্ছন্ন হইতে হইল! সুমতিকে চক্ষুর আড়ালে রাখিয়া তিনি এক দণ্ডও স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি বাহিরে দেখেন সুমতি, পূজা করিতে বসিয়া অন্তরে দেখেন সুমতি! সুমতি তাঁহার সকল চিন্তার স্থান অধিকার করিল। অপত্যস্নেহ তাঁহাকে এরূপ অভিভূত করিয়া তুলিল যে, সুমতির জন্য এখন তাঁহার আরও দশ বৎসর জীবিত থাকিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল। মৃত্যুর জন্য পূর্ব্বে যিনি সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত থাকিতেন, এবং বার্দ্ধক্যে জীর্ণদেহে, অবসাদখিন্ন প্রাণে যাহা তিনি জগজ্জননীর শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া মনে করিতেন—তাহাও যেন এখন তাঁহার আর তেমন শীঘ্র প্রার্থনীয় মনে হইল না। মৃত্যু কাহারও মুখাপেক্ষা করে না; হঠাৎ যদি তাঁহাকে ইহলোক হইতে চিরবিদায় লইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ-প্রতিমা, তাঁহার শেষ জীবনের একমাত্র অবলম্বন সুমতির কি উপায় হইবে, সে কোথায় কাহার আশ্রয়

লাভ করিবে, কে তাহার মুখের দিকে চাহিবে—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ন্যায়রত্ন মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতেন তাঁহার চিত্তের সংযম যেন কোথায় ভাসিয়া যাইত! অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতে একটী সুপাত্র দেখিয়া এই অল্প বয়সেই সুমতির বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য; তাহা হইলে আর প্রাণাধিকা কন্যার ভবিষ্যৎ-চিন্তায় তাঁহার অন্তিম-মুহূর্ত্ত অশান্তিপূর্ণ হইবে না।

ন্যায়রত্নের ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ, দেশপূজ্য, প্রথিতযশাঃ সুপণ্ডিতের পক্ষে সুশীলা সুন্দরী কন্যার জন্য মনের মত সুপাত্র সংগ্রহ করা কঠিন হইল না। কারণ, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বর নিলামে বিক্রয় হইত না, এবং একালের মত সেকালে একমাত্র কাঞ্চন-কৌলীন্য সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। পাত্রটী রূপে গুণে বংশ-গৌরবে—সকল বিষয়েই সুমতির 'যোগ্য বর' হইয়াছিল। শুভ দিনে শুভক্ষণে ন্যায়রত্ন শাঁখা শাড়ী দিয়া হৃষ্টচিত্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন; তাঁহার বুকের উপর হইতে দুশ্চিন্তার নিদারুণ পাষাণ-ভার নামিয়া গেল। তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। 'অষ্টমঙ্গলা'র পর শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুমতি তাঁহার নিকটেই রহিল; এবং পূর্ব্বের মত হাসিয়া খেলিয়া সময় কাটাইতে লাগিল।

মনুষ্যের অদৃষ্টাকাশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন; কাহার অদৃষ্টে কি আছে, তাহা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা কত

কি চিন্তা করি, কত সঙ্কল্প স্থির করিয়া বুদ্ধি বিবেচনা ও সামর্থ্য অনুসারে কার্য্য করি ; কিন্তু আমাদের কয়টী ইচ্ছা, কয়টী সঙ্কল্প সফল হয় ? এই জন্যই বুঝি কেবল কর্ম্মেই আমাদের অধিকার, ফল ভগবানের হাতে।

ন্যায়রত্ন অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, পাঁজি পুঁথি দেখিয়া, ঠিকুজী কোষ্ঠী মিলাইয়া সুপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলেন, ভাবিলেন—এত দিনে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন ; জীবনের অবশিষ্ট কয়টি দিন তিনি শান্তিতেই কাটাইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার মনস্কামনা পুর্ণ হইল না। কন্যার বিবাহের কয়েক মাস পরে হঠাৎ এক দিন সংবাদ আসিল, দারুণ বিসূচিকা রোগে তাঁহার জামাতার মৃত্যু হইয়াছে।—সুমতি বিধবা হইয়াছে! বিবাহের পর বৎসর না পূরিতেই দুধের মেয়ে সুমতি—স্বামী কি বস্তু তাহা না বুঝিতেই বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে বিধবা হইল নির্ম্মম কালের এক ফুৎকারে তাহার হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর, জীবনের সুখ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। হায় বিধিলিপি!

এই দারুণ দুঃসংবাদে ন্যায়রত্নের বুক ভাঙ্গিয়া গেল; শোকে দুঃখে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। ন্যায়াদি দর্শন, প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান, সিদ্ধপুরুষদিগের রচিত জীবনের অনিত্যতা-জ্ঞাপক শত শত শ্লোক ও গাথা,—কিছুই তাঁহাকে প্রবোধ দান করিতে, পারিল না। সংসারীর পক্ষে মোহের বন্ধন কত কঠিন, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া গলদশ্রুনেত্রে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, 'মা জগদম্বে! এ কি করিলে? দুধের

শিশুকে বিধবা না করিলে কি তোমার সৃষ্টিকার্য্য ব্যর্থ হইত? না, এই মহাপাপী অজ্ঞান বৃদ্ধের বুক ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার জীবনের শেষ শান্তিটুকু কাড়িয়া লইয়া তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল? তুমি ত মা চিরমঙ্গলময়ী, তবে কোন্ পাপে, জন্মান্তরের কোন্ অপরাধে, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি পুণ্য-প্রতিমা মায়ের আমার এমন দশা করিলে? সুমতির জীবনের সকল আশা, সকল সুখ চূর্ণ না করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে এই অকর্ম্মণ্য হতভাগ্য বৃদ্ধকে কেন গ্রহণ করিলে না, মা!'

ন্যায়রত্ন কেবল ছেলেটি দেখিয়াই তাহার হাতে সুমতিকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন; তাহার শ্বশুরবাড়ীতে তেমন কেহ অভিভাবক ছিল না; সুতরাং পতিবিয়োগে সুমতি নিরাশ্রয় হইল। পিতা ভিন্ন সংসারে তাহার আর কেহ অভিভাবক রহিল না; কিন্তু ন্যায়রত্নের জীবন আর কত দিন? শোকের পর শোকের কঠোর আঘাতে তাঁহার নিঃশেষিতপ্রায় জীবনের উৎস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। শোক তাঁহাকে বিহ্বল করিতে পারিত না সত্য, কিন্তু তাহার লেলিহান জিহ্বা বহ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার এক একখানি অস্থিকে অঙ্গারে পরিণত করিতেছিল;—কোন্ শক্তিতে তিনি তাহা নিবারণ করিবেন? কিন্তু তথাপি তিনি যাহা পারিতেন, অন্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব। তিনি বিস্তর চিন্তা করিয়াও যখন সুমতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তাহার নিবিড় অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ভাগ্যগগনের কোনও প্রান্তে আশার বিন্দুমাত্র

আলোকস্ফুরণ দেখিতে পাইলেন না, তখন সেই ধর্ম্মপ্রাণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 'ভগবান, মঙ্গলময় তুমি, তুমি যা কর, তাই হইবে' বলিয়া হতাশভাবে অখিলব্রহ্মাণ্ডপতির চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার করুণায় নির্ভর করিয়া তিনি অনেকটা মনঃস্থির করিলেন; শোকের কঠোর আঘাত ক্রমে তাঁহার সহ্য হইয়া আসিল। পূর্ব্বে যে ভাবে তাঁহার দিন কাটিত, সেই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। সুমতির বিবাহের কথাটা সময়ে সময়ে তাঁহার স্বপ্ন বলিয়াই মনে হইত;—কিন্তু স্বপ্ন ও সত্য একাকার হইয়া তাঁহার হৃদয়াকাশে যে বিষাদ ও নৈরাশ্যের মেঘ ঘনাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও অপসারিত হইল না।

* * * *

তারানাথ ন্যায়রত্নের অল্প কয়েক বিঘা লাখেরাজ জমী ছিল; তাহাই ভাগজোতে বিলি করিয়া তিনি প্রজার নিকট যে খাজনা ও ধান্যাদি শস্য পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। এতদ্ভিন্ন অতি নিষ্ঠাবান পণ্ডিত বলিয়া দেশমধ্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি থাকায়, অনেক সময় অনেক স্থানে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত, তাহাতেও তাঁহার দশ টাকা আয় হইত। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার শূলরোগ হওয়ায় তিনি শারীরিক অসামর্থ্যবশতঃ নিমন্ত্রণে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন; ইহাতে যদিও তাঁহার আয় অনেক কমিয়া

গিয়াছিল, কিন্তু সে জন্য তাঁহার অভাব বোধ হইত না। সুতরাং মুহূর্ত্তের জন্য কেহ তাঁহাকে অসন্তুষ্ট দেখিতে পাইত না। কোনও বিষয়ের অভাব কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত অভাব পূরণ করিতে না পারিলেই দুঃখ অনুভব করিতে হয়। ন্যায়রত্ন মোটা ভাত মোটা কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকিতেন; এতদ্ভিন্ন এ সংসারে জীবনধারণের জন্য অন্য কোনও বস্তুর প্রয়োজন হইতে পারে, এ কথা তিনি কোনও দিন চিন্তা করেন নাই। এই সকল কারণে তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারে অভাব-জনিত দুঃখের বার্ত্তা কেহ কোনও দিন শুনিতে পায় নাই।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ন্যায়রত্নের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন; গ্রামে একটি টোল ছিল, সেখানে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতেন। কিন্তু তাঁহার শূল রোগ হওয়ায়, বিশেষতঃ পত্নী-বিয়োগের পর সুমতির লালনপালনের ভার তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হওয়ায়—তিনি অনেক দিন হইতে অধ্যাপনা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই; টোলটিও উঠিয়া গিয়াছে।

সুমতি বয়ঃস্থা হইয়া সংসারের ভার স্বয়ং বুঝিয়া লইয়াছে; সুতরাং ন্যায়রত্নকে এখন আর সাংসারিক কোনও বিষয়ের জন্য চিন্তা করিতে হয় না। পূজার্চ্চনায় দিবসের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিয়া যে সময়টুকু অবশিষ্ট থাকে, সে সময় তিনি লেখাপড়া করেন; কখনও সুমতিকে লেখাপড়া শিখাইয়া থাকেন। ক্রমে এই শেষোক্ত কার্য্যেই তাঁহার অধিকাংশ

সময় ব্যয়িত হইতে লাগিল। ইহাই তিনি জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

সুমতি ক্রমে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই অল্প বয়সেই সে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ সুন্দররূপে আয়ত্ত করিল। ন্যায়রত্ন অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের একখানি টীকা লিখিতেছিলেন; এখন তাহা আর তাঁহাকে স্বহস্তে লিখিতে হয় না; তিনি মুখে বলিয়া যান, সুমতি তাহার সুন্দর হস্তাক্ষরে পরিশুদ্ধরূপে তাহা লিপিবদ্ধ করে।

ন্যায়রত্নের সুশিক্ষায় স্নেহময়ী কন্যার কঠোর বৈধব্য-জীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে এইরূপে শান্তি ও সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ন্যায়রত্ন তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, ভগবান তাঁহাকে পুনর্ব্বার অতি কঠোর পরীক্ষায় ফেলিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মোগল সাম্রাজ্যের অবসানকাল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তারানাথ ন্যায়রত্নের নিবাস হরিরামপুর গ্রামে। এই গ্রামখানি যে পরগণার অন্তর্গত, তাহার নাম ছিল—পরগণে এলামসাহী। বিজয় দত্ত নামক

এক জন ধনাঢ্য কায়স্থ নবাব সরকারে অনেক টাকা নজর সেলামী দিয়া, এবং বিস্তর টাকা আমলা-খরচ করিয়া সমগ্র এলামসাহী পরগণা বে-মেয়াদী ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। হরিরামপুর সাধারণ পল্লীগ্রাম হইলেও ভাগিরথী-তীরে অবস্থিত বলিয়া এই নূতন তালুকদারের সদর কাছারী এই গ্রামেই সংস্থাপিত হইয়াছিল।

এই মহাল বন্দোবস্ত করিয়া লইতে বিজয় দত্তের বিস্তর টাকা ব্যয় হওয়ায়, তালুকস্থ প্রজাগণের নিকট পড়তা করিয়া সেই টাকা আদায় ও নিরিখবৃদ্ধি করিয়া দশ টাকা আয়বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে তিনি মহালে আসিয়াছেন। বিজয় দত্তের স্ত্রী মহামায়া ও কন্যা সত্যবালা তাঁহার সঙ্গেই আছেন।

তালুকদার মহালে আসিয়াছেন—প্রজারা দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকট দরবার করিতেছে।—কাহারও জমীর দরবার, কাহারও খাজনাহ্রাসের দরবার, কাহারও ছেলে বেকার বসিয়া আছে, তাহার জন্য একটী চাকরীর দরবার; সমস্ত দিনই দরবার চলিতেছে। কাছারী-বাড়ী দিবারাত্রি সরগরম।

তারানাথ ন্যায়রত্নের কোনও দরবার নাই, এ জন্য তিনি তালুকদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান নাই। বিজয় দত্ত ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং 'তারা ঠাকুর কত বিঘা লাখেরাজ ভোগ করে, তাহার কোনও সনন্দ আছে কি না'—এই প্রসঙ্গ লইয়া কাছারীতে একটু আধটু আলোচনাও চলিয়াছে। মোসাহেবের দল জমীদারদের অপরিহার্য্য বাহন; সুতরাং

বিজয় দত্তেরও চাটুকারের অভাব ছিল না, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাহারা তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ স্বার্থসিদ্ধির আশায় তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া ছিল। তারা ঠাকুরের লাখেরাজের প্রসঙ্গ উঠিলে, প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তাহাদের এক জন, পার্শ্বস্থ অন্য এক জনকে, সম্বোধন করিয়া বলিল, "কেমন হে রায় মশায়! তারা ঠাকুরের কোনও সনন্দ থাকার কথা তোমার স্মরণ হয় কি? আমার ত স্মরণ হয় না।"

রায় মশায় মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিল, "সনন্দ থাক না থাক, এত বেশী জমী কখনও যে তার দখলে ছিল, এ ত বাপু, আমার বিশ্বাস হয় না।"

তৃতীয় মোসাহেব 'বিশ্বাস মশায়' একটু দূরে বসিয়া ছিল, সে মাথা উচু করিয়া বলিল, "এত বেশী জমী কোনও কালেই তার দখলে ছিল না, এ কথা আমার শুনা আছে; আর বিলক্ষণ জানাও আছে। তারা ঠাকুর, কি ব'লে—'ক্রেমশো' বাহু গিল্‌তে গিল্‌তে হাত গিলেছে! খালের জমী ঠেলে বার করে নিজের দখল বিস্তর বাড়িয়ে নিয়েছে। ঠাকুরের কি 'নিষ্টে'!"

'ঘোষ মশায়', আর একটী পারিষদ, সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "জমী হলেই হ'লো? তারা ঠাকুরের জমীর মত জমী এ 'তল্লাটে' আছে? জমী নয় ত যেন সোনার খনি! বিঘেয় বিঘেয় সোনা ফলে। (মুহূর্ত্তকাল নীরবে মাথা চুল্‌কাইয়া) এ জমী বাজেয়াপ্ত ক'রে নিলে সরকারের যদি বিলক্ষণ দশ টাকা আয় না হয় ত আমি কায়েৎ-বাচ্চাই নই!"—প্রস্তাবটা

প্রভুর মনের মত হইয়াছে কি না বুঝিবার জন্য সে সতৃষ্ণনেত্রে একবার বিজয় দত্তের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু বিজয় দত্ত বড় চাপা লোক ; তাঁহার মুখ দেখিয়া এই ঘোষ মোসাহেবটী প্রভুর মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না।

তালুকদার প্রজার নিকট তাঁহার নজর-সেলামীর টাকা আদায় করিবেন, এবং নিরিখ বৃদ্ধি করিয়া আয় বাড়াইবেন। গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণকে হস্তগত করিয়া তাহাদের সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে সকল দিকেই সুবিধা হইতে পারে—চতুর বিজয় দত্ত ইহা ভালই জানিতেন। তিনি এই সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া সন্ধান লইতেছিলেন, এ গ্রামের প্রধান ব্যক্তি কে, কাহারই বা প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনি বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন, গ্রামস্থ প্রজাবর্গের মধ্যে তারানাথ ন্যায়রত্নের সম্মান ও প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিয়া থাকে। সুতরাং তিনি এই বিষয়-বুদ্ধিহীন, সরল ব্রাহ্মণপণ্ডিতটীকে হস্তগত করাই সর্ব্ব-প্রথম কর্ত্তব্য মনে করিলেন। মোসাহেবের দল তাঁহার মনোরঞ্জনের অভিপ্রায়ে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি সে সম্বন্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ন্যায়রত্ন না কি খুব বড় পণ্ডিত ?'

অদূরে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন ; তাঁহারও কি একটা দরবার ছিল। তিনি উত্তর করিলেন, 'ন্যায়রত্নের সমকক্ষ মহা-

পণ্ডিত আমাদের এ প্রদেশে আর দ্বিতীয় নাই! বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রেই তিনি অসাধারণ পারদর্শী; তথাপি তাঁহার বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নাই। তাঁহার লোভ নাই, ক্রোধ নাই, হিংসা নাই। তাঁহার ন্যায় পরোপকারী, ধার্ম্মিক, ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা আমি কুত্রাপি দর্শন করি নাই।'

তালুকদার বলিলেন, 'বটে! গ্রামের সকল লোক তাঁর খুব খাতির করে?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'খাতির! তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করে। গ্রামে তাঁহার অসীম প্রতিপত্তি!'

তালুকদার বলিলেন, 'গ্রামে প্রজাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ হ'লে তারা কাজি সাহেবের কাছে নালিশ না ক'রে তাঁরই কাছে না কি বিবাদ নিষ্পত্তি করতে যায়?'

ব্রাহ্মণঠাকুর সোৎসাহে বলিলেন, 'যদিস্যাৎ গ্রামে প্রজাবর্গের মধ্যে কোনও বিবাদ-বিসংবাদ সংঘটিত হয়, সে ক্ষেত্রে ন্যায়রত্ন মহাশয়ই মধ্যস্থতাবলম্বনপূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়া থাকেন; কাজি সাহেবের সকাশে উপস্থিত হইয়া অভিযোগ-উত্থাপনের আবশ্যকতা প্রায়ই কেহ অনুভব করে না।'

তালুকদারের অন্যতম মোসাহেব ঘোষনন্দনটি ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া চটিয়া বলিল, 'সোজা কথায় জবাব দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়? তোমাদের বামুনপণ্ডিতগুলোর দোষই ঐ, সাধুভাষা ছাড়া তোমরা কথা বল্‌তে পার না! অত বিদ্যে জাহির করা কেন হে বাপু?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'রাজা স্বয়ং ভগবানের অংশ ; ভগবানের বিভূতি রাজদেহে বর্ত্তমান। বিস্তর সৌভাগ্যে রাজদর্শন হয় ; তাঁহার সহিত বাক্যালাপে যদ্যপি সাধুভাষার প্রয়োগ না করিব, তবে কি ডোমের সহিত সাধুভাষায় আলাপ আপ্যায়ন করিতে হইবে ?'

কিন্তু এ সকল বাক্‌বিতণ্ডায় তালুকদারের লক্ষ্য ছিল না। তিনি তখন ভাবিতেছিলেন, ন্যায়রত্নকে কোনও কৌশলে হস্তগত করিতে পারিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।—কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিলে ন্যায়রত্নকে বশীভূত করিতে পারা যায়, তাহাই তিনি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু অন্যে তাঁহার মনের ভাব জানিতে বা বুঝিতে পারিল না। এই সকল গুরুতর বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি তাঁহার প্রসাদভিক্ষু নির্ব্বোধ মোসাহেবগণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহার গুপ্তসঙ্কল্প অপদার্থ ও অসার চাটুকারগণের নিকট প্রকাশ করিয়া মন্ত্রগুপ্তির উপযোগিতা নষ্ট করিবেন,—বিজয় দত্ত এরূপ বিষয়-বুদ্ধি-বর্জ্জিত অন্তঃসারশূন্য লোক ছিলেন না। নতুবা তিনি বহু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে বুদ্ধির যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তাহাদের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নবাব সরকার হইতে সুবিস্তীর্ণ এলামসাহী পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন না।

এক দিন অপরাহ্নে তালুকদার কন্যা-সমভিব্যাহারে হাতীতে চড়িয়া নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। হাতীর সম্মুখে ও পশ্চাতে মাথায় লাল-পাগ্‌ড়ী বাঁধা লাল-কুর্ত্তিধারী বিস্তর পেয়াদা !

ন্যায়রত্নের বাড়ীর নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত একবার দেখা করিবার ইচ্ছা হওয়ায়, তালুকদারের ইঙ্গিতে মাহুত হাতীকে সেইখানে দাঁড় করাইল। হাতী পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন শুণ্ড আস্ফালন করিতে লাগিল। পেয়াদার দল তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া হাতীর চারি দিকে একটা ব্যূহ রচনা করিল! পাড়ার ছেলের দল পেয়াদার ভয়ে হাতীর নিকটে যাইতে না পারিয়া কিছু দূরে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল। তাহারা হাতীর দিকে চাহিয়া চাপা গলায় নানা কথার আলোচনা করিতেছিল; হঠাৎ একটা উলঙ্গ ছোট ছেলে তাহার দিদির কোলের কাছে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—

'হাতী তোর গোদা গোদা পা,
আমাকে চড়িয়ে নিয়ে যা!'

বালকের কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র দুই তিন জন পেয়াদা লাঠী তুলিয়া সরোষে সেই শিশু-ফৌজের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাদের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া বালকের দল হুড়ামুড়ি করিয়া পরস্পরের ঘাড়ে পড়িতে পড়িতে দশ হাত দূরে গিয়া দাঁড়াইল। যে বালক তাহাকে 'চড়িয়ে নিয়ে' যাইবার জন্য হাতীকে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহার দিদি তাহার গালে 'ঠাস্' করিয়া এক চড় মারিয়া তাহার 'ডানা' ধরিয়া টানিতে টানিতে সকলের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল, এবং সেই নিরাপদ স্থান হইতে হাতীর 'হাওদার' লাল ঝালরের বাহার দেখিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রামের কয়েক জন বৃদ্ধ অদূরবর্ত্তী চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পাশা খেলিতে খেলিতে ডাবা হুঁকায় তামাক টানিতেছিল ; তালুকদার হাতীতে চড়িয়া ন্যায়রত্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া তাহাদের পাশা খেলা ও তামাকটানা উভয়ই বন্ধ হইয়া গেল ! এই প্রসঙ্গে তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল।

এক জন চণ্ডীমণ্ডপ হইতে মস্তক প্রসারিত করিয়া পথি-প্রান্তস্থ হাতীর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিল, 'গরিব বামুনের বাড়ীতে তালুকদারের পদার্পণ !—আর কারও ভাগ্যে কোন কালে এত সম্মান ঘটে নি ; ন্যায়রত্নের পরম সৌভাগ্য!'

আর এক জন বলিল, 'ন্যায়রত্ন কি তোমার আমার মত মানুষ ? তিনি গরিব হ'লে কি হয়, কত বড় পণ্ডিত লোক ! দেশজোড়া মান। শাস্তরেই ত আছে—'স্বদেশে পূজ্যতে রাজাং বিদ্বানং সর্ব্বত্রং পূজ্যতে।' বিদ্বান 'ব্যেক্তি'র পূজো সকল লোকেই ক'রে থাকে। সাধে কি আমার শঙ্করাকে টোলে দিয়েছিলাম ? কি করবো, টোলখানা উঠে গেল ! তা ন্যায়-রত্নের মত মানী লোকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তালুকদার যদি তাঁর বাড়ীতে আসেন, তাতে তালুকদারেরই 'সৌজন্যতা' 'প্রেকাশ' হচ্ছে, কি বল জয়চন্দোর !'

জয়চন্দ্র নামধারী বৃদ্ধটি মাথা নাড়িয়া মুরুব্বিয়ানা প্রকাশ-পূর্ব্বক বলিল, 'আরে, রেখে দাও তালুকদারের 'সৌজন্যতা !' তাঁর সৌজন্যতা সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি কোনও ফয়তা না দেওয়াই

ভাল। আমরা ভাই আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমাদের আবশ্যক? তবে কথাটা যখন তুল্লে, তোমাদের কাছে বল্‌তে দোষ নেই—সে দিন তালুকদারের কাছারিতে ন্যায়রত্নের জমীজমা সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হচ্ছিল, তা শুনে কিন্তু গরিব ব্রাহ্মণের জমী কয় কুড়ার দশায় কি দাঁড়ায়—কিছু বলা যায় না।’

ন্যায়রত্নের গৃহপ্রান্তবর্ত্তী পথে এত সমারোহ—ন্যায়রত্ন তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই; তিনি তখন তাঁহার বাসগৃহের ‘পিঁড়া’য় বসিয়া সুমতিকে ‘কুমারসম্ভবে’র একটি কঠিন শ্লোকের ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিতেছিলেন। অল্প দিন পূর্ব্বে সুমতি ‘রঘুবংশ’ শেষ করিয়া ‘কুমারসম্ভব’ আরম্ভ করিয়াছে।—হঠাৎ ন্যায়রত্ন সংবাদ পাইলেন, তালুকদার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া পথে প্রতীক্ষা করিতেছেন! ন্যায়রত্ন এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র কন্যার অধ্যাপনা বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তালুকদার হাতী হইতে নামিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া তাঁহারই বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তালুকদার সম্মুখে সেই গৌরবর্ণ, প্রশস্তললাট, প্রসন্নবদন, ব্রহ্মণ্যতেজোমণ্ডিত, দীর্ঘদেহ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইনিই ন্যায়রত্ন; তাঁহাকে তাঁহার নিকট পরিচিত করিবার আবশ্যক হইল না। তালুকদার সর্ব্বজন-সমক্ষে দণ্ডবৎ হইয়া ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিলেন; সত্যবালাও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। দর্শকগণ প্রশংসমান-নেত্রে তালুকদারের এই বিনয়-নম্র উদার ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া একবাক্যে সাধুবাদ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ন্যায়রত্ন দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া, 'কল্যাণমস্তু' বলিয়া তালুকদার ও তালুকদার-নন্দিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; তাহার পর সস্নেহে সত্যবালার হাত ধরিয়া তাঁহার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তালুকদার তাঁহার দেহরক্ষী বরকন্দাজগণকে পথি-প্রান্তে অপেক্ষা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া ন্যায়রত্নের অনুসরণ করিলেন। ন্যায়রত্ন সত্যবালা সহ গৃহপ্রাঙ্গনে পদার্পণ করিতে না করিতে স্মৃতি আসিয়া সত্যবালাকে পরমসমাদরে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ন্যায়রত্ন তালুকদারকে লইয়া তাঁহার বাসগৃহের পিঁড়ায় উঠিয়া ব্যগ্রভাবে একখানি কম্বল বিছাইয়া দিলেন।

এই কম্বলখানি ন্যায়রত্ন মহাশয় কত কাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না! বহুকাল ধরিয়া শীত-গ্রীষ্মে সমভাবে ব্যবহারের ফলে কম্বলের লোমগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে; সূত্রগুলি যেন পরস্পর বিবাদ করিয়া পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে! ইহার উপর কম্বলের তিন চারি স্থান ছিঁড়িয়া গিয়া, তলার মাটী দেখা যাইতেছে! কোনও সংসার-জ্ঞান-সম্পন্ন গৃহস্থ—সে যতই দরিদ্র হউক, কোনও ভদ্রলোকের অভ্যর্থনার জন্য, এই জীর্ণ, ছিন্ন, অব্যবহার্য্য কম্বল বাহির করিতে লজ্জিত হইত; 'দেশের রাজা' তালুকদারের অভ্যর্থনা ত দূরের কথা! কিন্তু বিষয়-জ্ঞান-বর্জ্জিত, অভাব-বোধে অনভ্যস্ত ন্যায়রত্ন এ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার! তিনি বলিলেন, 'আমার ন্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে ভবাদৃশ দিক্‌পালতুল্য ব্যক্তির শুভাগমন,

আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়; কিন্তু আপনাকে বসাইতে পারি, সেরূপ আসন ত আমার ঘরে নাই। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই কম্বলখানিতে আসন গ্রহণ করুন। দেখুন, ভগবান্ মরীচিমালীর সর্ব্বত্র-প্রসারিত রশ্মিজাল কেবল যে সরোবরের বিকশিত কমলদলেই নিপতিত হইয়া তাহাকে উৎফুল্ল করে, এরূপ নহে, দরিদ্র কৃষকের জীর্ণ কুটীরের বিবর্ণ পর্ণরাশিকেও তাহা উপেক্ষা করে না।'

তালুকদার হাসিয়া বলিলেন, 'আপনি মহাপণ্ডিত, এই কবিত্বপূর্ণ উপমাটি আপনার মুখেই শোভা পায়; কিন্তু আমার মত নগণ্য ব্যক্তি এ উপমার যোগ্য নহে।—আমি শূদ্র, আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের দেবতা। এ কম্বলখানি নিশ্চয়ই আপনার আসন; আমি শূদ্র হইয়া ভূদেব ব্রাহ্মণের আসনে বসিব ?—এরূপ আদেশ করিয়া আপনি আমাকে অপরাধী করিবেন না।'

এই কথা বলিয়া তালুকদার ন্যায়রত্নকে সেই কম্বলের উপর বসাইয়া স্বয়ং মাটীতে বসিয়া পড়িলেন, এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিভরে তাহা কণ্ঠে, ওষ্ঠে ও মস্তকে স্পর্শ করিলেন।

তালুকদারের কি ব্রাহ্মণভক্তি, কি নিষ্ঠা, কি অমায়িক ব্যবহার! ন্যায়রত্ন মুগ্ধ হইলেন; সরল ব্রাহ্মণ পুলকিতচিত্তে বলিলেন, 'ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার অকপট ভক্তি দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, ধর্ম্মে যেন আপনার মতি থাকে;—ইহা অপেক্ষা বড় আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।'

তালুকদার বলিলেন, 'আমিও আর কোনও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি না। ঐ আশীর্ব্বাদই করুন, যেন দেব-দ্বিজে আমার অচলা ভক্তি থাকে, ধর্ম্মে যেন মতি থাকে।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন; 'কালমাহাত্ম্যে এখন ধর্ম্ম আর অর্থ একাধারে প্রায়ই দেখা যায় না। যাহার অর্থ আছে, যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ,—কালের এমনই বিচিত্র প্রভাব যে, ধর্ম্মকর্ম্মে তাহার মতিগতি নাই; সে অহোরাত্রি সুখ ও স্বার্থের সন্ধানেই ব্যস্ত!'

তালুকদার বলিলেন, 'আপনি অসঙ্গত কথা বলেন নাই; কিন্তু আমি জানি, ধর্ম্মই মনুষ্য জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। নিজের কথা এ পাপ-মুখে কি আর বলিব? আমি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কাশী গয়া গিয়াছি, ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিয়াছি, বাড়ীতে কথকের কণ্ঠে রামায়ণ, মহাভারত শুনিয়াছি। অধিক কি, ব্রাহ্মণের পাদোদক পান এবং ভগবদ্গীতা পাঠ না করিয়া আমি কখনও জলগ্রহণ করি না।'

ন্যায়রত্ন সোৎসাহে বলিলেন, 'সাধু সাধু! আপনার কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে। দেব-দ্বিজে ভক্তি-প্রদর্শন অতি প্রশংসার্হ, সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনার পক্ষে কেবল তাহাই ত যথেষ্ট নহে। আপনি এখন আমাদের ভূস্বামী, রাজা; প্রজাপালনই যে আপনার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম—এ কথা আপনাকে স্মরণ রাখিতে হইবে। আপনাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে হইবে। তাহাদের যে সকল অভাব অভিযোগ আছে, তাহা ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া আপনাকে তাহার

প্রতীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আপনি ইহ-জীবনে আত্মপ্রসাদ ও পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ-সুখের অধিকারী হইবেন।'

তালুকদার হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'প্রজাপালন যে আমার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা আমি জানি, কিন্তু—'

ন্যায়রত্ন তালুকদারের আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'কিন্তু—কি বলুন? আমার নিকট আপনার কোনও কথা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই।'

তালুকদার মুহূর্ত্ত কাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'আপনাকে একটি কথা বলিতে আমার বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই কথাটি রাখেন ত—'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'প্রজার হিতার্থ আপনি আমাকে যাহা বলিবেন—আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।'

তালুকদার বলিলেন, 'ঠাকুর, আপনাকে আমি অধিক আর কি বলিব, এই তালুকখানি ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে আমার বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে। নবাব বাহাদুরকে নজর-সেলামী দিতে হইল, সে বড় সহজ ব্যাপার নহে! তাহার পর ঘুষ,—আমলাদের ঘুষ, চাকরবাকরদের ঘুষ। আপনি ত নবাব-সরকারের কাণ্ডকারখানা কিছু জানেন না, সেখানকার মশাটি, মাছিটি পর্য্যন্ত ঘুষ খাইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ শুঁড় বাহির করিয়া বসিয়া থাকে!'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'এত ঘুষ দিলেন কেন?'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তালুকদার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, 'ঘুষ দিলাম কেন! ঘুষ না দিলে কি কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিতাম? প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত করিয়া এই পরগণা হস্তগত করিতে পারিতাম? ঘুষের বলেই ত আমি অন্য সকলকে বঞ্চিত করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি। কিন্তু এই বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া আমি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি। এখন তালুকের প্রজারা 'ভাঙ্গনি' করিয়া এই টাকাটা আমাকে উঠাইয়া দিলে—দশের লাঠী একের বোঝা—তাহা তাহাদের গায়েও লাগিবে না, অথচ আমি বজায় থাকিতে পারিব।'

ন্যায়রত্ন সবিস্ময়ে বলিলেন, 'ঘুষের টাকার ভাঙ্গনি!'

তালুকদার চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, 'নবাব বাহাদুরকে যে টাকা নজর দিয়াছি, তাহা ত আর ঘুষ নয়। আমিও ত প্রজাদের নিকট নজর পাইবার দাবী করিতে পারি।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আপনি ভূস্বামী, রাজা; মহালে আসিয়াছেন; আপনার সম্মানরক্ষার্থ প্রজারা, যাহার যেমন সাধ্য, অবশ্যই আপনাকে নজর দিবে। কেনই বা না দিবে? কিন্তু নজরের ত 'ভাঙ্গনি' হয় না।'

তালুকদার বলিলেন, 'সে যাহা হয় হইবে; কিন্তু প্রজারা যে নিরিখে খাজানা দিয়া আসিতেছে, তাহা কিছু বাড়াইয়া না দিলে আমার মালগুজারির সংস্থান হইবে না।'

ন্যায়রত্ন কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'রাজার জমী প্রজারা আবাদ করিয়া ফসল উৎপন্ন করিয়া লয় বলিয়া পূর্ব্বে

রাজারা উৎপন্ন ফসলের অংশ পাইতেন। তাহাকে রাজভাগ বলিত, এবং প্রজারাও স্বেচ্ছায় তাহা প্রদান করিত।'

তালুকদার হাসিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর! সে কালের সঙ্গে এ কালের তুলনা! সে কাল কি আর আছে?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'এখন সেই রাজভাগ খাজানা নাম ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে আদায় হইতেছে। যখন যে তালুক-দার আসেন—তিনিই চান কেবল খাজানা—আর খাজানা! কিন্তু প্রজারা বৈশাখের রৌদ্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জমী চাষ করে; শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারা মাথায় ধরিয়া ফসল উৎপন্ন করে। রাজার খাজানা দিয়া তাহাদের থাকে কি? এ সকল কথা ত কোনও তালুকদারকেই চিন্তা করিতে দেখি না! বর্দ্ধিত হারে খাজানা দিতে না পারিলে, এক জনের পিতৃ-পিতামহের আমলের বহুদিনের ভোগদখলী জমী অবাধে কাড়িয়া লইয়া অপরকে বিলি করিয়া দিতেও অনেক তালুকদার ইতস্ততঃ করেন না। তবে আপনার যেরূপ ধর্ম্মভাব দেখিতেছি, তাহাতে আপনি নিশ্চয়ই সে প্রকার নিষ্ঠুরের কার্য্য করিবেন না বলিয়াই আমার ধারণা হইতেছে।'

তালুকদার বলিলেন, 'সে রকম কাজ করিবার আমার আদৌ ইচ্ছা নাই; তবে কি জানেন? প্রজার নিকট এখন যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে নবাব-সরকারের মালগুজারির টাকার সংস্থান হইবার আশা নাই; কাজেই ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া আমাকে নিরিখ-বৃদ্ধি করিতেই হইবে। আপনার

নিকট আমার একান্ত অনুরোধ, এই বিষয়ে আপনাকে আমায় কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে হইবে। প্রজারা আপনাকে যেরূপ খাতির সম্মান করে, সকলেরই আপনি যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র, —আপনি একটা মুখের কথা বলিয়া দিলে আমাকে এ জন্ত বিন্দুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না।'

*　　　*　　　*

দাওয়ায় বসিয়া ন্যায়রত্নের সহিত তালুকদারের যখন এই সকল কথা হইতেছিল, সেই সময় সুমতি ও সত্যবালা ঘরের মধ্যে বসিয়া পরস্পর আলাপ-পরিচয় করিতেছিল।

সুমতি ও সত্যবালা সমবয়স্কা, উভয়েই পরমা সুন্দরী; কিন্তু সত্যবালা বসন-ভূষণে সমলঙ্কৃতা; আর সুমতি নিরাভরণা, মলিন-বসন-পরিহিতা। সত্যবালা সধবা; সুমতি বিধবা,—স্ফটিক-গোলকমণ্ডিত উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকের পাশে সে যেন শুভ্র স্বচ্ছ মেঘে সমাচ্ছাদিত পূর্ণকলা শশধর!

সত্যবালা বাল্যকাল হইতেই দাসদাসীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, আদর-যত্নে লালিত পালিত হইয়াছে। সুমতির সাংসারিক অবস্থা সত্যবালার অতি শোচনীয় বোধ হইল। সত্যবালা দেখিল, ন্যায়রত্নের বাড়ীতে একখানির অধিক বাসের ঘর নাই! ঘরে খাট নাই, চৌকি নাই, একটি বাঁশের মাচার উপর একটি

জীর্ণ মলিন বিছানা জড়ান রহিয়াছে। তৈজসপত্রের মধ্যে—পিতল কাঁসার নিতান্ত সাধারণ কয়েকখানি থালা, বাসন, আর ঘটী, বাটি! শিকায় কয়েকটি মাটীর হাঁড়ি ঝুলিতেছে। সম্পত্তির মধ্যে—উঠানে কয়েকটি ছোট ছোট গোলায় ধান ও ডা'ল থন্দ রহিয়াছে!

সুমতির সিমন্তে সিন্দুরবিন্দু নাই দেখিয়া, এ কথা সে কথার পর সত্যবালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার এ দশা কত দিন হয়েছে?'

সুমতি বলিল, 'নিতান্ত ছেলেবেলা, ন' বছর বয়সে!'

সত্যবালা ভাবিল, সুমতির মত দুঃখিনী এ সংসারে বুঝি আর কেহই নাই।

এবার সুমতিও সত্যবালাকে তাহার বরের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

সত্যবালা বলিল, 'আমার বাবার ত আর কোনও ছেলে মেয়ে নেই; তাই বাবা একটি গরিবের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে, তাঁকে ঘর-জামাই ক'রে রাখ্‌বার ইচ্ছে করেছিলেন। কিন্তু আমার স্বামী ঘর-জামাই হয়ে থাক্‌তে রাজী হন নি, তিনি চলে গিয়েছেন।'

সুমতি বলিল, 'চলে গিয়েছেন! কোথায় গেলেন?'

সত্যবালা বলিল, 'এখন তিনি যে কোথায় আছেন, তা ঠিক বল্‌তে পারি নে। অনেক দিন তাঁর কোনও খবর পাই নি।'

সুমতি বলিল, 'তা তিনি ঘর-জামাই হ'য়ে থাক্‌তে রাজী হ'লেন না কেন? তোমার বাপের এই অতুল বিষয় সম্পত্তি, তুমি ভিন্ন তাঁর আর ত কেউ নেই।'

সত্যবালা বলিল, 'আমার স্বামী ঘর-জামাই হ'য়ে থাক্‌তে কেমন লজ্জা ও অপমান বোধ করলেন, কোনও মতেই তিনি তাতে রাজী হলেন না। সকলের প্রকৃতি ত আর এক রকম নয়, যে যেমন বোঝে।'

সুমতি বলিল, 'তুমি কখনও শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলে?'

সত্যবালা বলিল, 'না।'

সুমতি বলিল, 'কেন?'

সত্যবালা বলিল, 'বাবা যেতে দেন নি।'

সুমতি ক্ষুব্ধভাবে বলিল, 'তুমি সেখানে যেতে পাবে না, তোমার স্বামীও এখানে থাক্‌তে রাজী ন'ন, তবে কি হবে?'

সত্যবালা বলিল, 'চিরদিনই কি আর এমনই যাবে? আমার স্বামী ব'লে গিয়েছেন, তাঁর অবস্থা ভাল হ'লেই আমাকে নিয়ে যাবেন।'

সুমতি বলিল, 'তখনও যদি তোমার বাবা তোমাকে পাঠিয়ে না দেন?'

সত্যবালা বলিল, 'তা কেন দেবেন না? যাঁর হাতে বাবা আমাকে সঁপে দিয়েছেন, তাঁহার অবস্থা যেমনই হোক, আমি তাঁরই কাছে থাক্‌ব। বাবার ধন-দৌলত আছে; তা বড়, না আমার স্বামী বড়? যেমন-তেমন একখান ঘর করে' আমরা

দু'জনে এক-সঙ্গে থাকব ; তাঁর যা কিছু রোজগার হবে—তাতেই সংসার চালাব। বাবার সম্পত্তির আশায় আমি কি স্বামী ত্যাগ ক'রব ?'

সত্যবালার কথা শুনিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় সুমতির হৃদয় পূর্ণ হইল। সে মনে মনে তাহার প্রশংসা করিল।

অতঃপর সত্যবালা সুমতিকে তাহাদের বাসায় লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল ; তাহার অনুরোধ শুনিয়া সুমতি তাহাকে জানাইল, পিতার অনুমতি ব্যতীত সে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবে না।

সুমতির কথা শুনিয়া সত্যবালা তাহার পিতার নিকট সুমতিকে তাহাদের বাসায় লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল।—তখন তালুকদার ন্যায়রত্নকে ধরিয়া বসিলেন, সুমতিকে তাঁহার বাসায় পাঠাইতেই হইবে ; কিন্তু ন্যায়রত্ন এ সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ না করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

তালুকদার উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, 'আমি পাল্‌কীবেহারা পাঠাইয়া দিব ; আমার বাসায় আপনার মেয়েকে পাঠাইতেই হইবে।'

ন্যায়রত্ন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'মেয়ের বাবা কখনও পাল্‌কী চড়ে নাই, সে পাল্‌কী চড়িবে কোন্ অধিকারে ?'

তালুকদার হঠাৎ এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ন্যায়রত্ন পুনর্ব্বার বলিলেন, 'মানুষ হইয়া মানুষের কাঁধে চড়িয়া বেড়ান আমার বড় ভাল বোধ হয় না। সুমতিকে যদি যাইতেই হয়—সে হাঁটিয়া যাইবে; কিন্তু আমার মনে হয়, তাহার না যাওয়াই ভাল।'

তালুকদার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ন্যায়রত্নের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কেন আপনি এ কথা বল্‌ছেন?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আপনি রাজা মানুষ, আর সুমতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। সেখানে নানা বিষয়ে তাহার ত্রুটী হওয়াই সম্ভব।'

তালুকদার বলিলেন, 'আমার সত্যবালাও যা, সুমতিও তাই; তার আবার কি ত্রুটী হ'বে?—আর ত্রুটী হ'লেই বা কি?'

তালুকদারের অনুরোধ কোন রূপেই এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে ন্যায়রত্ন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে জানাইলেন, তিনি এক জন দাসী পাঠাইলে সুমতি তাহার সহিত তাঁহার বাসায় যাইবে।

বিজয় দত্ত ন্যায়রত্নের নিকট বিদায়-গ্রহণ-কালে আর এক দফা তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া পরমভক্তিভরে বলিলেন, 'আমি আপনার দাস; আমার দ্বারা যদি কখনও আপনার কোনও অভাবমোচন হয়,—তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব, আমার জীবন ধন্য হইবে।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আপনার অনুগ্রহলাভ আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগবানের কৃপায়

কোনও বিষয়েই আমার কখনও কোনও অভাব হয় নাই। যিনি আমাদের এই দুইটি জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাদের সকল অভাব মোচন করিতেছেন।'

তালুকদার তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধি সম্বন্ধে ন্যায়রত্নের নিকট কোনও আশা-ভরসা না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে বাসায় ফিরিলেন।

এত দীর্ঘকাল ধরিয়া ন্যায়রত্নের সহিত তালুকদারের কি আলাপ হইতেছিল, তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া কৌতূহলী গ্রামবাসীরা নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল; এবং ন্যায়রত্নের শুভাকাঙ্ক্ষী পূর্ব্বোক্ত মোসাহেব-চতুষ্টয় বিস্ময়ে মুখ-ব্যাদান করিয়া, তালুকদারের এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ-আবিষ্কারের চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে লাগিল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদবর্ণিত ঘটনার পর প্রায় এক মাস অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যেই সত্যবালার সহিত সুমতির পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সত্যবালা ধনাঢ্য-দুহিতা, তাহার সহিত সুমতির আত্মীয়তা গাঢ় হইলেও সুমতি প্রথম প্রথম তাহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিত; সত্যবালা ইহা পছন্দ করিত না।

এক দিন সত্যবালা বলিল, 'আমি তোমাদের বাড়ী আসিলে ও রকম কর কেন ভাই?'

সুমতি বলিল, 'কি রকম করি ?'

সত্যবালা বলিল, 'আমি আসিলেই তুমি তাড়াতাড়ি আমার জন্ত আসন আনিয়া দাও, আমার জন্ত ভারি ব্যস্ত হইয়া পড় ।'

সুমতি হাসিয়া বলিল, 'তুমি যে ভাই জমীদারের মেয়ে; কত ভাগ্যে তুমি আমাদের বাড়ী আস !'

সত্যবালা বলিল, 'হইলাম-ই বা জমীদারের মেয়ে, তাহাতে কি যায় আসে ?'

সুমতি বলিল, 'কি জ্বালা ! তুমি আসিয়া কি মাটীতে বসিবে ? তোমাকে বসিতে আসন দিব না ?'

সত্যবালা বলিল, 'কেন, আমি মাটীতে বসিলে কি ক্ষ'য়ে যাব ?'

সুমতি বলিল, 'তাও কি হয় ?'

সত্যবালা বলিল, 'তোমাকে ভালবাসি, তাই তোমাকে দেখিতে আসি ; ভালবাসার কাছে কি বড়লোক গরিব লোক আছে ? দেখ, আর যদি তুমি আমাকে এত আদর যত্ন কর— তা' হলে আমি কিন্তু তোমাদের বাড়ী আসিব না ।'

সুমতি বলিল, 'আচ্ছা, তাহাই হইবে । আর তোমাকে খাতির যত্ন করিব না । তুমি যাহাতে মনে ব্যথা পাও, তাহা কি আমি করিতে পারি ?'

সুমতির মনে যে একটু সঙ্কোচ ছিল, সেই দিন হইতে তাহা তিরোহিত হইল । তাহাদের উভয়ের হৃদয় এক সূত্রে আবদ্ধ হইল ; তাহাদের স্নেহের বন্ধন সুদৃঢ় হইল ।

ন্যায়রত্নের বাড়ী ও তালুকদারের বাসা, এ উভয়ের ব্যবধান অধিক নহে। সংসারের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া অবকাশ পাইলেই সুমতি সত্যবালার সহিত দেখা করিতে যায়। সত্যবালাকে সংসারের কোনও কাজ দেখিতে হয় না। রাজার মেয়ে সে, তাহার ত অবকাশের অভাব নাই; ইচ্ছা হইলেই সে সুমতিদের বাড়ী বেড়াইতে আসে, এবং তাহার কাছে বসিয়া থাকে। সে দেখিতে পায়, সুমতি সকালে উঠিয়া ঘর নিকায়, বাসন মাজে; ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করে; মধ্যাহ্নে পাকশালার সকল কাজ করে—কুট্‌নো কোটে, বাট্‌না বাটে, উনান জ্বালে, ভাত রাঁধে, বৃদ্ধ পিতাকে পরম যত্নে খাইতে দেয়; অপরাহ্নে নানা প্রকার সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করে। আবার কোনও প্রতিবেশীর বাড়ীতে কোনও বিপদ আপদ হইয়াছে শুনিলে, তাহাকে না ডাকিতেই সে সেখানে উপস্থিত হয়; রোগীর সেবা করে, ঔষধ খাওয়ায়, মূর্ত্তিমতী দেবীর ন্যায় রোগীর শিয়রে বসিয়া মধুর-বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা দান করে—ইহাও সত্যবালার অগোচর ছিল না।

সুমতি সারাদিনই পরিশ্রম করে। পরিশ্রমেই তাহার সুখ। শরীর-রক্ষার জন্য আহার করিতে হয়, তাই সে দুটি ভাত খায়, লজ্জা-নিবারণের জন্য কাপড় পরে; তাহার অশন-বসনে বিন্দুমাত্র আড়ম্বর বা বাহুল্যের নিদর্শন ছিল না। কিন্তু সত্যবালা রসনা-পরিতৃপ্তির জন্য মুখরোচক খাদ্যসামগ্রী ভোজন করিত, যৌবন-পুষ্পিত চারু-অঙ্গ সুসজ্জিত করিবার জন্য বহুমূল্য

বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিত। আহার ও আমোদ, নিত্য নূতন বেশভূষা করা ভিন্ন তাহার অন্য কোনও কাজ ছিল না। ভোগবিলাসে আকাঙ্ক্ষা কখন পরিতৃপ্ত হয় না; ভোগের মাত্রা বিলাসের পরিমাণ যতই বর্দ্ধিত হয়, আকাঙ্ক্ষার অনলশিখাও হবিঃপুষ্ট হুতাশনের মত ততই প্রবল হইয়া উঠে। সহস্র বিলাস ও ভোগসুখের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াও সত্যবালা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিত না; সে নিত্য নূতন অভাব অনুভব করিত। কিন্তু সুমতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া, তাহার দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সত্যবালা তাহার জীবনের সহিত স্বীয় ঐশ্বর্য্য-মোহমুগ্ধ বিলাস-লালসা-বুভুক্ষিত জীবনের তুলনা করিত। বোধ হয়, প্রত্যেক নরনারীর পক্ষেই ইহা স্বাভাবিক। সত্যবালার মনে নিজের উপর কেমন একটা ধিক্কার জন্মিয়া গেল; এবং স্বর্ণপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া তরুশাখার শ্যামল-পল্লবসমাচ্ছন্ন নিভৃত চূড়ায় তৃণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র নীড়ে বাস করিবার জন্য শারীর মনে যে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, সত্যবালার হৃদয়ের কোন্ নিভৃত অন্তস্তলে সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হওয়ায় সুমতির প্রতি তাহার সহানুভূতি যেন শতধারায় উৎসারিত হইয়া উঠিল।

এই অবস্থায় সুমতি এক দিন অপরাহ্ণে—সংসারের সকল কাজ শেষ করিয়া সত্যবালার বাসায় বেড়াইতে গেল। দুই সখীতে নানা সুখ দুঃখের গল্প করিতে করিতে কখন যে সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়াছে, তাহা তাহারা

বুঝিতে পারিল না। শীত কাল। উত্তর দিক হইতে শীতল বায়ু বহিতেছিল; কিন্তু সুমতির গাত্রে শীত-বস্ত্র ছিল না। সত্যবালা সুদৃশ্য মূল্যবান শালে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বসিয়া ছিল, তথাপি তাহার মনে হইতেছিল, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে; আর তাহার সম্মুখে দরিদ্রা ব্রাহ্মণকন্যা একবস্ত্রে উপবিষ্টা, অঞ্চল ভিন্ন তাহার দেহের অন্য কোনও আচ্ছাদন ছিল না। সত্যবালার মনে হইল, এই দারুণ শীতে—কন্‌কনে উত্তরে হাওয়ায় সুমতির কতই কষ্ট হইতেছে! সে গল্প করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া গেল, এবং কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার মাতার নিকট হইতে নিজের একখানি মূল্যবান পশমী শীতবস্ত্র লইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুমতির নিকট প্রত্যাগমন করিল; সে সেই আলোয়ানখানি সুমতির সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া দিল। ইহাতে সুমতি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল, সে অত্যন্ত অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। সে কোনমতেই তাহা গ্রহণ করিবে না, সত্যবালাও ছাড়িবার পাত্রী নহে। অবশেষে সত্যবালার মা সেই কক্ষে আসিয়া যখন সুমতিকে তাহা লইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন সুমতিকে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত আলোয়ানখানি গায়ে রাখিতে হইল।

জমীদারের সংসারে যে সকল দাস দাসী ছিল, তাহাদের মধ্যে রমণী বহু দিনের পুরাতন পরিচারিকা। পুরাতন ভৃত্য হইলে কি হয়, দরিদ্র কৈবর্ত্তের মেয়ে রমণীর লোভ বড় বেশী।

বড়লোকের ঝি বলিয়া তাহার সঙ্কীর্ণ মন মাৎসর্য্যে পূর্ণ ছিল। 'রাজকন্যা' সত্যবালা দরিদ্রদুহিতা সুমতিকে সমকক্ষের মত দেখিয়া থাকে, এবং সুমতিও দরিদ্র প্রজার মেয়ে হইয়া জমীদার-নন্দিনীর সহিত অসঙ্কোচে 'মেলা-মেশা' করে, ইহা দেখিয়া ঈর্ষ্যার আগুনে সে জ্বলিয়া মরিত; কিন্তু সে মনের জ্বালা মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিত না। সত্যবালা তাহার আলোয়ানখানি পরম স্নেহে সুমতির গায়ে জড়াইয়া দিল, ইহা দূর হইতে দেখিয়া রমণীর মনের আগুন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সত্যবালা ও তাহার মায়ের পরিত্যক্ত পুরাতন বস্ত্রাদিতে তাহারই অধিকার,—বিশেষতঃ সে সত্যবালাকে তাহার ধাত্রীর ন্যায় সর্ব্বদা কোলে পিঠে লইয়া মানুষ করিয়াছে, আর আজ কোথা হইতে একটা গরিব বামুনের মেয়ে আসিয়া মুখের দুটো মিষ্ট কথায় সত্যবালার মন ভিজাইয়া, তাহার অবশ্যপ্রাপ্য অমন সুন্দর আলোয়ানখানি হস্তগত করিল! ইহাতে রমণীর রাগ হইবারই কথা। সে রাগে ফুলিতে লাগিল, এবং কিরূপে এই 'বাম্‌নী'টাকে জব্দ করিবে, তাহার প্রভু-পত্নীর 'দুই চক্ষুর বিষ' করিয়া তুলিবে, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিশ্বস্তা প্রাচীনা পরিচারিকার প্রভাব প্রতিপত্তি অল্প নহে। মন্থরার কুমন্ত্রণায় রঘুকুলতিলক ভগবান রামচন্দ্রকেও চতুর্দ্দশ বৎসর নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল!

ন্যায়রত্নের নিয়তি

অনেক দিন পরে আজ হঠাৎ ন্যায়রত্নের শূলবেদনা উপস্থিত হইয়াছে। তিনি মাটীতে পড়িয়া নিদারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। রাত্রি ক্রমে গভীর হইতেছে, তথাপি সুমতি জমীদারের বাসা হইতে ফিরিল না কেন, ভাবিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিতা, বিলাসিনী তালুকদারকন্যার সহিত সুমতির ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে—ইহা লক্ষ্য করিয়া ন্যায়রত্নের মনে আশঙ্কা ও উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল তিনি রোগ-যন্ত্রণার উপর মানসিক অশান্তিতে কাতর হইয়া কত কি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সুমতি গৃহে প্রত্যাগমন করিল। মুল্যবান পশমী আলোয়ানে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যেন শতবৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা অনুভব করিলেন' রোগের যন্ত্রণা তাঁহাকে তত দূর কাতর করিতে পারে নাই; কিন্তু পাছে সুমতির মনে কষ্ট হয়, এই ভয়ে তিনি তাহাকে এ প্রসঙ্গে কোনও কথা বলিলেন না, কেবল একবার ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

সুমতি পিতার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আলোয়ানখানি তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া ন্যায়রত্ন স্নেহ-কোমল-স্বরে কন্যাকে বলিলেন, 'মা, আমরা বড় গরিব। গরিব বটে, কিন্তু লোভী নহি; বিলাসের সহিতও আমাদের পরিচয় নাই। অবস্থায় যেরূপ কুলায়, সেইরূপ অল্প মূল্যের মোটা সূতার কাপড় ভিন্ন মুল্যবান পশমী কাপড়-চোপড় ব্যবহার করা আমাদের শোভা পায় না। অনাবশ্যক অভাবের সৃষ্টি করা কি ভাল, মা?'

সুমতি পিতার কথা শুনিয়া লজ্জারক্তিমমুখে অবনতমস্তকে কুন্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; একটা কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

আমাদের দেহের কোনও অংশে একটি ক্ষুদ্র কণ্টক বিদ্ধ হইলেও যন্ত্রণায় অধীর হই, সামান্য অসুখ হইলে ভগবানকে নিষ্ঠুর মনে করিয়া তাঁহার উপর রাগ করি, অভিমান করি, তাঁহার নিরপেক্ষতায় সন্দেহ করিতেও কুন্ঠিত হই না! ন্যায়রত্ন বহুদিন অবধি শূলবেদনায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে এই যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিতেছেন। এত কষ্টেও ভগবানের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও গভীর বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। শূলবেদনা উপস্থিত হইলে তিনি সহিষ্ণুচিত্তে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নীরবে সকল যন্ত্রণা সহ্য করেন; কিন্তু আজ তিনি যন্ত্রণায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। দীর্ঘকাল সুস্থ থাকিবার পর এবার তাঁহার রোগের আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল।

ন্যায়রত্নের শয়নকক্ষে একখানি অতি সুন্দর পট ছিল। কৃষ্ণনগরের কোন বিখ্যাত পটুয়া এই চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়াছিল। দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রহ্লাদ কৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন; ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাঁহার পিতা দৈত্যকুলকলঙ্ক ভগবদ্দ্বেষী দুর্ব্বৃত্ত হিরণ্যকশিপু শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পুত্রের আত্মসমর্পণ-দর্শনে দারুণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণসংহারের অভিপ্রায়ে—

তাঁহাকে বিষ পান করাইতেছেন। হিরণ্যকশিপু রাজবেশে সজ্জিত হইয়া ভ্রূকুটীকুটিল-মুখে সশস্ত্রস ম্মুখে দণ্ডায়মান, প্রহ্লাদ স্থির-ভাবে বসিয়া আছেন, স্ববর্ণনির্ম্মিত শূন্য বিষপাত্র তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে পড়িয়া আছে। সুতীব্র হলাহল উদরস্থ হওয়ায় প্রহ্লাদের উজ্জ্বল গৌর বর্ণ নীল হইয়া গিয়াছে; বিষের জ্বালায় তাঁহার ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত, ওষ্ঠাধর যেন মৃদু স্পন্দিত হইতেছে। অসহ্য জ্বালায় কাতর হইয়া প্রহ্লাদ করযোড়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে যেন সেই সর্ব্বসন্তাপহারী শ্রীহরির নিকট এই নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। প্রহ্লাদের মুখে কি প্রগাঢ় ভক্তির ও অবিচলিত নির্ভরের ভাব চিত্রকরের তুলির দুই একটী রেখাপাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে! চিত্রকর যেন সেই মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এই চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছে। প্রহ্লাদ এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ একাগ্রচিত্তে ভগবানের করুণাকণা প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা দেখিলে অতি কঠোরহৃদয় সংশয়বাদী নাস্তিকের হৃদয়ও ক্ষণকালের জন্য শ্রদ্ধা ভক্তিতে অবনত হইয়া পড়ে।

ন্যায়রত্ন প্রায়ই ভক্তি-বিহ্বলচিত্তে এই পবিত্র চিত্রখানি নিরীক্ষণ করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে কোন্ স্মরণাতীত যুগের একটী গৌরবময় উজ্জ্বল দৃশ্য মায়া-চিত্রের ন্যায় তাঁহার মানসনেত্রে প্রতিফলিতহইত। তিনি স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া সেই চিত্রখানির দিকে চাহিয়া থাকিতেন।

ন্যায়রত্ন আজ দুঃসহ শূলবেদনায় কাতর হইয়াছেন; তাঁহার

ব্যথিত হৃদয়ের যাতনারাশি যেন অশ্রুর আকার ধারণ করিয়া দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় বিগলিত হইতেছে। অবশেষে যন্ত্রণা যখন বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি ঊর্দ্ধনেত্রে সেই প্রহ্লাদ-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া গদগদস্বরে বলিলেন, 'প্রহ্লাদ প্রহ্লাদ, ধন্য তুমি, সার্থক তোমার ভগবদ্ভক্তি! বিষপানে তুমি যে যন্ত্রণা সহ্য করিতেছ, তাহার সহিত আমার এই রোগ-যন্ত্রণার তুলনা হয় না। আমার রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা তোমার বিষের জ্বালা কত অধিক! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা! ভগবানের প্রতি তোমার কি অটল বিশ্বাস! তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া বালক তুমি, এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলে; কিন্তু অধম আমি, মূঢ় আমি, আমার ত সে ভক্তি বিশ্বাস, নির্ভর করিবার সে শক্তি নাই; তাই বুঝি আমাকে পরাস্ত হইতে হইল। তুমি পাকা সোনা, বিপদের আগুনে দগ্ধ হইয়া উজ্জ্বল হইয়াছ; আমি অসার অঙ্গার মাত্র—এই পরীক্ষার অনলে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইলাম!'

ন্যায়রত্ন চক্ষু মুদিত করিলেন, ভগবানকে ডাকিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন, 'হে হরি, হে মধুসূদন, হে কৃপাসিন্ধু, তোমার করুণাবিন্দু দান করিয়া এ অধমের দুর্গতি দূর কর, রক্ষা কর।'

সুমতি পিতার যন্ত্রণা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না, সে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে এই করুণ দৃশ্য দেখিতেছিল; তাহার স্নেহকোমল চিত্ত আলোড়িত করিয়া এই প্রশ্নগুলিই পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতেছিল—'হায়, কি পাপে বাবার এই শাস্তি?

যাঁর চরিত্র দেবচরিত্রের মত নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র,—তাঁকে কেন এ রোগে ধরিল ? এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তবু ভগবানে তাঁর কি অচলা ভক্তি ! ভগবানের কি বিচার নাই ?'—সুমতির হৃদয় ক্ষোভে অভিমানে পূর্ণ হইল। পিতা 'কাতর-ভয়ভঞ্জন' হরিকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতেছেন শুনিয়া সুমতি ক্ষুব্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, 'বাবা, তোমার এ যন্ত্রণা আর ত চক্ষে দেখা যায় না ! তুমি আর হরিকে ডেক না, তাঁর নাম আর মুখে এন না ; কেন তুমি তাঁকে দয়াময় কৃপাসিন্ধু বলে ডাকৃছ ? যাঁর রাজ্যে এত রোগ, এত যন্ত্রণা, এত দুঃখ কষ্ট, তাঁকে আর দয়াময় দীনবন্ধু বলো না।"

ন্যায়রত্ন কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিলেন, 'সুমতি, অনেকদিন পরে আজ আমার শূলবেদনা উপস্থিত হইয়াছে ; আমার বড় যন্ত্রণা হইতেছে, এ কথা সত্য ; ভগবান আমাকে কি পাপে এই শাস্তি দিতেছেন, তাহা জানি না ; কিন্তু যন্ত্রণা পাইতেছি বলিয়া তাঁহার নাম লইব না ? তাঁহার অনন্ত করুণায় সন্দেহ করিব ? এত কাল ধরিয়া তোমাকে যে শিক্ষা দিয়াছি, তাহার কি এই ফল ? তোমার এরূপ দুর্ম্মতি কেন হইল সুমতি ? হরি হে, তুমি যদি সদা সর্ব্বক্ষণই আমাকে এই যন্ত্রণা ভোগ করাইতে, তাহা হইলে আমাকে এক দণ্ডও তোমার সঙ্গ-ছাড়া হইয়া থাকিতে হইত না। দুঃখের মেঘ মাথার উপর ঘনাইয়া না আসিলে ত তোমাকে মনে পড়ে না হরি ! আমি অবোধ

অজ্ঞান ; আমার অজ্ঞান-তিমির নাশ করিয়া, আমাকে তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সকল যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি দান কর, দীনবন্ধু !'

ন্যায়রত্ন পুনর্ব্বার নীরব হইলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, 'শূলের বেদনায় আমার যে কষ্ট না হইতেছে—তোমার মুখে ভগবানের প্রতি অভক্তি ও অবিশ্বাসের কথা শুনিয়া আমি তাহার শত গুণ অধিক কষ্ট পাইলাম ! ভগবানে যাহার ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, তাঁহার উপর যে নির্ভর করিতে না পারে, দুঃখে দুর্দ্দিনে সে কোথায় দাঁড়াইবে? কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? দু'দিন পরে আমি যখন ইহলোক ত্যাগ করিব, তখন তুমি কাহার শরণ লইবে? তোমার কি দশা হইবে ভাবিয়া মরণেও যে আমার শান্তি নাই সুমতি !'

ন্যায়রত্নের কণ্ঠরোধ হইল।

সুমতি ধীরে ধীরে বলিল, 'বাবা, আমার জ্ঞান হইবার পর হইতেই দেখিতেছি, হরির চরণে তুমি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, হরিই তোমার ধ্যান, হরিই তোমার জ্ঞান। তোমার নিকট সংসার অসার, তিনিই তোমার সারাৎসার। তাঁহার প্রতি যাঁহার এত ভক্তি, এত বিশ্বাস, ভুলিয়াও যিনি কখনও অধর্ম্মাচরণ করেন না, তাঁহাকে হরি কেন এমন কঠিন রোগ দিলেন? তাঁহার পাদপদ্মে যাঁহার অচলা মতি, তাঁহার প্রতি হরির এত অকৃপা কেন বাবা?'

ন্যায়রত্ন কন্যার কথা শুনিয়া যেন মুহূর্তের জন্য রোগের যন্ত্রণা বিস্মৃত হইলেন; তিনি আবেগভরে বলিলেন, 'আমার প্রতি হরির অকৃপা? ও কথা আর বলো না, বলো না! এমন কথা আর কখনও মুখেও আনিও না, মা! আমার প্রতি সত্যই তাঁহার দয়ার সীমা নাই। তাঁহার দয়া না থাকিলে কি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য মন প্রাণ কখনও ব্যাকুল হয়? সংসারে সকলই অসার; জগৎ-সংসার অনিত্য, মায়াময়। অনিত্য বস্তুতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণে যে সুখ, যে আনন্দ, তাহা কি তাঁহার বিশেষ কৃপা ভিন্ন লাভ করা যায়? তুমি রোগের কথা কি বলিতেছ? শরীর ধারণ করিলে রোগ ত হইবেই, তাহা নিবারণ করা কাহারও সাধ্য নহে। আমার শূল হইয়াছে, কিন্তু এ সংসারে কত লোককে আমার অপেক্ষাও কত অধিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে! ইহা অপেক্ষাও উৎকট ব্যাধির আক্রমণে কত লোক প্রতিদিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার কোনও সংবাদ রাখ কি? কেহ অন্ধ, কেহ বধির, কেহ চিরজীবনের জন্য বাক্‌শক্তি হারাইয়াছে। গলিত কুষ্ঠরোগে কত লোকের হাত পা খসিয়া পড়িতেছে, দুর্গন্ধে তাহাদের স্ত্রী কন্যারাও তাহাদের নিকটে যাইতে পারে না! আমার শূল হইয়াছে, ইহার উপর যদি আমি অন্ধ, বধির, বোবা হইতাম, কুষ্ঠরোগে যদি আমার হাত পা খসিয়া পড়িত, প্রাণাধিকা কন্যা তুমি, দুর্গন্ধে যদি তুমিও আমার নিকটে আসিতে—আমার সেবা শুশ্রূষা করিতে অশক্ত

হইতে, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ দেখি মা, আমার কি দশা হইত ?'

পিতার কথা শুনিয়া সুমতি শিহরিয়া উঠিল। তাহার মুখে আর একটীও কথা ফুটিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তালুকদার প্রজাদের নিকট টাকায় টাকা নজর ও টাকায় আট আনা হারে নিরিখ বৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছেন; তদনুসারে যাহার বর্ত্তমান খাজানা দশ টাকা, তাহাকে দশ টাকা নজর ও পনের টাকা খাজানা দিতে হইবে! এই প্রস্তাবে কোনও প্রজা সম্মত হইল না।

ন্যায়রত্ন গ্রামের প্রধান প্রজা; সকলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে চলে। তিনি প্রজাদের বুঝাইয়া যদি তাহাদিগকে সম্মত করাইতে পারেন, এই আশায় তালুকদার তাঁহাকে মিষ্ট বাক্যে সাগ্রহে সেই অনুরোধ করিলেন; কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ তেজস্বী ব্রাহ্মণ এই অন্যায় ও অসঙ্গত প্রস্তাবের অনুমোদন করা দূরের কথা, তালুকদারের মুখের উপর দৃঢ়তার সহিত ইহার প্রতিবাদ করিলেন।

তালুকদার বিজয় দত্ত নিরুপায় হইয়া অবশেষে কাজি সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কাজটা তেমন কঠিন হইল না; তিনি

মুর্গীর আণ্ডা, (এবং পরম বৈষ্ণব হইলেও) খাসী প্রভৃতি নানা-বিধ দ্রব্যসামগ্রী উপহার পাঠাইয়া ও ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিলেন। দেবতা প্রসন্ন হইলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হয় না। এ ক্ষেত্রেও তালুকদার আশানুরূপ ফল লাভ করিলেন।

এই সময় যিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার নামের সহিত এই আখ্যায়িকার কোনও সম্বন্ধ নাই, কিন্তু তিনি কাজি সাহেবের এক দূরসম্পর্কীয়া ভগিনীকে সাদি করিয়াছিলেন। যাহার ভগিনীপতি বাঙ্গালার সুবেদার, তাহার সাত খুন কেন, সাত শ খুন মাফ! সম্পর্ক-গৌরবে কাজি সাহেবের বুক অহঙ্কারে পাঁচ হাত ফুলিয়া উঠিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। কাজি সাহেবের যুক্তি ও পরামর্শানুসারে প্রজার নিকট নজরাণা ও বর্দ্ধিত হারে খাজানা আদায়ের জন্য নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ হইল। গ্রামের প্রান্তভাগে অনেকটা স্থান ঘিরিয়া এক একটা প্রকাণ্ড খোঁয়াড় নির্ম্মিত হইল, এবং নজরের টাকা আদায়ের জন্য প্রজাদের গরু তাড়াইয়া লইয়া গিয়া সেই সকল খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করা হইল। বর্দ্ধিত হারে খাজানা আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রজাদের ক্ষেতের পাকা ধান ক্রোক করা হইল। গরুগুলি খোঁয়াড়ের ভিতরে দাঁড়াইয়া অনাহারে নীরবে চক্ষুর জল ফেলিতে লাগিল। গরু অভাবে চাষাদের চাষ আবাদের কাজ বন্ধ হইয়া গেল। ক্ষেতের পাকা ধান ক্রোক করায় ধানগুলি ক্ষেতেই ঝরিয়া পড়িয়া নষ্ট হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তখন গ্রামস্থ মাতব্বর প্রজারা দলবদ্ধ হইয়া তালুকদারের নিকট দরবার করিতে আসিল।

বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে। তালুকদার সবেমাত্র পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াই বাহিরে আসিয়াছেন। তাঁহার মাথায় একটি নাতিদীর্ঘ টিকি, টিকির অগ্রভাগে একটি ফুল ঝুলিতেছে; তাঁহার নাসিকাগ্রে তিলক; গায়ে রেশমী নামাবলী; গলায় তিন কণ্ঠী তুলসীর মালা; কারুকার্য্য খচিত হরিনামের ঝুলিটী সোনার আংটায় সেই মালার সহিত আবদ্ধ;—দেখিলেই মনে হয়, তালুকদার দণ্ডজা বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণি, পরম নিষ্ঠাবান সাধু পুরুষ!

তালুকদার বহির্ব্বাটীতে পদার্পণ করিয়া সমাগত প্রজাদের দেখিয়াই নিদাঘাপরাহ্নের মেঘকান্তির ন্যায় মুখকান্তি অত্যন্ত গম্ভীর করিলেন, এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ শ্লেষের সহিত বলিলেন, 'কেমন হে, সাধ মিটেছে কি না?'

একজন প্রধান প্রজা সবিনয়ে উত্তর করিল, 'সাধ মিটাতে আর কি বাকি রাখ্‌লেন হুজুর! গরুগুলা আজ আট দশ দিন খোঁয়াড়ের মধ্যে খেতে না পেয়ে শুকিয়ে মরল, ক্ষেতের পাকা ধান ক্ষেতেই ঝ'রে পড়ল! আমাদের দশা কি হবে ধর্ম্মাবতার?'

ধর্ম্মাবতার মুখের কদর্য্য ভঙ্গী করিয়া দন্তবিকাশপূর্ব্বক কর্কশস্বরে বলিলেন, 'কি হবে, তা কিছুদিন সবুর ক'রে থাকলেই দেখ্‌তে পাবি! যদি নজর সেলামী না দিস্‌, 'বৃদ্ধি'-হারে

খাজানা দিতে যদি রাজী না হ'স, তা' হলে এই হরিনামের মালা গলায় করে বল্‌ছি, ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গায় তোদের গরু বাছুর সব ভাসিয়ে দেব।'

প্রজা বলিল, 'আপনি পরম হিন্দু; হিন্দু রাজা হ'য়ে গোহত্যে করবেন হুজুর?'

তালুকদার বলিলেন, 'করব, করব, করব। এখন তোদের গরু ধরে এনেছি; এর পর তোদের জরু ধরে এনে বে-ইজ্জৎ করবো; তোদের ভিটেয় শর্ষে বুনে ঘুঘু চরাব—তবে আমার নাম—'

তালুকদার ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া আর যে সকল অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিলেন, তাহা ভাগবতের শ্লোক বলিয়া কোন প্রজার ধারণা হইল না। তাহারা অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া নিঃশব্দে বাড়ী ফিরিয়া আসিল; কিন্তু এই অপমান তাহারা সহজে পরিপাক করিতে পারিল না। তাহারা একযোগে ধর্ম্মঘট করিয়া এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল যে, তালুকদারকে নজর-সেলামী বা বর্দ্ধিত হারে নিরিখ, এই উভয়ের কিছুই দিবে না; তাঁহার বাড়ীতে আর দরবার করিতেও যাইবে না, এবং কোনও গ্রামবাসী তাঁহার সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিবে না।

অতঃপর প্রজারা খোঁয়াড়গুলি ভাঙ্গিয়া স্ব স্ব গরু বাহির করিয়া লইয়া গেল। সেখানে যে সকল পেয়াদা পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা প্রজাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তাহাদের বাধা দেওয়া দূরের কথা, তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেও

সাহস করিল না। তাহারা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া প্রজাদের কাণ্ড দেখিতে লাগিল!

এই সংবাদ তালুকদারের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না; তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু হঠাৎ ইহার প্রতিকারের কোনও ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া লজ্জায় ও অপমানে সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও বাসার বাহিরে আসিলেন না। ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পাইলেন, তাঁহার যে কয়েকজন হিন্দু পরিচারক ছিল তাহারা চাকুরী করিবে না বলিয়া জবাব দিয়া গিয়াছে। ধোপা দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার বাসা হইতে যে সকল কাপড় ধুইতে লইয়া গিয়াছিল, তাহা সে বস্তা বাঁধিয়া ফেরত দিয়া গেল। তালুকদার একদিন অন্তর দাড়ি-গোঁফ কামাইতেন; ক্ষৌরকর্ম্মের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নাপিত আসিল না! নাপিতকে ডাকাইবার জন্য একজন পাইক পাঠাইয়া সংবাদ পাইলেন, সে তালুকদারকে কামাইয়া সমাজে একঘরে হইয়া থাকিতে পারিবে না। হাট বাজার হইতে তালুকদারের লোক শূন্য-হস্তে ফিরিয়া আসিল; দোকানদারেরা বলিয়াছে, তাহারা তালুকদারকে এক ছটাক জিনিসও বিক্রয় করিতে পারিবে না।—সমগ্র পরগণার প্রজাপুঞ্জের প্রধূমিত রোষানল সহসা প্রজ্জলিত হইয়া তালুকদারকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল!

তালুকদার একাকী অন্দরে বসিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া কত কথা চিন্তা করিলেন; কিন্তু অতঃপর তাঁহার কি কর্ত্তব্য, তাহা

স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় তিনি অন্ধকারে অন্যের অলক্ষ্যে কাজি সাহেবের 'দৌলত-খানা'য় উপস্থিত হইলেন। সেখানে নিভৃতে উভয়ের যুক্তি পরামর্শ আরম্ভ হইল। দীর্ঘকাল পরামর্শের পর স্থির হইল, কাজি তাঁহার ভগিনীপতি অর্থাৎ সুবেদারের নিকট এত্তেলা করিবেন, তালুকদারের প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে; তাহাদিগকে দমন করিতে না পারিলে, নবাব-সরকারের মাল-গুজারী আদায় হইবে না। অতএব বিদ্রোহী প্রজাদের দমনের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সেই সঙ্গে ইহাও স্থির হইল যে, তালুকদার স্বয়ং সেই এত্তেলা লইয়া সদরে দরবার করিতে যাইবেন, এবং এই অপমানের প্রতিবিধানের জন্য যদি দশ টাকা ব্যয় করিতে হয়, তাহাও তিনি করিবেন।

প্রবল ঝটিকার পর প্রকৃতি যেরূপ স্থির ও গম্ভীর ভাব ধারণ করে, হরিরামপুরের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল। গ্রামে কোনও গণ্ডগোল, আন্দোলন আলোচনা, বা উত্তেজনার চিহ্নমাত্র রহিল না। প্রজারা নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের ক্ষেতের পাকা ধান কাটিয়া, মাড়িয়া, স্ব স্ব গোলায় তুলিতে লাগিল। তালুকদারের যে সকল পাইক তৈলপক্ক লম্বা লম্বা বাঁশের লাঠী ঘুরাইয়া, বুক ফুলাইয়া পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়াইত,—প্রজাদের গরু ও জরু কাড়িয়া লইয়া যাইবে, কাহারও মান ও জান বজায় রাখিবে না,—তাহাদের কাঁধের লাঠী লগুড়াহত কুকুরের লাঙ্গুলের মত নতমুখ হইয়া তাহাদের

বগলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের বাবরীর বাহার অদৃশ্য হইল, এবং তাহারা প্রজাদের পরুষ দৃষ্টিপাতে সঙ্কুচিত হইয়া নতমস্তকে পথের এক ধার দিয়া নিতান্ত নিরীহ প্রাণীর মত নিঃশব্দে চলিয়া যাইতে লাগিল। সে দম্ভ, সে ঔদ্ধত্য আর নাই! এমন কি, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ তালুকদার পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ, কেহই তাঁহার সন্ধান পাইল না।

* * * * *

সুমতি ও সত্যবালা সমবয়স্কা হইলেও উভয়ের অবস্থায় আকাশ পাতাল প্রভেদ! তাহাদের সখীত্ববন্ধনে তাহাদের পিতামাতা সুখী হইতে পারিলেন না। ন্যায়রত্নের ধারণা, জমীদারকন্যার সহিত মিশিলে সুমতির অধঃপতনের পথই প্রশস্ত হইবে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যা যে আদর্শ সম্মুখে দেখিতেছে—তাহা তাহার পক্ষে কদাচ হিতকর হইতে পারে না; বিলাসের সহিত পরিচয় হইলে আর তাহার রক্ষা নাই! অন্য দিকে সত্যবালার মায়ের আশঙ্কা,—একটা লক্ষীছাড়া হাভাতের মেয়ের সংসর্গ-দোষে তাঁহার মেয়ে শীঘ্রই বিগ্‌ড়াইয়া যাইবে।

বস্তুতঃ, জমীদার-গৃহিণীর আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক, এ কথা বলা যায় না। সুমতির সহিত ঘনিষ্ঠতায় সত্যবালার ব্যবহারে ধীরে ধীরে যে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছিল, তাহা তাঁহার তীক্ষ্নদৃষ্টি অতিক্রম করিল না। সত্যবালাই সুমতিকে

তাহার জীবনের আদর্শ করিয়া লইয়াছিল! মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার কারণ নির্ণয় করুন; কিন্তু মানব-জীবনের ইতিহাসে বহুবার প্রতিপন্ন হইয়াছে—দারিদ্র্যের চরণ-তলে রাজরাজেশ্বরের হীরক-রত্ন-খচিত উষ্ণীষ লুটাইয়াছে, পার্থিব ঐশ্বর্য্য দরিদ্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। ইহার কারণ কি, বলা কঠিন; বোধ হয়, ত্যাগে যে তৃপ্তি আছে—ভোগে তাহা নাই। বাল্যকাল হইতে সত্যবালা ভোগসুখে ও বিলাসেই প্রতিপালিত এবং বর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু এতদিন পরে সুমতিতে নূতন কিছু দেখিয়াছে! সে আর পূর্ব্বের ন্যায় বেশভূষা করে না, ভাল কাপড় পরে না, গহনা গায়ে দেয় না, নিত্য নূতন ভঙ্গীতে পরিপাটী করিয়া চুলও বাঁধে না। বেশ-ভূষার প্রতি তাহার এই উপেক্ষা তাহার জননীর দৃষ্টি অতিক্রম করিল না; তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, এবং তাহার রুচির এই পরিবর্ত্তনের জন্য সুমতিকেই অপরাধিনী মনে করিলেন।

সত্যবালার মা মহামায়া কন্যার স্বভাবের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সকল কথাই তাঁহার স্বামীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ন্যায়রত্নের নিকট যদি কোনও প্রকার সাহায্য পাওয়া যায়, এই আশায় তালুকদার প্রথমটা স্ত্রীর অভিযোগে কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন, ন্যায়রত্ন প্রজাগণের পক্ষ ত্যাগ করিয়া কখনও তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবেন না, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট কোনও সাহায্য লাভের আশা নাই,—তখন তিনি একদিন সত্যবালাকে

ডাকিয়া তাহাকে স্থায়রত্নের বাড়ী যাইতে ও তাঁহার বিধবা কন্যার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে নিষেধ করিলেন।

পিতার কঠোর আদেশে সত্যবালা দুঃখিত হইল, কিন্তু তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না; তাহার প্রকৃতিও সেরূপ ছিল না। সে পিতার এই ব্যবহারের কারণ বুঝিতে না পারিলেও এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। সে স্থায়রত্নের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিল; কিছু দিন সুমতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না।

সুমতি সত্যবালাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছিল। সেই মধুরহৃদয়া বিধবা পিতা ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানিত না, চিনিত না; তাহার পিতাই তাহার ধর্ম্ম, স্বর্গ ও তপস্যা। তাহার পর সত্যবালাকে পাইয়া, তাহার হৃদয়ের পরিচয় লাভ করিয়া, তাহার হৃদয় ধীরে ধীরে সত্যবালার প্রতি স্নেহে পূর্ণ হইয়াছিল; সে স্নেহ পবিত্র, স্বার্থ-সম্পর্ক-বিরহিত, স্বর্গীয়। সত্যবালাকে কয়েক দিন দেখিতে না পাইয়া সুমতির মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল; অবশেষে সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, একদিন অপরাহ্নে গৃহকার্য্যাবসানে তালুকদারের বাসায় উপস্থিত হইল।

সুমতিকে দেখিয়া তালুকদার-পত্নী মহামায়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি তখন খোলা বারান্দায় বসিয়া সত্যবালার চুল বাঁধিতেছিলেন। সুমতিকে আসিতে দেখিয়া তিনি মুখ ফিরাইলেন; তাহাকে কোনও কথা বলিলেন না। সরলা সুমতি

ইহাতে দ্বিধা বোধ করিল না; অন্য দিন সে যে ভাবে তাঁহাদের কাছে বসিয়া গল্প করিত, সে দিনও সেইভাবেই তাঁহাদের নিকটে গিয়া বসিল।

সুমতির এই নির্লজ্জতা—এইরূপ গায়ে পড়িয়া আত্মীয়তা করিতে আসা মহামায়ায় অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি মহা-ধনবান তালুকদারের পত্নী; দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহার শিষ্টাচারের যোগ্য নহে, তাহা তিনি জানিতেন। তাহার অপমান করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না; সত্যবালাকে শুনাইয়া বলিলেন, 'লোকে ত লোকের বাড়ী যায় না, তবে লোকে কেন বেহায়ার মত সেধে লোকের বাড়ী আসে? বেহায়াদের লজ্জা, সরম, অপমান-জ্ঞান কি কিছুই নেই?'

সুমতি মহামায়াকে 'খুড়ীমা' বলিয়া সম্বোধন করিত; 'খুড়ীমা' যে তাহার হৃদয় লক্ষ্য করিয়া এরূপ বিষাক্ত শর নিক্ষেপ করিতে পারেন—সরলা সুমতির ইহা ধারণার অতীত। কিন্তু সে বিনা-আহ্বানে তাঁহার কাছে বসিলেও তিনি তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন না দেখিয়া সুমতি বলিল, 'খুড়ীমা, আজ তোমার মনটা ভার-ভার দেখ্‌ছি কেন?'

মহামায়া বলিলেন, 'আমার এই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে একটা পেত্নীতে ধরেছে, তাকে ছাড়াই কি করে, তাই ভাব্‌চি।'

ইতিমধ্যে একজন দাসী আয়না, চিরুণী, সুগন্ধি কেশতৈল, চুল বাঁধিবার গুছি, ও বহুমূল্য একটি জরির ফিতা সত্যবালার সম্মুখে রাখিয়া গেল। ফিতাটি সুদৃশ্য স্বর্ণসূত্র-খচিত, দিল্লীর শিল্পীর নির্ম্মিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহামায়া কন্যার চুল বাঁধিতে বাঁধিতে সুমতিকে লক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকার অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সকল অপমানপূর্ণ বিদ্রূপ এতই সুস্পষ্ট যে, সুমতিই যে তাহার লক্ষ্য—ইহা তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সুমতি কি উপলক্ষ করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া যাইবে—তাহাই ভাবিতেছে, এমন সময় মায়ের বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সত্যবালা বলিয়া উঠিল, 'মা, যেদিন তুমি আমাকে সুমতিদের বাড়ীতে যেতে বারণ করেছ—সেইদিন থেকে আমি আর ওদের বাড়ী যাই নে। সুমতিও না হয় আর কোনও দিন আমাদের বাড়ী আসবে না; কিন্তু সে তোমাদের কাছে এমন কি অপরাধ করেছে যে, তাকে সামনে পেয়ে এমন করে' দশ কথা না শুনোলেই নয়?'

কন্যার কথা শুনিয়া মহামায়া আহতা ফণিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; মুখের বিকট ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'হাড়-হাভাতে মেয়ের কথার যে ছিরি! অনেয্য কথা এমন কি বলেছি যে, তুই আমাকে মুখ নেড়ে দশ কথা শুনিয়ে দিচ্ছিস্? সে এ বাড়ীতে আসে কেন? তাকে এখানে কে ডাকে?'

মহামায়ার গর্জ্জন কতক্ষণ চলিত, বলা যায় না; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, 'মা, কর্ত্তা ফিরে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে অনেক ফৌজ এসেছে।'

কর্ত্তা আসিয়াছেন শুনিয়া মহামায়া ও সত্যবালা উভয়েই তাঁহার সহিত দেখা করিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল; সুমতিও

এতক্ষণে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ব্যথিতহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণনেত্রে গৃহে ফিরিল। সে কি অপরাধে মহামায়ার বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিল না।

কাজি সাহেব তালুকদারের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহার ভগিনীপতি সুবেদারের নিকট যে এত্তেলা পাঠাইয়াছিলেন, সেই এত্তেলার বলেই হউক, অথবা তালুকদারের তদ্বিরের মাহাত্ম্যেই হউক, বিদ্রোহী প্রজাগণের শাসনের জন্য একজন জমাদারের অধীনে পঞ্চাশ জন পাঠান সৈন্য তাঁহার সহিত প্রেরিত হইল। আদেশ হইয়াছিল, তাহারা আপাততঃ হরিরামপুরেই থাকিবে, এবং তাহাদের বেতন ও আহারাদির সমস্ত ব্যয় হরিরামপুরের প্রজাগণকেই বহন করিতে হইবে। তালুকদার সসৈন্য মহালে প্রত্যাগমন করিয়া এই সকল অতিথির আতিথ্য-সৎকারের ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকায় স্ত্রী কন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাতের অবসর হইল না। মহামায়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া কন্যাসহ ফিরিয়া আসিলেন।

মহামায়া কন্যার কেশসংস্কার অসম্পূর্ণ রাখিয়াই উঠিয়া গিয়াছিলেন ; তিনি পুনর্ব্বার তাহার চুল বাঁধিতে বসিলেন। তিনি দেখিলেন, আয়না, চিরুণী, ফুলেল তেল প্রভৃতি প্রসাধন-সামগ্রী যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেগুলি সেই স্থানেই আছে—নাই কেবল সেই কারু-কার্য্য খচিত মূল্যবান জরির ফিতাটি ; তাহা অদৃশ্য হইয়াছে !

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহামায়া বিচলিতস্বরে বলিলেন, 'ফিতেটা দেখ্‌ছি নে কেন রে! ফিতে কে নিলে?'

রমণী দাসী পাশের ঘরে কাজ করিতেছিল; প্রভু-পত্নীর চীৎকার শুনিয়া সে আপন-মনেই বলিতে লাগিল, 'এত দিন এ সংসারে আছি, খড়কুটোটুকুও কখনও এদিক-ওদিক হয় নি। এখন কত হবে, কত যাবে! চোখ আছে দেখ্‌বো, কান আছে শুন্‌বো।'

রমণীর এই মন্তব্য মহামায়ার কর্ণগোচর হইল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে লো রমণি! তুই বল্‌ছিস্ কি?'

দাসী উত্তর করিল, 'না মা, আমি কিচ্ছু বলি নি। হবে আবার কি? আমরা গরিব মানুষ, গতর খাটিয়ে খাই; আমাদের মত আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নিতে যাওয়া কেন? আমাদের মুখ বুঁজে চুপ্ করে থাকাই ভাল।'

মহামায়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, 'কেন লো! চুপ্ করে থাক্‌বি কেন? ফিতে কোথায় গেল, যদি জানিস্ ত শীগ্‌গির বল। নৈলে ঝাঁটা-পেটা করবো, তা জানিস্?'

রমণী এবার তাহার হস্তস্থিত সম্মার্জ্জনী সশব্দে মেঝের উপর ফেলিয়া কর্ত্রীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, 'তোমাদের এই রকমই বিচের বটে! ফিতে চুরী করলে একজন, আর ঝাঁটা-পেটা করবে আমাকে? খাসা বিবেচনা যা হোক্ মাঠাকরুণ, তোমার!'

মহামায়া বলিল, 'কে ফিতে চুরী করেছে—তা জানিস্ যদি তবে বল্‌চিস্ নে কেন? কার ঘাড়ে তিনটে মাথা যে—'

মহামায়ার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রমণী তীব্রদৃষ্টিতে সত্যবালার দিকে চাহিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল, 'সত্যি কথা বলি ত দিদি রাগ করবে, আর যদি না বলি ত তুমি ঝাঁটা-পেটা করবে! ঐ যে কথায় বলে, 'বল্‌লে মা মার খায়—না বল্‌লে বাপে এঁটো খায়'—আমারও হয়েছে সেই দশা। কাজ কি আমার এত ঝক্‌মারিতে? আমার মাইনে-পত্তর চুকিয়ে দাও, আমি দ্যাশে চলে যাই;—দ্যাশে আমার দ্যাওরের তিনখেন নাঙল, দেড় 'খাদা' আবাদ! আমার কি ভাতের দুক্কু?'

রমণী বীরদর্পে তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। তাহার চক্ষুতে জলের ধারা বহিল, সঙ্গে সঙ্গে নাক ঝাড়িবার ফোঁৎ-ফোঁৎ শব্দ; গর্জ্জন ও বর্ষণ সমভাবে চলিতে লাগিল!

সত্যবালা এতক্ষণ অবাক্ হইয়া বসিয়া ছিল; রমণীকে সক্রোধে প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া সে বলিল, 'ছাখ্ রমণি, সব তাতেই তোর বাড়াবাড়ি! আমি ত রাগ করে তোদের দু' বেলা ফাঁসি দিই! আমি কিজন্যে রাগ করতে যাব? তুই যা জানিস্, এক্‌খুনি বল। আমাকে খোঁটা দিয়ে কথা বল্‌চিস্—এ তোর কি রকম আক্কেল লো?'

রমণী এবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কটিদেশে উভয় হস্ত সংস্থাপনপূর্ব্বক অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিতে

আরম্ভ করিল, 'তবে রাগ করো না দিদিমণি! যেই তোমরা মায়ে ঝিয়ে কর্ত্তাবাবুর সাতে দেখা করতে উঠে গেলে, আর তক্ষুণি, বল্লে না পিত্যয় যাবা, তোমার ভালবাসা ঐ সুমতি ঠাকরুণ এদিকে ওদিকে একবার তাকিয়ে টপ্ ক'রে তোমার ফিতেটা তুলে নিয়েই পেট্-কোঁচড়ে গুঁজে ফেল্লে, তারপর উঠে চট্ করে স'রে পড়লো! আমি ঘরের মদ্দি থেকে বামুনের মেয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে থ' হয়ে দেঁড়িয়ে থাক্‌লাম। দুটি চোক্ষের মাথা খাই, যদি মিত্যে কথা বলে থাকি। এখনও দিনের পর রাত্তির হচ্চে, মাথার ওপর চন্দোর সুয্যি উঠ্‌চে। ভয়ে এখনও আমার বুকের মদ্দি ধড়াস্ ধড়াস্ কচ্চে। ধন্যি মেয়ে যা হোক, সাবাস্ বামুণীর বুকের পাটা!'

সত্যবালা ও তাহার মা যখন উঠিয়া যান, তখন সেখানে সুমতি ভিন্ন আর কেহই ছিল না, সুতরাং রমণীর কথা সত্য বলিয়াই মহামায়ার ধারণা হইল; কিন্তু সত্যবালা কোনও মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া জননীর অলক্ষ্যে খিড়কী দিয়া তাড়াতাড়ি বাসা হইতে বাহির হইল। মহামায়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া সক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে 'হাট্‌কুড়ি' 'সর্ব্বনাশী' প্রভৃতি সুললিত শব্দ প্রয়োগে সুমতির শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

সুমতি সবেমাত্র বাড়ী আসিয়া হাত পা ধুইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছে—এমন সময় সত্যবালা ব্যগ্রভাবে তাহার সম্মুখে আসিয়া হাত দু'খানি ধরিয়া, কাতরস্বরে বলিল, 'দেখ ভাই, যে কাজ তুমি করে এসেছ—তা আমার বিশ্বাস না হ'লেও, রমণী

বল্‌ছিল, সে নিজের চোখে তা দেখেছে! সে মাকে সব কথা বলে দিয়েছে। কথাটা বাবার কাণে উঠ্‌লে সর্ব্বনাশ হবে ভাই! তিনি যে রাগী মানুষ, হয় ত কি অনর্থ ঘটিয়ে বস্‌বেন! এ বিপদে আমাকে ভাই রক্ষে কর।'

সুমতি অবাক্ হইয়া সত্যবালার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; অবশেষে সে মানসিক চাঞ্চল্য ও বিস্ময় দমন করিয়া সত্যবালাকে বলিল, 'তোমার কথা ত আমি বুঝ্‌তে পাল্লাম না ভাই! আমি কি করেছি? রমণী কি দেখেছে, তোমার মাকেই বা কি বলেছে?'

সত্যবালা বলিল, 'আমার কাছে সে কথা লুকোচ্চ কেন ভাই? ফিতেটা আমাকে ফিরিয়ে দাও; কথাটা যাতে চাপা পড়ে, আমি তার একটা উপায় করবো। তোমার বদ্‌নাম আমি সহ্য করতে পারবো না।'

সুমতি যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, 'ফিতের কথা কি বল্‌ছো কিছুই ত বুঝ্‌তে পারচি নে।'

সত্যবালা বলিল, 'বুঝ্‌তে পেরেছ বৈ কি! মনের অগোচর ত পাপ নেই। আমার মাথার সেই জরির ফিতেটা কোথায় দেখি তোমার পেট-কোঁচড়।'

এই কথা বলিয়াই সত্যবালা সুমতির পরিধেয় বস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল, কিন্তু ফিতাটি তাহার নিকট পাওয়া গেল না। তখন সত্যবালা সুমতিকে তাহার কাপড় ঝাড়া দিতে বলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুমতি এতক্ষণে সত্যবালার অভিযোগ বুঝিতে পারিয়া ক্ষোভে দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্যবালা! তুমি বল্‌ছ কি? আমি তোমার ফিতে চুরী করে এনেছি—এ কথা কি তোমার বিশ্বাস হয়? উঃ, কি অপকলঙ্ক!'

সত্যবালা বলিল, 'আমি তোমাকে চুরী করতে দেখি নি, তোমার বদ্‌নামও করি নি। তুমি আমার ফিতে চুরী করবে—এ কথা আমি বিশ্বাসও করতে পারি নে। তবে রমণী বল্লে যে, সে না কি তোমাকে ফিতেটা পেট-কোঁচড়ে লুকিয়ে নিয়ে আস্‌তে দেখেছে!'

সত্যবালার কথা শুনিয়া সুমতির মাথা ঘুরিয়া গেল; সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল; এবং ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, 'ভাই, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বিধবা; তোমার ফিতে আমার কি কাজে লাগ্‌বে যে, আমি তা চুরী করে আন্‌ব?'

সত্যবালা বলিল, 'তবে আমার ফিতে গেল কোথায়? ফিতে ত পাখা বের করে উড়ে যায় নি, নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ নিয়েছে; তা ছাড়া সেখানে ত আর কেউ ছিল না।'

সুমতি বলিল, 'এ কি সর্ব্বনাশের কথা! আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? আমাকে যে দিব্যি করতে বল, সেই দিব্যি করে বল্‌চি, তোমার ফিতে আমি ছুঁইও নি। এমন অসম্ভব কথাটা তুমি বিশ্বাস করলে?—এ দুঃখ যে আমার মরলেও যাবে না।'

ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদের এই সকল কথা হইতেছিল ; ন্যায়রত্ন কিছু দূরে পিঁড়ায় বসিয়া তাহাদের কথোপ-কথন শুনিতেছিলেন। তিনি সত্যবালার কাছে আসিয়া তাহার মুখে কথাগুলি আর একবার শুনিলেন, তাহার পর সুমতিকে বলিলেন, 'মা, না বুঝে যদি সত্যবালার ফিতেটি এনে থাক, তবে এখনই ফিরিয়ে দাও। মানুষের পদে পদে মতিভ্রম হয়, বিশেষতঃ তুমি ছেলে মানুষ।'

সুমতি এতক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ছিল, পিতার কথা শুনিয়া দুঃখে, কষ্টে, অভিমানে সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, 'বাবা, তোমারও বিশ্বাস—সত্যবালার ফিতে আমিই চুরী করেছি ! ভগবানকে সাক্ষী করে বল্‌ছি, ওর ফিতে আমি স্পর্শও করি নি। যে কোনও দিন চুল বাঁধে না, চুলে চিরুণী ছোঁয়ায় না, ফিতেয় তার কি দরকার বাবা ? আমার মন কি তুমিও জান না বাবা ?'

সত্যবালা মুহূর্ত্তের জন্যও সুমতিকে চোর বলিয়া সন্দেহ করে নাই, কেবল রমণী দাসীর কথা শুনিয়াই সে সুমতির কাছে ফিতার সন্ধানে আসিয়াছিল। সুমতির ভাবভঙ্গী দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া সত্যবালা বুঝিল, সে সত্য কথাই বলিয়াছে ; সুমতি নিশ্চয়ই তাহার ফিতা চুরী করে নাই। চোর-সন্দেহে সুমতির পরিধেয় বস্ত্র অনুসন্ধান করায় সত্যবালার অত্যন্ত আত্মগ্লানি ও লজ্জা হইল। সে সুমতিকে দুই একটি সান্ত্বনার কথা বলিয়া বাড়ী ফিরিল। সে পথে আসিতে আসিতে

ভাবিতে লাগিল, সুমতি চোর নয়, তবে কে ফিতা চুরি করিল? কাহার এত সাহস?

কিন্তু সুমতির মনে এ সকল প্রশ্ন উদিত হইল না; যে মিথ্যা কলঙ্কের ভার তাহার মাথার উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছিল—সেই গুরুভার সে অসহ্য মনে করিল। দুঃখ, কষ্টে, লজ্জায়, ভয়ে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সে শরাহত বিহঙ্গশাবকের ন্যায় ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল, এবং ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ন্যায়রত্ন গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'মা জগদম্বা, এ আবার কি পরীক্ষা?'

*   *   *   *   *

তালুকদার গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া কাজি সাহেব তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন।

কাজি সাহেব অতি শীর্ণদেহ, ঘোরকৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায় পুরুষ। তাঁহার অস্থিসার চিবুকে অল্প কয়েক গাছি 'খোদার নুর' আছে। তাঁহার মস্তকে ফকীরের টুপী, পায়ে পায়জামা, গায়ে কাল বনাতের চাপ্‌কান, দেহের বর্ণের সহিত তাহা চমৎকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে। তাঁহার জবাফুলের মত লাল মোটা মোটা চক্ষু দুটি যেন অক্ষিকোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে! গঞ্জিকার প্রেমে মুগ্ধ না হইলে চক্ষু সাধারণতঃ এরূপ 'জবাকুসুম-সঙ্কাশ' হয় কি না সন্দেহ।

কাজি সাহেব তাঁহার ভগিনীপতি ফয়জু খাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে দশমুখে প্রশংসা করিতেছেন, এবং তাঁহার এক্তেলার বলেই তালুকদার জমাদারের অধীনে এতগুলি ফৌজ সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিয়াছেন বলিয়া স্বীয় ক্ষমতা ও আধিপত্য, এবং ভগিনীপতির নিকট তাঁহার কিরূপ প্রচণ্ড খাতির ও প্রতিপত্তি, তাহার পরিচয় দিতেছেন। আবার তালুকদারও সত্য মিথ্যা নানা কথায়, ফয়জু খাঁ যে তাঁহার শ্যালকের এক্তেলার যথেষ্ট খাতির সম্মান করিয়াছেন—ইহা সপ্রমাণ করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি-সাধনের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় সত্যবালার ফিতা-চুরী-সংক্রান্ত সকল বিবরণ দূতমুখে তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

কাজি সাহেব এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তিনি তাঁহার 'খোদার নূর' আন্দোলনপূর্ব্বক করতালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'সকলই খোদাতালার মর্জ্জি! নইলে কি এমন সময় এমন ঘটনা ঘটে? সকল নষ্টের গোড়া সেই হারামজাদা বুড়ো বামুনটাকে জব্দ করিবার জন্য ইহা খোদার খেলা ভিন্ন আর কি? এমন সরেশ সুযোগ ত্যাগ করা হইবে না।'

তালুকদার হর্ষবিগলিতস্বরে বলিলেন, 'আমি আর কি বলিব, আপনিই ধর্ম্মাবতার, কাজি। যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনি করুন! কিন্তু সেই বিটুলে বুড়ো বামুনটাই চক্রান্ত করিয়া আমার চূড়ান্ত অপমান করাইয়াছে, আমার মাথা কাটা গিয়াছে; ইহার উচিত বিচার আপনাকে করিতেই হইবে। বুড়োটা যেন জাল ছিঁড়িতে না পারে।'

কাজি বলিলেন, 'গোলা লোকে বামুন বেটার কি গুণ দেখিয়া তাহার খোসনাম করে বুঝি না, কিন্তু আমার আন্দাজ, এই বামুন বেটার মত পাজী নচ্ছার শয়তান এ ছুনিয়ায় আর ছুটি নাই। এই রায়ৎ ক্ষেপানোর মূলই সেই হারামজাদা; তাকে জব্দ করিতে পারিলে অন্য সকল রায়ৎ এক তাড়ায় শাসন হইয়া যাইবে। আপনি পীরের দরগায় সিন্নি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্নের ভগবদ্ভক্তি অতুলনীয়; শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে বসিলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইতেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত; অপূর্ব্ব পুলকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইত। ন্যায়রত্নের মনে যদি কখন বিন্দুমাত্র আত্মশ্লাঘার উদয় হইয়া থাকে, তবে তাহা শ্রীমদ্ভাবগতের ব্যাখ্যা লিখিয়াই হইয়াছিল; কিন্তু ইহাকে আত্মশ্লাঘা বা অহঙ্কার বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়,— ইহা তাঁহার আত্মপ্রসাদের নামান্তরমাত্র। এ জন্য তিনি কোনও কোনও শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখিয়া স্বয়ং দশ বার তাহা পাঠ করিতেন; তৃপ্তমনে অপরকে তাহা শুনাইতেন, এবং ভাবিতেন, এ প্রকার ভাব, মূল শ্লোকের এরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য পূর্ব্বে বুঝি আর কোনও ভাষ্যকারের কল্পনায় স্থান পায় নাই।

আবার পর মুহূর্ত্তেই এই পাণ্ডিত্যাভিমানের জন্য তিনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেন।

সুমতি গৃহকার্য্যাবসানে 'পিঁড়া'য় পিতার সম্মুখে উপবিষ্টা, ন্যায়রত্ন ভক্তিগদগদচিত্তে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ পাঠ করিয়া কন্যাকে শুনাইতেছিলেন, এমন সময় বাড়ীর বাহিরে কি একটা ভয়ানক সোরগোল শুনিতে পাইলেন! পর মুহূর্ত্তেই পূর্ব্বোক্ত কাজি সাহেব বিশ ত্রিশ জন যমদূতাকৃতি পাঠান কিঙ্কর সহ ন্যায়রত্নের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং অসঙ্কোচে তাঁহার 'পিঁড়া'য় উঠিয়া বিদ্রূপভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ঠাকুর, একেবারে মস্‌গুল হ'য়ে ও কি কেতাব পড়্‌চো?'

সুমতি কাজি সাহেবকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে ঘরের ভিতর লুকাইল। ন্যায়রত্ন পুঁথি বন্ধ করিয়া বলিলেন, 'আপনাদের কোরাণ সরিফের ন্যায় ইহা আমাদের একখানি পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ—'

ন্যায়রত্নের অপমান করাই কাজি সাহেবের এই অনধিকার-প্রবেশের উদ্দেশ্য। দুরাত্মার কখনও ছলের অসদ্ভাব হয় না; তিনি ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বিকৃতস্বরে বলিলেন, 'কি বল্লি, কাফের! আমাদের কোরাণ সরিফের সঙ্গে তোদের ভুতুড়ে কেচ্ছা ভরা কেতাবের তুলনা? কোরাণ সরিফের অপমান!'— তাহার পর, আমাদের লিখিতে লজ্জা হইতেছে—তিনি থু থু

করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপপূর্ব্বক, তাহার উপর নাগোরা জুতা চাপাইয়া সেই সুপবিত্র গ্রন্থখানি পদদলিত করিলেন! কিন্তু তাহাতেও তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধের উপশম না হওয়াতে তিনি পুস্তকখানি পদতল হইতে টানিয়া লইয়া তাহা ছিঁড়িতে উদ্যত হইলেন।

এই কল্পনাতীত বীভৎস ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, ন্যায়রত্ন মুহূর্ত্তকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরমপূজ্য পবিত্র গ্রন্থের শোচনীয় পরিণাম বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি কাজি সাহেবের হাত দুইখানি ধরিয়া ফেলিলেন, এবং অশ্রুপূর্ণনেত্রে কাতরস্বরে বলিলেন, 'দোহাই আপনার, পুঁথিখানি ছিঁড়িবেন না; ধর্ম্মের অপমান করা আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির শোভা পায় না।'

কাজি সরোষে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, 'কাফেরের আবার ধর্ম্ম, তার আবার মান!'

কাজি সাহেব সেই অসহায় দুর্ব্বল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহার উৎকট ধর্ম্মানুরাগ-প্রদর্শনের জন্য, এক ধাক্কায় ন্যায়রত্নকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাঁহার করকবলিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ন্যায়রত্নের বহু যত্নের, বহু পরিশ্রমের ও বহু আদরের গ্রন্থখানি মুহূর্ত্তে ছিন্ন কাগজের স্তূপে পরিণত হইল! তাঁহার প্রাণে কি নিদারুণ আঘাত লাগিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। অশ্রুধারায় তাঁহার ক্ষোভ-কম্পিত বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল।

কাজি সাহেব পুঁথিখানি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া, মোহম্মদ গজনী বা আরঙ্গজেবের ন্যায় অসাধারণ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন ভাবিয়া মনের আনন্দে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। যেন রৌদ্রতপ্ত নিদাঘ-মধ্যাহ্নের উদ্দাম ঝটিকা শ্মশানের উপর দিয়া বহিয়া গেল!

ন্যায়রত্নের অপ্রশস্ত গৃহ-প্রাঙ্গণ পাঠান সৈন্যে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহারা কাজি সাহেবের আদেশ পালনের জন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিল।

কাজি ন্যায়রত্নকে বলিলেন, 'তোমার ধর্ম্মজ্ঞানের ঝাঁপি সেই লেড়্‌কী কোথায়—যে তালুকদারের বাড়ী থেকে তাঁর মেয়ের ফিতে চুরী ক'রে এনেছে?'

সুমতি তখন ঘরের এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল, আর মনে মনে বলিতেছিল, 'হে হরি, হে মধুসূদন রক্ষা কর।'

কাজি ন্যায়রত্নের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সুমতিকে আক্রমণপূর্ব্বক সবেগে তাহার কেশাকর্ষণ করিলেন!

সুমতি দুঃখে, ভয়ে, অপমানে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, 'বাবা বাঁচাও, বাবা গো রক্ষা কর!'

ন্যায়রত্ন কন্যার সাহায্যের জন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই কাজি সুমতির কেশাকর্ষণ করিয়া, তাহাকে ঘরের বাহিরে টানিয়া আনিলেন; তাহার পর তাহার পিঠে এমন এক ধাক্কা দিলেন

যে, সে 'পিঁড়া' হইতে উঠানে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ পাঠানদের আদেশ দেওয়া হইল—তাহারা যেরূপে পারে, তাহার নিকট হইতে চোরা মাল আদায় করুক।

এই আদেশ শ্রবণমাত্র দুইজন পাঠান লাফাইয়া পড়িয়া, ধরাতলে বিলুণ্ঠিতা অভাগিনী সুমতিকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিল; আর দুই পিশাচ 'ফিতা কোথায়—বাহির কর!' বলিয়া তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিল।

সুমতি আঘাত-যন্ত্রণায় মাটীতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল; অবশেষে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তথাপি পাষাণহৃদয় পাঠানগণের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না, কাজি মহা উল্লাসে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান দেখিতে লাগিলেন; তাঁহার ইঙ্গিতে পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাত চলিতে লাগিল। সুমতির পিঠ ফাটিয়া শোণিতের স্রোত বহিল, তাহার কোমল অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল; রক্তধারায় মৃত্তিকা সিক্ত হইল।

ন্যায়রত্ন দুর্বৃত্তগণের কবল হইতে সুমতিকে রক্ষা করিবার অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া স্বীয় শীর্ণ দেহ দ্বারা কন্যাকে আচ্ছাদিত করিলেন, কাতরকণ্ঠে বলিলেন, বাপু সকল, আর মের না, আর মের না; দোহাই কাজি সাহেব, রক্ষা করুন, মেয়েটাকে হত্যা করবেন না।'—কিন্তু তাঁহার অনুনয় বিনয় নিষ্ফল হইল, দুই চারি ঘা বেত তাঁহার পিঠেও পড়িল।

কাজির যে সকল পাঠান অনুচর ন্যায়রত্নের অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া প্রফুল্ল চিত্তে সহযোগিদের বীরত্ব সন্দর্শন

করিতেছিল, কাজিসাহেব তাহাদিগকে চোরা মালের অনুসন্ধানে ঘর খানাতল্লাসী করিবার আদেশ প্রদান করিলে, তাহারা ন্যায়রত্নের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাঁড়ি, কলসী, থালা, বাসন, বিছানা প্রভৃতি তৈজসপত্রাদি সশব্দে আঙ্গিনায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ন্যায়রত্নের বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়িয়াছে—এইরূপ একটা মহা কোলাহল উত্থিত হইল। পাঠানগণের হুহুঙ্কারে সমগ্র পল্লী প্রকম্পিত হইতে লাগিল! কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহারা ন্যায়রত্নের কুটীর হইতে চোরামাল বাহির করিতে পারিল না; তালুকদার-কন্যার ফিতার সন্ধান হইল না। তখন কাজি সাহেব ন্যায়রত্নের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, 'ওরে কাফের, লোকে না কি বলে—তুই বড় ধার্ম্মিক! মেয়েকে চুরী বিদ্যা শিখানোই বুঝি কাফেরের ধর্ম্ম? তুই জেনে শুনে সেই চোরা মাল নিজের দখলে রেখেছিস্; যদি ভাল চাস্ ত ফিতে বের ক'রে দে।'

ন্যায়রত্ন ধীরে ধীরে বলিলেন, 'কাজি সাহেব, আপনার যা ইচ্ছা বল্‌তে পারেন; আপনার প্রবল প্রতাপ—যা খুসী তাই করছেন। আমরা দরিদ্র বটে, কিন্তু ভগবান আমাদের চুরী কর্‌বার প্রবৃত্তি দেন নি। ফিতা ত তুচ্ছ জিনিস, মহামূল্য ধনরত্নেও আমাদের লোভ নেই; তেমন বংশেই আমাদের জন্ম নয়। আমার মেয়ে কখনও চুরী করে নি, আমার ঘরেও কোনও চোরা মাল নেই।'

ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া কাজি সাহেবের ক্রোধ বর্দ্ধিত হইল।

তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অকথ্য ভাষায় গালি বর্ষণ করিতে করিতে যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার কারপরদাজদের আদেশ করিলেন, 'এই বুড়া শয়তান ও তার মেয়ের হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি দিয়ে, দু'জনকেই তালুকদারের কাছারীতে নিয়ে চল্।'

এইরূপে চুরীর তদন্ত শেষ হইলে কাজি সাহেব বিজয়গর্ব্বে স্ফীত হইয়া সদন্তে অনুচরবর্গ সহ ন্যায়রত্নের গৃহ ত্যাগ করিলেন।

* * * *

সূর্য্যদেব কোন্ দিন কাহার ভাগ্যে কি ভাবে উদিত হইয়া থাকেন, তাহা কে বলিতে পারে? আজ প্রভাতে যখন তিনি উদিত হন, তখন ন্যায়রত্নের চিত্ত শান্তি ও প্রফুল্লতায় পূর্ণ ছিল; তাঁহার মুখ প্রভাতারুণের আলোকের ন্যায় স্নিগ্ধ হাস্যে উজ্জ্বল ছিল: গ্রামস্থ জনসাধারণের নিকট তাঁহার মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ ছিল; তাঁহার বংশগৌরব অম্লান ছিল; কিন্তু দেব অংশুমালী দিবাবসানে অস্তমিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার জীবনে কি যুগান্তরব্যাপী পরিবর্ত্তনই না সংঘটিত হইল! দুরপনেয় কলঙ্কপশরা মস্তকে লইয়া, মিথ্যা চৌর্য্যাপবাদে আততায়ীর হস্তে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া ঘৃণিত তস্করের বেশে তাঁহাকে ও তাঁহার পবিত্র হৃদয়া প্রাণাধিকা দুহিতা সুমতিকে রাজপথে বাহির হইতে হইল! নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! বিধাতার কি বিচিত্র বিধান!

পথে জন মানবের সমাগম নাই। কাজি সাহেব ন্যায়রত্নের গৃহে উপস্থিত হইয়া খানাতল্লাসী আরম্ভ করিয়াছেন শুনিয়া প্রতিবেশিবর্গ সকলেই স্ব স্ব অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। যাহাদের কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল, তাহারা কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া দূর হইতে সভয়ে পথের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিল; কিন্তু নিকটে গিয়া ব্যাপার কি দেখিতে, বা সেই পৈশাচিক অত্যাচারের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হয় নাই।

কোনও পাড়াতেই কাহারও সাড়া শব্দ নাই! চারিদিক গভীর নিশীথিনীর ন্যায় নিস্তব্ধ; যেন সমগ্র পল্লী জনমানবশূন্য, পরিত্যক্ত! কেহ কোনও অপরিহার্য্য কারণে দৈবাৎ পথে বাহির হইয়া থাকিলে, দূর হইতে ন্যায়রত্ন ও সুমতিকে দেখিয়া—পাছে দৃষ্টি-বিনিময় হইলে তাঁহারা লজ্জা পান, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জনকোলাহল-মুখরিত গ্রামখানি যেন নিরানন্দময় বিজন শ্মশানের আকার ধারণা করিল।

ন্যায়রত্ন এই ভাবে নিগৃহীত হইবার কয়েক ঘণ্টা পরে—সায়ংকালে তাঁহার দুই এক জন প্রতিবেশী অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিল। ক্রমে অনেকে একত্র সম্মিলিত হইল; কিন্তু তাহাদের কাহারও মুখে কোনও কথা নাই; তাহাদের সকলেরই মাথার উপর দিয়া কি যেন একটা দারুণ বিপদের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে; সকলেই মুহ্যমান, ক্ষোভে দুঃখে সকলেই যেন

মৃতকল্প! তাহারা ম্লানমুখে হতাশ্‌ভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

অবশেষে এক জন প্রতিবেশী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'কি বিষম সর্ব্বনাশই হ'য়ে গেল!'

দ্বিতীয় প্রতিবেশী গভীর বিষাদভরে বলিল, 'যা না হ'বার তাই হ'ল! কে ভেবেছিল যে, এমন ভগবদ্ভক্ত নিষ্পাপ সাধু পুরুষের অদৃষ্টে এমন সর্ব্বনাশ ঘটবে?'

তৃতীয় প্রতিবেশী বলিল, 'আজ তাঁর সর্ব্বনাশ হ'ল, কাল তোমার হবে, তার পর দিন আমার হবে! স্বায়রত্নেরই যখন এই অবস্থা, তখন তোমার আমার বা গ্রামের অন্য সকলের নিরাপদে থাক্‌বার আশা কোথায়?'

চতুর্থ প্রতিবেশী বলিল, 'আর আশা! পৈতৃক ভিটে ছেড়ে না পালালে কারও নিষ্কৃতি নেই। শেষে বুঝি সাত পুরুষের ভদ্রাসন ত্যাগ করতে হয়!'

প্রথম প্রতিবেশী বলিল, 'অকারণ ব্রাহ্মণের এই রকম অপমান ক'রে কি তালুকদারের মঙ্গল হবে? এখনও চন্দ্র-সূর্য্য উঠ্‌ছে, দিনের পর রাত হচ্ছে।'

তৃতীয় প্রতিবেশী মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তা না হ'লে আর ঘোর কলি বল্‌বে কেন? শাস্ত্রেই ত বলেছে—'কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।'—এই কলিযুগে ভাল লোকের অপমান হওয়া ছাড়া অন্য গতি নেই রে বাবা! শাস্ত্রের কথা কি মিথ্যে হবার যো আছে?'

দ্বিতীয় প্রতিবেশী বলিল, 'সব্ সে চুপ্ ভাল। কাজ কি এ সকল কথায়? তালুকদারের চর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার কি একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে দেবে! মনের কথা মনেই থাক।'

এই যুক্তির সারবত্তা কেহ অস্বীকার করিতে পারিল না, প্রতিবেশীরা স্ব স্ব চরকা তৈলাক্ত করিতে চলিয়া গেল।

ন্যায়রত্ন ও সুমতি দুঃখে কষ্টে লজ্জায় ও অপমানে মৃতপ্রায়। তাঁহাদের পায়ে বেড়ী থাকায় পথে চলিতে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। দুই পাঁচ পা চলিয়াই তাঁহাদিগকে পথিমধ্যে বসিয়া পড়িতে হইল; সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীদের গর্জ্জন ও লাঠীর গুতা-বর্ষণ! 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' পড়িতেই তাঁহাদিগকে উঠিয়া আবার চলিতে হইল। তালুকদারের কাছারী অধিক দূরে নহে; কিন্তু এই সামান্য পথও যেন আর ফুরায় না!— দুঃখের পথ এমনই দীর্ঘ।

কিছু দূরে গিয়া সুমতি কাতরস্বরে বলিল, 'বাবা, আর ত চল্‌তে পারচি নে।'

অভাগিনী পথের ধূলার উপর শুইয়া পড়িল। ন্যায়রত্ন আর কি করিবেন? তিনি মাথায় হাত দিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িলেন; তাঁহার বিদীর্ণ হৃদয়ের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত মর্ম্মোচ্ছ্বাসে আত্মপ্রকাশ করিল; তিনি কেবল বলিলেন, 'হে ভগবান!'

সিপাহীরা ছিন্নমূলা লতিকার ন্যায় ধরালুণ্ঠিতা সুমতিকে উঠাইবার জন্য বিস্তর ঠেলাঠেলি করিল ; কিন্তু ধরাশয্যা হইতে আর তাহাকে উঠাইতে পারিল না। সুমতির অবস্থা তখন এতই শোচনীয় যে, তাহার আর পদমাত্র চলিবার শক্তি ছিল না; কিন্তু সেই ছাতুর দলের উদ্ভাবনী-শক্তি তাহাদের পৈশাচিকতার অনুরূপ ! তাহারা সুমতির হাতের হাতকড়িতে দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি ধরিয়া ইষ্টকবদ্ধ কঠিন পথের উপর দিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

সহৃদয় পাঠক, কোমলহৃদয়া পাঠিকা, সুমতির সেই অবস্থা কল্পনা করিতে পারেন কি ? সুমতির অর্দ্ধাঙ্গ—তাহার কটিদেশ হইতে পা পর্য্যন্ত মাটীতে ছেঁচড়াইয়া যাইতেছে ; ইষ্টকের সহিত ঘর্ষণে তাহার অর্দ্ধাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত ঝরিতেছে ; তাহার পরিধেয় বস্ত্র স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। এইরূপ অর্দ্ধোলঙ্গ রক্তাক্ত দেহে তাহাকে টানিতে টানিতে যখন তাহারা মর্ম্মাহত জীবন্মৃত বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন সহ তালুকদারের কাছারীতে উপস্থিত হইল, তখন জননী বসুন্ধরা এই লোমহর্ষণ দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া লজ্জায় সন্ধ্যার তিমিরাবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন।

রমণী সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিল। পথিমধ্যে সে সুমতির দুর্দ্দশা দেখিয়া মনের আনন্দে কোথায় পা ফেলিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না ; সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে মহামায়ার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, এবং

করতালি দিয়া হর্ষোচ্ছ্বাসিতস্বরে বলিল, 'বেশ হয়েছে ; যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল !'

মহামায়া তাহার এই আকস্মিক আনন্দোচ্ছ্বাসের কারণ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে লো ? তুই যে আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়েছিস্ !'

রমণী হাত নাড়িয়া বলিল, 'আহ্লাদ হবে না ? সেই বুড়ো বামুনটার আর তার নচ্ছার মেয়েটার হাতে পায়ে বেড়ি পড়েছে, মা ! সিপুইরা সব্বাই মিলে ছুঁড়ীটাকে টেনে-হেঁচ্‌ড়ে নিয়ে আস্‌ছে, তার গা কেটে দদ্দরিয়ে 'অক্ত' পড়ছে। হ্যাঁ দ্যাখো মা, ছুঁড়ীটার জান কি টন্‌কো ! এট্টু কাঁন্‌চে না, ককাচ্চে না। আমরা হ'লে কালামুখ দ্যাখাবার আগে গলায় দড়ি দিতাম।'

মহামায়া রমণীকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে বৈঠকখানার একটী পাশ-কুঠুরীতে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; এই সংবাদ শুনিয়া সত্যবালাও তাঁহার পাশে উপস্থিত হইল। সুমতির দুর্দ্দশা দেখিয়া সত্যবালার হৃদয় বিদীর্ণ হইল ; তাহার চক্ষু ফাটিয়া প্রবলবেগে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহার মাতার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল, এবং অশ্রুধারায় তাঁহার চরণ সিক্ত করিয়া সুমতিকে মুক্তিদানের জন্য তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে লাগিল।

মহামায়া সরিয়া গিয়া স্বামীকে ডাকিলেন। কয়েক মিনিট তালুকদারদম্পতির গোপনে কি পরামর্শ হইল। অবশেষে

তালুকদার কাজি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, দীর্ঘ কাল ধরিয়া নিভৃতে তাঁহার সহিত কি যুক্তি-পরামর্শ করিলেন।

পরামর্শ শেষ হইলে, তালুকদার ন্যায়রত্নের হস্ত পদ শৃঙ্খল-মুক্ত করিয়া পরদিন তাঁহাকে কাজি সাহেবের দরবারে হাজির হইবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দান করা হইল বটে, কিন্তু সিপাহীরা সুমতির বন্ধন মোচন করিল না, তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্ন যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে ; দুই একটি নক্ষত্র ফুটিয়াছে। চন্দ্রালোকে ন্যায়রত্নের ঘরখানি যেন মনের দুঃখে অন্ধকারে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে! তাঁহার স্নেহের ধন, নয়নের পুত্তলি, মমতার সজীব প্রতিমা সুমতিকে যমদূতেরা বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে ; তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণ নিরানন্দময় শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার শয্যা, উপাধান ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ; হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি তৈজসপত্র চূর্ণ বিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত ; তাহাতে যে সকল খাদ্য সামগ্রী ছিল, শৃগাল কুকুরের দল তাহা ভক্ষণ করিতে করিতে পরস্পরকে আক্রমণপূর্ব্বক ঘোর কোলাহল করিতেছে। অতি বীভৎস দৃশ্য!

যে শান্তিসুখপূর্ণ পবিত্র গৃহে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হইয়াছে ; বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের শত মধুর স্মৃতিতে যে গৃহ সমলঙ্কৃত ; সেই গৃহের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শন করিয়া নিদারুণ শোকাবেগে ন্যায়রত্নের হৃদয় অভিভূত হইল। তাঁহার উভয় চক্ষু ফাটিয়া প্রবলবেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সংসারে আসক্তিরহিত, নির্লিপ্ত, সংযত-চিত্ত ব্রাহ্মণ আর কোনও প্রকারে আত্ম-সংযম করিতে পারিলেন না ; তিনি বিদীর্ণহৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'সুমতি, মা, মাগো !'

তাঁহার সেই হৃদয়বিদারক কণ্ঠধ্বনি, ব্যথিত হৃদয়ের করুণ আর্ত্তনাদ নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, গগন ভেদ করিয়া, চন্দ্রালোকিত আকাশের ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতম প্রদেশে উত্থিত হইল ; প্রতিধ্বনি যেন কাঁদিয়া বলিল,—

'নাই, সে নাই !'

ন্যায়রত্ন সারারাত্রি সেই শ্মশানভূমির এক প্রান্তে মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।

* * * *

* সুমতি চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্তা। তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে। সর্ব্বসন্তাপহারিণী মায়াবিনী নিদ্রাদেবীর অনুগ্রহে সুমতি কারাকক্ষের কঠিন ভূমিশয্যায় নিদ্রিতা হইয়াছিল। রাত্রিশেষে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে পূর্ব্ব দিনের সমস্ত ঘটনা—

তালুকদার-কন্যার ফিতা হারানো হইতে কাজি সাহেব কর্ত্তৃক তাহাদের গৃহলুণ্ঠন পর্য্যন্ত সকলই মনে পড়িয়া গেল। প্রথমে তাহা উৎকট দুঃস্বপ্ন বলিয়াই তাহার ভ্রম হইল; কিন্তু পর মুহূর্ত্তে তাহার হস্ত পদের লৌহশৃঙ্খল, সর্ব্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা, তাহার ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া কঠোর সত্যের মধ্যে তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলিল। সুমতি চাহিয়া দেখিল, তাহার শয়নকক্ষ অন্ধকারপূর্ণ, উর্দ্ধে কয়েকটি গবাক্ষপথে ক্ষীণ আলোক দেখা যাইতেছে; তাহার দক্ষিণে বামে—মস্তকে ও পদতলে ঘরের দেওয়াল স্পর্শ হইতেছে; তাহার পৃষ্ঠদেশ কয়েকগুচ্ছ তৃণের উপর প্রসারিত রহিয়াছে!

নিদ্রাভঙ্গে সুমতি সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা অনুভব করিল। পূর্ব্ব দিনের সকল ঘটনা মনে পড়িতেই, পিতার কথা তাহার মনে হইল। নিষ্ঠুর কাজির আদেশে তাহার পাঠান কিঙ্করেরা তাঁহাকেও এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছে, এবং অবশেষে তাঁহাকে তাহার মত করিয়াই হাজতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ভাবিয়া তাহার মন প্রাণ অত্যন্ত কাতর ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, প্রাণের আবেগে তাহার তৃণশয্যায় উঠিয়া বসিল। সে নিজের দুঃখ যন্ত্রণা সমস্তই বিস্মৃত হইল; তাহার পিতার কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহাই ভাবিয়া নিদারুণ হুতাশে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

সুমতি চক্ষু মেলিয়া দেখিল, চারিদিক অন্ধকার! চক্ষু মুদিয়া দেখিল, তাহার হৃদয়মধ্যেও মেঘমণ্ডিত শ্রাবণ-অমানিশার নিবিড়

অন্ধকার বিরাজিত! তখন সে উদ্বেলিতহৃদয়ে ব্যাকুলকণ্ঠে দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার বরাভয়প্রদ রাঙ্গা চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিল, 'মা গো জগজ্জননী, না বুঝিয়া যদি কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা কর; আমার বাবাকে রক্ষা কর, এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর।'

সুমতির বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল, সে যেন মা জগদম্বার অভয়চরণ দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া আছে, তাহার চিত্ত সেই পাদপদ্মে বিলীন হইয়া গিয়াছে; তাহার সংজ্ঞা নাই, চেতনা বিলুপ্ত।

সহসা দ্বার-উদ্ঘাটনের শব্দে তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সুমতি চক্ষু মেলিয়া চাহিল, চাহিয়া যাহা দেখিল,—সে ত মায়ের অভয় চরণ নয়! সে সভয়ে দেখিল, এক যমদূতাকৃতি ভীষণ-দর্শন পেয়াদা দ্বার খুলিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! নিশা অবসানপ্রায়, প্রভাতকল্পা শর্ব্বরীর অস্ফুট আলোকে সে সেই পেয়াদার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু সে মুহূর্ত্তে আত্ম সংবরণ করিয়া কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'পেয়াদা সায়েব, আমার বাবা কোথায়?'

পেয়াদা পৈশাচিক মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, 'তোর বাবা, সেই মড়ি-পোড়া বুড়ো বামুন?—তার কথা শুনে আর তোর কাজ নেই।'

সুমতি কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া বলিল,

'কেন পেয়াদা সায়েব, তাঁর কথা শুনে আর কাজ নেই বলছ কেন? তাঁর কি কোনও অমঙ্গল হয়েছে?'

পিশাচের মত হাসিয়া পেয়াদা বলিল, 'হুঁ, তার আঠার আনা মঙ্গল! শুন্‌বি তবে? তোর যে দশা, তারও সেই দশা হয়েছে! এখন তোকে পুছ করতে চাই, চোরা মাল ফেরত দিবি কি না? যদি ফেরত দিস্‌, তবেই ত তোদের বাঁচন; নৈলে তোর সাম্‌নে তোর বাপ সেই বুড়ো বামোনকে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দ্যাওয়া হবে; তার পর জল্লাদের খাঁড়ায় তোর মাথা কাটা যাবে।'

পেয়াদার কথা শুনিয়া সুমতির মুখ শুকাইল, তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল, 'কেন পেয়াদা সায়েব! যদি কোনও অপরাধ করে থাকি, আমিই করেছি; আমার বাবার কি দোষ? তাঁকে এত যন্ত্রণা দিচ্ছ কেন?'

পেয়াদা বলিল, 'তোর বাপের দোষ নেই? সেই বুড়ো বেটারই ত যত দোষ! সেই তোকে চুরী করতে শিখিয়েছে, চোরা মাল সে-ই ত ঘরে লুকিয়ে রেখেচে। এই যে গাঁয়ের বিলকুল রায়ৎ ক্ষেপে উঠেছে, সে-ও ত তারই নষ্টামীতে হয়েছে;—এখন তুই বলছিস্‌ তোর বাবার দোষ কি?'

পেয়াদার কথাগুলি সুমতির কর্ণে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ! তাহার পিতাকে কুকুরের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইবে,—কুকুরে তাঁহাকে ভক্ষণ করিবে শুনিয়া সুমতি ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল। সে হতাশভাবে একদৃষ্টে পেয়াদার মুখের

দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সেই নির্নিমেষ দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত, তাহার মন প্রাণ যেন দেহ ছাড়িয়া কোন্ সুদূর রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে!

পেয়াদা সুমতিকে ধাক্কা দিয়া বলিল, 'তুই ভাব্‌ছিস কি?'

সুমতি নিদ্রোত্থিতার ন্যায় বলিল, 'অ্যাঁ, কি বল্‌ছ? আমার বাবা—'

পেয়াদা বলিল, 'চোরা মাল ফেরত দিবি কি না বল!'

সুমতি বলিল, 'চোরা মাল? কোথায় চোরা মাল? চোরা মালের কথা কিছু জানি নে, বল পেয়াদা সায়েব, বল আমার বাবা কোথায়?'

পেয়াদার ধৈর্য্যধারণ করা অতঃপর কঠিন হইল; সে তাহার হস্তস্থিত তৈলপক্ক বাঁশের লাঠী দ্বারা সুমতির স্কন্ধে গুঁতা মারিয়া বলিল, 'আজ তোদের মামলা হবে, তার পর সাজা! দুটো মস্তো মস্তো ডালকুত্তোকে কাল থেকে খেতে দেওয়া হয় নি, তারা শুকিয়ে আছে। একাদশীতে তোরা উপোস পাড়িস্‌নে? সেই রকম তারা উপোস পেড়ে আছে; আজ তারা পেট ভ'রে তোর বাপের গোস্ত খাবে। মুর্গি জবাই করে ছেড়ে দিলে যেমন ধড়ফড় করে,—তোর বাবা কুকুরের খাবলানিতে তেমনই ধড়ফড়িয়ে মরবে।—চুরী কবুল করলি নে, তোর বাবা চোরা মালও বের করে দিলে না, মজাটা টের পাবে এখন।'

পেয়াদা বক্তৃতা শেষ করিয়া প্রস্থান করিল। তাহার পশ্চাতে কারাদ্বার রুদ্ধ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুমতি একাকিনী সেই ঘোর-অন্ধকার-পূর্ণ কারা-প্রকোষ্ঠে বসিয়া অবনতমস্তকে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল। দীর্ঘকাল চিন্তার পর সে স্থির করিল, তাহার প্রাণ যায় যাক্, যে উপায়েই হউক, পিতার প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। বিচারকালে যদি সে চুরী স্বীকার করে, যদি সে বলে,—চোর সে নিজে, তাহার পিতার কোনও অপরাধ নাই,—তাহা হইলেও কি তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইবে না? কিন্তু কাজি সাহেব নিশ্চয়ই চোরা মাল বাহির করিয়া দিতে বলিবে, ফিতাটি ফেরত চাহিবে; তখন?—তখন সে কিরূপে ফিতা বাহির করিয়া দিবে?—সুমতি ভাবিল, তখন সে বলিবে, পথে আসিতে আসিতে ফিতাটি কোথায় পড়িয়া গিয়াছে—তাহা খুঁজিয়া পায় নাই।

এইরূপ মিথ্যার সাহায্যে সুমতি তাহার পিতার জীবনরক্ষার সঙ্কল্প করিল। হায়, সংসারজ্ঞানহীনা সরলা বালিকা!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্ন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার বহু যত্নের ও বহু পরিশ্রমের ফল শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যখানি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে পড়িয়া আছে; ছিন্ন পত্রগুলি নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত! তাঁহার শোণিততুল্য প্রিয়, পরম পবিত্র গ্রন্থখানির

এই দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি তাঁহার অঙ্গ হইতে নামাবলিখানি অপসারিত করিয়া তাহা মৃত্তিকায় প্রসারিত করিলেন, এবং গ্রন্থের ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত পত্রগুলি নানা স্থান হইতে সংগৃহীত করিয়া নামাবলির উপর রাখিয়া পুঁটুলী বাঁধিলেন, তাহা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক মনে মনে বলিলেন, 'হে হরি, হে মধুসূদন, আমি অতি অধম, অকিঞ্চন, জ্ঞানহীন মূঢ়; তোমার অনন্ত লীলা আমি কিরূপে বুঝিব? আমার কি সাধ্য যে, তোমার অনন্ত মহিমার আধার এই পবিত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা করি! হে দর্পহারী মধুসূদন, তুমি আমার পাণ্ডিত্যের দর্প চূর্ণ করিয়া আমার মস্তক মাটীর ধুলার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছ। ম্লেচ্ছের হস্তে আমার এই লাঞ্ছনা, নিগ্রহ তোমারই প্রদত্ত দণ্ড; তোমার অপার করুণায় নির্ভর করিয়া এই কঠোর দণ্ড নির্ব্বিকারচিত্তে সহ্য করিবার শক্তি আমাকে দান কর হরি!'

ন্যায়রত্ন ছিন্ন গ্রন্থের পত্রগুলি মস্তকে ধারণ করিয়া মুদিতনেত্রে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় কাজি সাহেবের পেয়াদা স্থূল বংশদণ্ড হস্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া হুঙ্কার দিল, 'ঠাকুর!—ও ঠাকুর!'

ন্যায়রত্নের চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। তিনি চক্ষু উন্মিলন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান সেই দীর্ঘদেহ, মল্লবেশী, দণ্ডধারী পাষণ্ড পদাতিকের বিকট মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ন্যায়রত্নকে নীরব দেখিয়া পেয়াদা তাহার হস্তস্থিত সুলোহিত

বংশদণ্ড দ্বারা মৃত্তিকায় আঘাত করিয়া মাথা ঘুরাইয়া বলিল, 'বলি, পুঁটুলী মাথায় নিয়ে চোক্ বুঁজে ভাবচিস্ কি? যমের সেরেস্তা থেকে তলপ হয়েচে, যাবি নে?'

ন্যায়রত্ন বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া অবিচলিতস্বরে বলিলেন, 'হাঁ বাবা, আমি যমালয়ে যাওয়ার জন্য সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত আছি, এখন তিনি ডাক্‌লেই বাঁচি।'

পেয়াদা তাম্বুলরাগরঞ্জিত দন্তপংক্তি উদ্ঘাটিত করিয়া বলিল, 'ডাক্‌তেই তো এসেছি, জোর তলপ, জল্‌দী চল্।'

ন্যায়রত্ন নিঃশব্দে উঠিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কাগজের পুঁটুলীটি যথাস্থানে রাখিয়া একখানি মলিন উত্তরীয় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া গৃহকোণ হইতে একখানি বাঁশের লাঠী সংগ্রহপূর্ব্বক পেয়াদার অনুসরণ করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে পেয়াদা বলিল, 'কাল যা হবার, তা তো হয়েই গিয়েছে; আজ কি হবে, তার কিছু খবর পেয়েছ ঠাকুর?'

ন্যায়রত্ন ঔদাসীন্যভরে বলিলেন, 'যা হবার, তা ত চরমই হয়ে গিয়েছে বাপু! হবার আর বাকি আছে কি?'

পেয়াদা সোৎসাহে বলিল, 'বাকি এখনও ঢের! আজ তোমার বিচের হবে। যে কাজ করেছ, তার জন্যে সাজা নিতে হবে না ঠাউরেছ না কি?'

ন্যায়রত্ন আর কোনও কথা বলিলেন না, নিঃশব্দে চলিতে লাগিলেন। সমুদ্রে যাহার শয্যা, শিশিরপাতে তাহার ভয়

কি? তিনি অবিচলিতচিত্তে কাজি সাহেবের হুজুরে হাজির হইলেন। কাজি তাঁহাকে দেখিয়াও যেন দেখিতে পান নাই, এই ভাবে কয়েক মিনিট মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ন্যায়রত্নকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'বুড়ো হ'লে মানুষের বুদ্ধি লোপ হয়, নইলে এই শেষ বয়সে তোমার এ রকম মতিচ্ছন্ন হবে কেন?'

ন্যায়রত্ন সংযতস্বরে বলিলেন, 'আমার মতিচ্ছন্ন হওয়ার কি পরিচয় পেয়েছেন?'

কাজি উদ্ধতস্বরে বলিলেন, 'তুমি লাখরাজে বাস কর; তোমাকে খাজানা দিতে হয় না। তুমি বামুন মানুষ, হিঁদুদের মোল্লা; তোমাকে কখনও নজর-সেলামী দিতে হয় নি। তবে তুমি প্রজাদের বদ্ পরামশ দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুল্‌লে কেন? তাদের খাজানা দিতে বারণ করে' মহালকে মহাল বিদ্রোহী করলে কেন?'

ন্যায়রত্ন দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, 'কোনও প্রজাকেই আমি খাজ্‌না দিতে নিষেধ করি নি। পিতৃপিতামহের আমল থেকে যার যে খাজনা ধার্য্য আছে, সেই গুজস্তা সুরত নিলে খাজানাও আদায় হ'তো, প্রজারা অবস্থানুযায়ী দশ টাকা নজর-সেলামীও দিত; কিন্তু তালুকদার চান্ টাকায় টাকা নজর, টাকায় আট আনা নিরিখ বৃদ্ধি! প্রজারা এ সকল কোথা থেকে দেয়?'

কাজি সাহেব ন্যায়রত্নের ন্যায়সঙ্গত কথা শুনিয়া অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, 'কি যে কও ঠাকুর, আর যদি মাথা মুণ্ডু কিছু

থাকে! তালুকদারের সঙ্গে যে খাজানায় মহাল বন্দোবস্ত হয়েছে, নিরিখ বৃদ্ধি ভিন্ন তার যে স্থিত দাঁড়ায় না। তালুকদার কি ঘর থেকে মালগুজারী সরবরা করবে?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন; 'আপনার এ প্রশ্নের জবাব প্রজারা কি ক'রে দেবে? 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন!'—মহালের অবস্থা না বুঝে, প্রজার অবস্থা না জেনে, তালুকদার জিদের বশে অন্যায় অতিরিক্ত কর ধার্য্যে মহাল নিলেন কেন? এ জন্যে যদি তাঁকে ঘর থেকে মাল্‌গুজারি সরবরাহ কর্‌তে হয়, তবে সে দায়িত্বভার তাঁকেই বহন করতে হবে; দরিদ্র প্রজার ঘাড় ভেঙ্গে সে টাকা আদায় করা কি তাঁর উচিত? তিনি এই অতিরিক্ত রাজকর ঘর থেকে দিয়ে মহাল রক্ষা করুন।'

কাজি সাহেব মুখের মত জবাব পাইয়া ক্রোধে অধিকতর উত্তেজিত হইলেন, বিকৃতস্বরে বলিলেন, 'তা তিনি করবেন না, করতে পারবেনও না। প্রজারা খাজানা না দিলে নবাব সরকারের মালগুজারির টাকা আদায় হবে না; আমি নবাব বাহাদুরের প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত থাকতে কখনই সরকারের লোকসান হতে দেব না; প্রজারা ঘাড় হেঁট করে এই 'বৃদ্ধি-নিরিখে' খাজানা দেবে; তোমার মত হাজার লোক তাতে বাধা দিয়েও কিছু করতে পারবে না।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'প্রজারা অসহায়, দুর্ব্বল, এই ভরসাতেই আপনি এ কথা বল্‌ছেন; কিন্তু অসহায়ের সহায়—ভগবান্‌ আছেন!'

কাজি ক্রোধে জলিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'যাদের কোনও মুরদ্ নেই, তারাই কথায় কথায় ভগবানকে দেখায়! তা বেশ, তোদের বাবা সেই ভগবান বেটাকেই ডেকে আনিস্, হিঁদুর ভগবান যেন মাথায় ফ্যাটা বেঁধে লাঠী ঘাড়ে নিয়ে প্রজাদের রক্ষা করতে আসে।—এখন যে জন্যে তোকে এখানে আনা হয়েছে—সে কথা শোন্। চুরী করলে কি চোরামাল দখলে রাখ্‌লে জবর রকম সাজা পেতে হয়—তা জানিস্ ত? তবে যদি চোরামাল ফিরিয়ে দিস্—তা হ'লে আমি মেহেরবাণি ক'রে কিছু কম সাজা দিয়েও তোদের ছেড়ে দিতে পারি। আমার দয়ার শরীর, তা ছাড়া মাছি মেরে হাত কালো করবার ইচ্ছেও আমার নেই। আজই তোদের অপরাধের বিচার হবে।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'বেশ কথা, বিচার হোক। বিচারে যদি আমাদের অপরাধ সপ্রমাণ হয়, বিচারপতি যে শাস্তি দেবেন—তাই গ্রহণ করবো; তবে ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে বল্‌তে পারি, আমার কাছে কোন চোরামাল নাই।'

কাজি বলিলেন, 'তোমার কাছে না থাকে, তোমার সেই হারামজাদী মেয়েটার কাছে আছে। অমন মেয়েকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে পার নি? সে বুড়ো বয়সে তোমার মুখে চুণ কালি দিলে, তার জন্যে তোমাকে বদ্‌নামের ভাগী হতে হ'লো! তোমার মেয়েই যে চুরী করেছে, তার প্রমাণের ত কোনও অভাব হয় নি।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আমি যদি তার জন্মদান করে থাকি,

আর এতকাল ধরে' আমি তাকে যে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছি, তা যদি মিথ্যা না হয়, তা হ'লে আমি বুকে হাত দিয়ে অহঙ্কার করে বল্‌তে পারি—কখনই সে চুরী করে নি! আমার মেয়ে চোর, এমন মিথ্যা অপবাদ যে দিতে পারে, নরকেও তার স্থান হবে না। আমার কন্যা চোর, এ কথা যে দিন সত্য হবে, সে দিন পতিব্রতা সতী কুলত্যাগিনী হবে, ধর্ম্ম সে দিন পৃথিবী থেকে অন্তর্দ্ধান করবেন।'

কাজি বলিলেন, 'থামো ঠাকুর! আর অত বাহাদুরী করতে হবে না; যদি ভাল চাও ত তোমার মেয়েকে বুঝিয়ে বল, চুরী করা ফিতেটি সে ফিরিয়ে দিক্।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আমি কোথায় আমার মেয়ের দেখা পাব?'

কাজি বলিলেন, 'আমি তার উপায় করছি।'

অতঃপর কাজি সাহেব ন্যায়রত্নকে সুমতির নিকট লইয়া যাইবার আদেশ দিয়া স্থানান্তরে চলিলেন।

* * * * *

সুমতি হাজত-ঘরে বসিয়া তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেছিল; সহসা দ্বারোদ্ঘাটন-শব্দে সে চমকিত হইয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল, তাহার পিতৃদেব দ্বার-প্রান্তে দণ্ডায়মান।

সুমতি 'বাবা!', 'বাবা!' বলিয়া ব্যগ্রভাবে উঠিতে গেল; তাহার পদদ্বয় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ, ইহা তাহার স্মরণ ছিল না, সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

ন্যায়রত্ন দুঃখিনী কন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বিদীর্ণহৃদয়ে ধরালুণ্ঠিতা কন্যার শিয়রপ্রান্তে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং সুমতির মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

সুমতি উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সংযত করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, 'বাবা, আজ না কি আমাদের বিচার হবে?'

ন্যায়রত্ন উদাসভাবে বলিলেন, 'সেই রকমই শুনছিলাম।'

সুমতি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, 'বাবা, আমি চুরী করেছি কবুল করব।'

ন্যায়রত্ন কন্যার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, সুমতির মস্তক ক্রোড় হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আবেগকম্পিতস্বরে বলিলেন, 'সুমতি, তোমার মুখে এ কথা শুনতে হবে, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর! তবে কি সত্যই তুমি—'

ন্যায়রত্ন কথাটি শেষ করিতে পারিলেন না, ক্ষোভে, নিদারুণ অন্তর্বেদনায় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল; অসহ্য মনস্তাপে তাঁহার অশ্রুর উৎস পর্য্যন্ত শুষ্ক হইল; এবং মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত ছিল, তাহা যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া উঠিল! তিনি শূন্যদৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন!

সুমতি তাহার পিতার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কাতরস্বরে বলিল, 'বাবা, তুমি তোমার অভাগিনী মেয়ের উপর রাগ করো'

না। স্থির হ'য়ে একটু বসো, বাবা! আমি চোর নই, এমন কুকর্ম আমি ক'রতে পারি নে; চুরী করা দূরের কথা, এমন কু-প্রবৃত্তি আমার মনেও স্থান পায় না, একথা কি তুমি জান না বাবা? আমার মনের কোন্ কথা, কোন্ চিন্তা তোমার অজ্ঞাত?—আমি চোর, এ ধারণা তোমারও মনে স্থান পাবে?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'তবে তুমি চুরী কবুল করতে চাও কেন? কোন্ লোভে তুমি এই মিথ্যা কলঙ্কের পশরা মাথায় তু'লে নিতে চাচ্ছ বলত!'

সুমতি বলিল, 'চুরী কবুল করলে যে শাস্তি হবে, সে শাস্তি আমি একাই ভোগ করবো। আমার অপরাধে তোমাকে ত দণ্ড ভোগ করতে হবে না; তোমার নিষ্কলঙ্ক পবিত্র চরিত্রে ওরা যে মিথ্যা কলঙ্কের কালী ঢেলে দিচ্ছে! আমি চুরী কবুল করলে তোমার সে কলঙ্ক ত দূর হবে; তুমি ত মিথ্যা অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। সেটাই কি আমার পক্ষে কম লাভ, বাবা? এ লোভ সংবরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব! বাবা, তোমার মুখেই শুনেছি, দেবতাদের মঙ্গলের জন্য দধীচি মুনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন; আর আমার স্বর্গ, আমার ধর্ম্ম, জপ, তপ, পিতৃদেব তুমি; তোমার মিথ্যা কলঙ্ক দূর করবার জন্যে, তোমার দুর্গতি নিবারণ করবার জন্যে, সেই মিথ্যা কলঙ্কের ডালি মাথায় তু'লে নিতে আমি ভয় পাব বাবা?'

ন্যায়রত্ন বুঝিলেন, তাঁহারই জন্য সুমতি আত্মবিসর্জ্জনে, আত্মবলিদানে উদ্যত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন ধীরে ধীরে কন্যার

নিকট উপবেশন করিলেন, স্নেহকোমল স্বরে বলিলেন, 'মা, আমার কলঙ্কমোচনের জন্য তুমি মিথ্যা কলঙ্কের ভার মাথায় নিয়ে ইহলোক ত্যাগ করবে সঙ্কল্প করেছ; কিন্তু মিথ্যা কলঙ্কে আমার কি ক্ষতি হবে? মিথ্যা কলঙ্কে কত মহাপুরুষকে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে; কত ধিক্কার, কত অভিশাপ তাঁরা নীরবে বহন করেছেন। তাঁহাদের তুলনায় আমি কীটেরও অধম। সর্ব্বান্তর্যামীর ত কিছুই অগোচর নয় মা! আর যদি শারীরিক যন্ত্রণার কথাই বল, তা হ'লেও তাতে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই; তুমি ত জান মা, ইহকালই আমাদের সর্ব্বস্ব নয়; জলের বুদ্বুদ ত জলেই মিশ্‌বে, মুহূর্ত্তকাল অগ্র-পশ্চাতে কি আসে যায়? যদি ওরা আমাকে ফাটকেই আবদ্ধ করে, তাতেই বা ক্ষতি কি? যে দিন জন্মগ্রহণ করেছি, সেই দিনই ত ফাটকে আটক হয়েছি; এত দিন এই সংসার-কারাগারের বড় একটা কক্ষে ছিলাম, এখন না হয় তার একটা ক্ষুদ্র কক্ষে আটক রাখ্‌বে।'

সুমতি বলিল, 'না বাবা, তোমাকে ফাটক দেবে না, তোমাকে না কি কুকুর দিয়ে খাওয়াবে। কি ভয়ানক কথা!'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'সামান্য একটা ফিতের জন্যে আমার প্রাণদণ্ড হবে, তা-ও আবার এ রকম নিষ্ঠুর ভাবে? তা হ'তেও পারে; এ রাজ্যে, বিশেষতঃ এ রকম মহাপিশাচ কাজির আমোলে কিছুই অসম্ভব নয়! যদি তা-ই হয়, আমাকে যদি কুকুর দিয়েই খাওয়ায়, তাতেই বা কি? তুমি মনে

করছ, আমার বড় যাতনা হবে, আমি কত কষ্ট পাব ; কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য ? আমি কত কাল থেকে দারুণ শূলরোগে কষ্ট পাচ্ছি, এই বৃদ্ধ বয়সে সে যন্ত্রণা অসহ্য মনে হয় ; সে যন্ত্রণার তুলনায়, যমদূত কাজি আমাকে যে মৃত্যু-যন্ত্রণা দেবে, তা তেমন গুরুতর নয়। আমাকে যদি কুকুর দিয়েই খাওয়ান হয়, সামান্য কিছুকাল সেই যন্ত্রণা ভোগ ক'রে আমি এই ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করবো।'

সুমতি বলিল, 'না বাবা, ও কথা বলো না। তোমাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে, আমার প্রাণে তা কখনও সহ্য হবে না ; আমি তা চোখে দেখ্‌তে পারব না। এ চিন্তাও যে অসহ্য বাবা !'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'এ সকলই ভগবানের খেলা ! তিনি কত রকমে আমাদের পরীক্ষা করেন, তা আমাদের ধারণার অতীত। আমরা পৃথিবীতে সহ্য করতেই এসেছি ; সহ্য করা ভিন্ন আর উপায় কি মা ? তাই ব'লে কি আমার এই ছার জীবনরক্ষার জন্য তুমি চুরী কবুল করবে ? মিথ্যা অপবাদ সত্য অপরাধ ব'লে স্বীকার করবে ? আমার অনিত্য দেহের জন্য তোমার পুণ্যশ্লোক পূর্ব্বপুরুষগণের সুনাম কলঙ্কিত করবে ? তুমি চুরী কবুল করলেই তোমাকে চোরের প্রাপ্য দণ্ড গ্রহণ করতে হবে। সে দণ্ড লঘু হবে, এমন প্রত্যাশা করো না মা !'

সুমতি বলিল, 'শুনেছি, জল্লাদের হাতে আমার মাথা কাটা যাবে।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'অসম্ভব কি ? তুমি একটা দুরপনেয়

কলঙ্ক নিয়ে সংসার থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করবে। লোকে চিরকাল তোমাকে চোর বলে' ঘৃণা করবে—আর আমাকে বেঁচে থেকে লোকের সেই ঘৃণা, টিটকারী, অবজ্ঞা সহ্য করতে হবে! তার চেয়ে মৃত্যুই কি আমার শত গুণ অধিক বাঞ্ছনীয় নয়? জীবনে আমার আর সুখ শান্তি নেই মা!'

সুমতি পিতার কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার নয়ন হইতে অশ্রুর স্রোত বহিল; সে কাঁদিয়া বলিল, 'বাবা, আমারই জন্য আর বেঁচে থেকেও তোমার সুখ নেই। আমি নিরপরাধ, কিন্তু বিনা অপরাধে, চুরী না করে'ও, আমি চোর বলে ধরা পড়েছি; আমার হাতে পায়ে বেড়ি পড়েছে, আমাকে হাজতে পুরেছে, দেশ জুড়ে আমার কলঙ্ক রটেছে; আমার এ কলঙ্ক কখনও দূর হবে না, লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না; বেঁচে থাকতে আমার আর একটুও ইচ্ছে নেই বাবা!'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুত হও মা, আমাদের মত লোকের পক্ষে মৃত্যুই মঙ্গল। লোকে মৃত্যুর নামে ভয় পায়, কিন্তু আমরা কেহই এ পৃথিবীতে অমর হয়ে আসি নি। রোগে হোক, আর জল্লাদের হাতেই হোক, সকলকেই একদিন মরতে হবে। কোনও উপলক্ষে এ সংসার থেকে বিদায় নিতে পারলে আমরা যেখানে যাব, সেখানে রোগ, শোক, পাপ, তাপ, বন্ধন, জ্বালা যন্ত্রণা, কিছুই নেই; সেখানে কলঙ্ক নেই, অপবাদ নেই। সেই পবিত্র লোকে তোমার মা আছেন, কত কাল তাঁকে দেখ নি

তাঁকে সেখানে দেখ্‌তে পাবে ; তোমার ভগিনীরা এসে তোমাকে ঘিরে দাঁড়াবে ; জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধ শান্ত অপাপবিদ্ধ মূর্ত্তি,—তোমাকে পেয়ে তাদের কত আনন্দ হবে !'

সুমতি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া নীরবে পিতার কথা শুনিতেছিল, মা ও ভাই ভগিনীদের সহিত মিলনের আশায় তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল, চক্ষুতে আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল ; বর্ষার আকাশ হইতে জলদরাশি অপসৃত হইলে উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে যেমন জলসিক্ত শ্যামল প্রকৃতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সুমতির মুখমণ্ডল সেইরূপ উজ্জ্বল মধুর ভাব ধারণ করিল।

ন্যায়রত্ন পুনর্ব্বার বলিলেন, 'কাজি সাহেবের বিচারে আমরা যদি আজ অপরাধী প্রতিপন্ন হই, সে জন্য দুঃখ নাই ; কিন্তু মা, জগদম্বার নিকট যেন অপরাধী না হই।'

সুমতি বলিল, 'আমি বুঝতে না পেরে মনে করেছিলাম, তোমার জীবনরক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বল্‌তে হয় বল্‌ব, চুরী কবুল করতে হয় করবো ; কিন্তু আর না, এ তুচ্ছ জীবন দুর্ব্বৃত্ত কাজি যে ভাবে নষ্ট করতে চায়, করুক ; তাতে আমার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। আমি মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে ধর্ম্ম ও দেবতা সাক্ষী করে মুক্তকণ্ঠে বল্‌ব—'আমি চোর নই'।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বেলা অবসানপ্রায়। কাজি সাহেব ধর্ম্মাধিকরণে উপবিষ্ট; তাঁহার সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে চোপ্‌দার, ও সিপাহীগণ দণ্ডায়মান। তাঁহার এক পার্শ্বে একটু দূরে ন্যায়রত্ন ও তাঁহার কন্যা আসামীর বেশে দাঁড়াইয়া আছেন। গ্রামস্থ ইতর ভদ্র সকল লোকেই এই মামলার বিচার দেখিতে আসিয়াছে। বিচার-ফল জানিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠাকুল,—উচ্চশ্রেণীর অনেকেই কাজি সাহেবের অন্য পার্শ্বে বসিয়াছিল; চাষারা দল বাঁধিয়া তাহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিল। বিচারসভা নিস্তব্ধ, যেন মূকের সভা!

সেই সুগভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হঠাৎ 'হটো-হটো' শব্দ হইল; চারিদিকে সহসা যেন চাঞ্চল্যের স্রোত বহিয়া গেল। অনেকে সরিয়া গিয়া পথ ছাড়িয়া দিল; ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য অনেকে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল। এই মামলার ফরিয়াদী তালুকদার বিজয় দত্ত তাঁহার সম্ভ্রমোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, তাঁহার পরিচারিকা রমণীকে সঙ্গে লইয়া বিচারসভায় প্রবেশ করিলেন। রমণীকে কিছু দূরে রাখিয়া বিজয় দত্ত কাজি সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী আসনে উপবেশন করিলেন।

বিচার আরম্ভ হইল। কাজি সাহেবের ইঙ্গিতে রমণীকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া হলফ্ দেওয়া হইল। রমণী অশিক্ষিত

নীচবংশীয়া স্ত্রীলোক, বোধ হয় পূর্ব্বে কখন তাহাকে কোন মামলার সাক্ষ্য দিতে হয় নাই ; সে যাহাতে ঘাব্ড়াইয়া না যায়—এজন্য তালিম দেওয়ার ত্রুটী হয় নাই ; সুতরাং সে হলফ্ লইয়া, কাজি সাহেবের শ্মশ্রুবহুল মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিলক্ষণ সপ্রতিভভাবে বলিল, "আমাকে যে দিব্যি কর্‌তে বল্‌বা, আমি তাই কর্‌বো ; চোখের মাথা খাই যদি মিথ্যে বলি।"

কাজি বলিলেন, "তুই তালুকদারের হারেমের—কি বলে' অন্দরের বাঁদী ?"

রমণী তাহার ঘোমটা ইঞ্চি দুই সম্মুখে টানিয়া বলিল, "আমি হারামের বাঁদী হ'তে যাব কোন্ দুষ্‌খে? আমি কি মোচলমান যে, আমাকে হারামের বাঁদী বল্‌ছ? আমি গিন্নিমার ঝি।"

কাজি সাহেব দাড়ী নাড়িয়া বলিলেন, "তোবা! তোবা! ঐ কথাই আমি পুছ্ করছি। এখন বল্ এই চুরীর কি জানিস্। তোর কপালে দুটা আঁখ আছে না? ঐ আঁখ্‌সে কি দেখ্‌লি ঠিক্ ঠিক্ বল, ঝুটাবাৎ কভ্‌ভি না বল্‌বি।"

কাজি সাহেব বাঙ্গালা ভালই বুঝিতেন, এবং বাঙ্গালী ভদ্র-লোকের মতই শুদ্ধ বাঙ্গালায় কথা বলিতে পারিতেন, সে পরিচয় পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন ; কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমোলে বাঙ্গালীর ছেলেরা মাতৃভাষায় অনভিজ্ঞতা-প্রকাশ যেমন গৌরবের বিষয় মনে করিত, এবং বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া 'মোচা'কে 'ক্যালাকা ফুল' বলিয়া সাহেবীয়ানার পরিচয় দিত, এই বিচার-

সভায় কাজি সাহেবও স্বীয় আভিজাত্য-গৌরব-প্রদর্শনের জন্য সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন, পাছে কেহ তাঁহাকে খাস্ দিল্লীর আমদানী বলিয়া মনে না করে!

রমনী বাম হস্ত কটিদেশে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা উভয় চক্ষু স্পর্শ করিয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিল, "এই দুটি চোখের মাথা খাই যদি মিথ্যে বলি; ইষ্টিদেবতার সাম্‌নে সত্যি কথা বল্‌তে চুকিনে, তা হোক্ না কেন সে আমার বাপের ঠাকুর। কাল গিন্নিমা যখন পুবের ঘরের বারান্দায় ব'সে দিদির চুল বেঁধে দিচ্ছিলেন, সেই সময় সুমতি ঠাকরুণ কোথা থেকে এসে তাঁদের কাছে বস্‌লো। এ কথা সে কথা হচ্ছে, এমন সময় কত্তা বাড়ী ফিরে এসেছেন শুনে গিন্নি মা আর দিদি দু'জনেই উঠে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গ্যালেন, সেই ছ্যাকে ঐ বাম্‌নী দিদির চুল-বাঁধার ফিতেটা টপ্ ক'রে তুলে নিয়ে পেট্ কোঁচড়ে পুরলে—তার পর উটে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে হন্ হন্ করে চ'লে গ্যালো; তাই না দেখে—আমার আক্কেল গুড়ুম!"

কাজি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রমণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সেই ফিতে তুই ঐ আসামীকে পেট্-কোঁচড়ে লুকিয়ে নিয়ে ভাগ্‌তে আপন আঁখ্‌সে দেখ্‌লি?"

রমণী বললি, "হাঁ দেখ্‌লাম বৈকি? ঘরের মদ্যি দেঁড়িয়ে দেখ্‌লাম না তো কি?"

কাজি বলিলেন, "দেখ্‌লি ত চোট্টা বেটীকে গেরেফ্‌তার কর্‌লি না কেন?"

রমণী বলিল, "আমি কি সিপুই যে গেরেফ্‌তার করবো? তবে হ্যাঁ, আমি চোর চোর ব'লে চ্যাচামেচি করতে পারতাম, তা আমি করিনি। সাধে করিনি? সত্যবালা দিদি ঐ বাম্‌নীটাকে সোনার চক্ষে দেখেছেন, ওর সঙ্গে তাঁর পিরীত পেরণয় আছে কি না; তাঁর ভালবাসার লোক—তাঁর ফিতে চুরি করে পালালো—এ কথা বল্‌লে দিদির মস্ত গোঁসা হতো; তাঁর গোঁসার ভয়ে আমি রা কাড়িনি।"

কাজি সাহেব বলিলেন, "লেকেন ফিতার 'কিম্মত' তুই ওয়াকিফ্‌ আছিস্‌?"

রমণী বলিল, "কিসের মত--তাই বল্‌ছো?"

কাজি সাহেব কড়া সুরে বলিলেন, "নেই, নেই; আমি পুছ করছি—সেই ফিতার দাম কি বাৎলাও।"

রমণী বলিল, "ওঃ দাম! তার দাম কত, ক্যাম্‌নে কব? আমি কি ও রকম ফিতে কিনেছি না 'কোতু' দেখেছি যে, দাম জান্‌বো! সে কি আর যে-সে ফিতে? তাতে সোনার জরি আছে—মতি আছে, মুক্তো আছে। সোনার পৈঁছে, চিক মালাকে ঝক্‌-মারে, এমন ফিতে! সাদে কি আর সুমতি ঠাক্‌রুণের 'নোব' হয়েছ্যালো?"

কাজি সাহেব রমণীকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, সুমতির দিকে চাহিয়া তাহাকে বলিলেন, "তোমার জবাব কি? ঐ বাদীর বাৎ সাচ্চা কি ঝুটা? তুমি ফিতা চুরি করিয়েছিলে?"

সুমতি সতেজে মাথা তুলিয়া সুস্পষ্ট ঘৃণার স্বরে বলিল, "না, আমি চোর নই। ব্রাহ্মণের বিধবার বিরুদ্ধে এত বড় বদ্‌নাম কোন ভদ্রলোকে দিতে পারে না।

কাজি বলিলেন, "ঐ বাঁদী এ কথা বলে কেন?"

সুমতি বলিল, "তা সেই জানে,—পরের মনের কথা আমি কি ক'রে বল্‌ব।

কাজি বলিলেন, "রমণীর ভূষমণি? তার সঙ্গে তোমার বিবাদ আছে?"

সুমতি বলিল, "না।"

কাজি বলিলেন, "তোমার সাফাই সাক্ষী আছে? সাফাই দেবে?"

সুমতি আবেগ ভরে বলিল, "সাফাই টাফাই জানিনে সাহেব! আমার সাক্ষী ধর্ম্ম; আমার সাক্ষী দেবতা, সেই নারায়ণ বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন,—তাঁর ত কিছু অগোচর নেই; তাঁদেরই আমি সাক্ষী করে বল্‌ছি, চুরি করা দূরে যাক—ফিতে আমি ছুঁইওনি। আপনি মুসলমান—শোরের মাংশ যেমন আপনার অস্পৃশ্য, আমি ব্রাহ্মণের বিধবা, ফিতে কি ঐ রকম কোন বিলাসের সামগ্রীও আমার সেইরূপ অস্পৃশ্য।"

কাজি সাহেব নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোবা! তোবা! দেখ বেটী! তোমার নেড়ায়ন না মদ্‌সোদন যে সব সাক্ষীর নাম বাৎলালে, তারা যদি আমার সামনে এসে বলে যে তুমি ফিতে চুরি করনি, তবে তোমার বাৎ বিশওয়াশ করা যেতে

পারে। তারা গরহাজির ; রমণীর জবানবন্দীতে তোমার কসুর প্রমাণ হয়েচে। এই বাঁদী ঝুটবাত বলেছে—এ বিশওয়াসের কুছু কারণ নেই। তোমার সাফাই সাক্ষী—”

কাজি সাহেবের কথা শেষ না হইতেই সেই জনতার ভিতর হইতে কে সুস্পষ্টস্বরে বলিয়া উঠিল, “আছে, আছে, এই নিরাপরাধ বিধবার আমিই সাফাই সাক্ষী !”—রামাকণ্ঠনিঃসৃত সকরুণ অথচ সতেজ স্বর ! মর্ম্মাহত স্তম্ভিত শত শত দর্শকের মুহ্যমান হৃদয়ে তড়িৎপ্রবাহের সঞ্চার করিয়া কাহার কণ্ঠ হইতে এই করুণাভরা অভয়বাণী নিঃসারিত হইল ? তবে কি ইহা তাঁহারই অমোঘ দৈববাণী—যিনি উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, বিপন্ন প্রহ্লাদকে দৈত্যকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্ফটিকস্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া নরসিংহ-মূর্ত্তিতে ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন ? যিনি কুরুসভায় অপমানিতা হৃতবসনা দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ করিয়াছিলেন ?—দর্শকগণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া মহা উৎসাহে সমবেতকণ্ঠে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল, পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, এক পরমাসুন্দরী যুবতী আলুলায়িতকুন্তলে নিবিড়জলদজাল-মধ্যবর্ত্তিনী উজ্জ্বল দামিনী-প্রভার ন্যায় সেই বিচার সভায় প্রবেশ করিতেছে।

যুবতী কাজি সাহেবের সম্মুখে আসিয়া, লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় পরিহার পূর্ব্বক সতেজে বলিল, “কাজি সাহেব, রমণী মিথ্যাবাদিনী, তাহার কথা বিশ্বাসের অযোগ্য। সুমতি ফিতে চুরি করেনি, সে চোর নয় ; চোর আমি ; আমার ফিতে আমিই লুকিয়ে রেখেছি।”

সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিতদৃষ্টিতে সেই যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কেবল এক জন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "এখনও রাত্রি দিন হচ্ছে, এখনও আকাশে চন্দ্রসূর্য্য উঠ্‌ছে! ধর্ম্ম আছে, সত্য আছে, ভগবান আছেন—"

চোপদার ও পদাতিকেরা সমস্বরে হুঙ্কার দিল, "চোপ্, চোপ্!"

তালুকদার স্তম্ভিত, মর্ম্মাহত হইয়া এতক্ষণ নির্ব্বাক্ ছিলেন! তিনি তাঁহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এ যে তাঁহারই কন্যা সত্যবালা! সত্যবালা অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য বিচার সভায় আসামীর সাফাই সাক্ষী দিতে আসিয়াছে? একি বিড়ম্বনা! তাঁহার জাতি গেল, সম্মান নষ্ট হইল, তাঁহার গৌরব-মণ্ডিত উন্নত মস্তক মাটীর ধূলার সহিত মিশিয়া গেল! তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল।

মুহূর্ত্তে তাঁহার ক্রোধ বিস্ময়ের স্থান অধিকার করিল। তালুকদার আসন ত্যাগ করিয়া এক লম্ফে সত্যবালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার জন্য তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। কিন্তু সত্যবালা নড়িল না; সে তাহার পিতার মুখের দিকে দৃক্‌পাতও করিল না; সুমতিকে মুক্তিদানই তাহার লক্ষ্য, সে দৃঢ়স্বরে কাজি সাহেবকে বলিল, "কাজি সাহেব! দোষ আমারই, সুমতির কোন দোষ নেই, তাকে ছেড়ে দেন; যে সাজা দিতে হয়—আমাকে দিন।"

একি রহস্য! তালুকদার-কন্যা প্রকাশ্য বিচারসভায় উপস্থিত হইয়া কি উদ্দেশ্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা সুমতির মুক্তিকামনায় তাঁহার

অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে, কেন-ই বা সে সুমতির অপরাধ নিজের স্কন্ধে লইয়া বিচারসভায় অসংখ্য লোকের সম্মুখে আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য এরূপ উৎসুক হইয়াছে ইহা বুঝিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় কাজি উভয় হস্তে দাড়ি চুলকাইতে লাগিলেন; তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া বিচারাসন পরিত্যাগ করিলেন। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার 'দোস্ত' তালুকদার মহাশয়কে বহুজন-সমক্ষে অপদস্থ ও মর্ম্মাহত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে অধিকতর লজ্জার দায় হইতে নিষ্কৃতিদানের জন্যই উঠিয়া চলিলেন! তালুকদারও তাঁহার পরিচারিকার সাহায্যে অবাধ্য কন্যাকে টানিতে টানিতে অন্তঃপুর অভিমুখে লইয়া চলিলেন। কন্যাকে তিনি যে কদর্য্য ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন, একালের ভদ্রসমাজে তাহা প্রকাশ্যের যোগ্য নহে।

কাজি সাহেব বিচারসভা ত্যাগ করিলেও সমাগত পল্লীবাসীগণ সে স্থান ত্যাগ করিল না; সুমতি ও ন্যায়রত্নের প্রতি কিরূপ দণ্ডের আদেশ হয়, তাহা জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হৃদয়ে আলাপ করিতে লাগিল। দুই চারিজন যুবক নিঃশব্দে সভা ত্যাগ করিয়া সংবাদ লইয়া আসিল, কাজি সাহেব তালুকদারের বৈকঠখানায় বসিয়া তাঁহার সহিত কি পরামর্শ করিতেছে; সম্মুখস্থ দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও কাজি সাহেবের ফরসীর গড় গড় ধ্বনি বহু-দূরবর্ত্তী মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল, সুতরাং অচিরকালমধ্যে বজ্রাঘাতের আশঙ্কায় সকলেই আকুল হইয়া উঠিল।

কিছুকাল পরে কাজি সাহেব একখণ্ড কাগজ হস্তে লইয়া বিচার সভায় প্রত্যাগমন করিলেন। এতক্ষণ সভামধ্যে কোলাহল চলিতেছিল, এবং প্রত্যেকেই কাজির বিচার সম্বন্ধে স্ব-স্ব অভিমত প্রকাশপূর্ব্বক সভাটিকে হাটে পরিণত করিয়াছিল; রায় লইয়া কাজি সাহেবকে সভায় প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া সকলেই নীরব হইল; যাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাজি সাহেবের সহিত তালুকদারের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে হাতমুখ নাড়িয়া বক্তৃতা করিতেছিল; চোপদারের পাগড়ীর ঘটা ও লাটীর বহর দেখিয়া মধ্যপথে বক্তৃতা বন্ধ করিয়া তাহারা বসিয়া পড়িল।

কাজি সাহেব আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার পেস্‌কারের হস্তে রায়ের কাগজখানি প্রদান করিলেন; কাজি সাহেব যে ভাষায় রায় লিখিয়াছেন, তাহার সাত আনা ফার্সি, পাঁচ আনা অশুদ্ধ উর্দ্দু, এবং সিকি দিল্লীর আমদানী বাঙ্গালা! পেস্‌কার ফৈজউদ্দীন মুন্সী গভীরস্বরে রায় পাঠ করিল। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় তাহা এই :—

"সুমতি ফিতা চুরী করিয়াছে, এবং তাহার পিতা জানিয়া শুনিয়া চোরামাল নিজ দখলে রাখিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই; কিন্তু রমণী ভিন্ন তাহাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন সাক্ষী বা প্রমাণ নাই; এজন্য হুকুম হইল যে—

"তারানাথ ন্যায়রত্নের যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা তালুক-দারের সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়, এবং আগামী কল্য প্রভাতে তাহার ও তাহার কন্যা সুমতির, মাথা মুড়াইয়া এবং নেড়া

মাথায় ঘোল ঢালিয়া তাহাদের উভয়কে গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করা হয়; তালুকদারের এলাকা মধ্যে আর কথন তাহারা আশ্রয় পাইবে না।"

এইরূপে কাজির বিচার শেষ হইলে সভাভঙ্গ হইল; এই দণ্ডাজ্ঞা শেলের ন্যায় গ্রামবাসীগণের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, তাহারা ব্যথিতহৃদয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল। ন্যায়রত্ন ও সুমতিকে সেই রাত্রে হাজতে রাখা হইল। ইংরাজশাসনারম্ভের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কাজির বিচারের এই বর্ণনা পাঠ করিয়া পাঠক বিস্মিত হইবেন না, বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতেও সভ্য জগতে এইরূপ কাজির বিচার দুর্ল্লভ নহে।

নবম পরিচ্ছেদ।

কাজি সাহেবের আদেশানুসারে প্রভাতেই ন্যায়রত্ন ও তাঁহার কন্যা সুমতিকে গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। গ্রামের পক্ষে ইহা দুর্দ্দিন মনে করিয়া গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়াই এই অবিচারের কথা লইয়া আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ করিল। কেহ কাজিকে গালি দিতে লাগিল; কেহ বলিল, তালুকদার হিন্দুসন্তান হইয়া ন্যায়রত্নের ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের এমন সর্ব্বনাশ করিলেন, ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে, তাঁহাকে নির্ব্বংশ হইতে

হইবে, তিনি নরকে পচিবেন। কেহ বলিল, কলির ব্রাহ্মণের কি আর সে তেজ আছে? যদি ঘোর কলি না হইত, তাহা হইলে ন্যায়রত্ন পৈতা ছুঁইয়া শাপ দিলে তালুকদারকে ভস্ম হইতে হইত। এক জন প্রাচীন ভদ্রলোক প্রতিবেশীদের সকল কথা চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, ন্যায়রত্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তিনি ক্ষমাশীল; তিনি জানেন, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে, ক্ষমা দ্বারা অত্যাচারকে জয় করিতে হয়; সকল অত্যাচার ধীরভাবে সহ্য করাই মহতের কার্য্য। এ কথা শুনিয়া একটি যুবক বলিয়া উঠিল, 'তাহা হইলে কাপুরুষের কার্য্যটি কি মহাশয়? গ্রামবাসীগণের মধ্যে এই ভাবে তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। ক্রমে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয় হইল। তখন গ্রামের জনসাধারণ ন্যায়রত্নকে তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিদায়দানের জন্য দলবদ্ধ হইয়া হাজতঘরের অদূরবর্ত্তী তেমাথা পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা দেখিল, তালুকদারের সুব্যবস্থায় হরিবোলা নাপিত পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছে, এবং দুই কলসী ঘোলও আনীত হইয়াছে!

বেলা অধিক হইলে কাজি সাহেবের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইল; তিনি প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া মেহেদীরঞ্জিত কপিশ দাড়ির নিশান উড়াইয়া অনুচরবর্গ সহ হাজতঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পাইক ও পদাতিকেরা সুদীর্ঘ বংশদণ্ড হস্তে তাঁহার অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। কাজি সাহেবের আগমন প্রতীক্ষায় তাঁহার অনুষ্ঠিত উৎসব আরব্ধ হয় নাই; তাঁহার ইঙ্গিতে

সুমতি ও ন্যায়রত্ন বন্দিভাবে হাজতের বহির্দ্দেশে আনীত হইলেন।

কিন্তু কাজি সাহেব তাঁহার আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় কি না, তাহা দেখিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থিতি করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না, তিনি তাঁহার সম্মুখে নরমুণ্ডের স্রোত দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন, বুঝিতে পারিলেন, এই উত্তেজিত ক্ষুব্ধ জনস্রোত যদি সবেগে তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে—তাহা হইলে তাহাদের নিষ্পেষণে তাঁহার অস্থিগুলি চূর্ণ হইয়া যাইবে, এবং যদি উন্মত্তপ্রায় গ্রামবাসীদের এক এক জন এক একটি করিয়া তাঁহার দাড়ি গোঁফ উৎপাটন করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে আসামীদ্বয়ের মস্তক মুণ্ডিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার শ্মশ্রু গুম্ফের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে! এই অপ্রীতিকর সম্ভাবনায় তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া আসামীদ্বয়ের মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক মুণ্ডিত মস্তকে এক এক কলসী ঘোল ঢালিবার ব্যবস্থা করিয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু তিনি দুইএক পদ অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং জমাদারকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, আসামীদ্বয়ের মাথায় ঘোল ঢালা হইলে 'ঢেড়ি' (ঢোল) পিটাইতে পিটাইতে তাহাদিগকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করাইতে হইবে, তাহার পর তাহারা একবস্ত্রে গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইবে।

কাজি প্রস্থান করিলে দুই জন পেয়াদা সুমতির সম্মুখে গিয়া বলিল, "জল্‌দি মাথার কাপড় খোল্, দৈঁড়িয়ে দৈঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লি ক্যান্? তাতে কি ফয়দা?"

সুমতি তাহাকে কোন উত্তর না দিয়া তাহার পিতাকে বলিল "বাবা, এত অপমান সহ্য ক'রে ঘৃণিত জীবন-ধারণ করা কি সামান্য বিড়ম্বনার বিষয় ? এর চেয়ে যদি জল্লাদের হাতে আমার মাথা কাটা যেত ; সে-ও ত ভাল ছিল বাবা ! আমি মরতে রাজি আছি, এ অপমান আমি সহ্য করব না, আমি কিছুতেই মাথা মুড়োতে দেব না।"

পেয়াদা বলিল, "তুই বল্‌ছিস্ কি ? কাজি সাহেবের হুকুম তুই তামিল করবি নে ? তোকে আলবৎ মাথা মুড়োতে হবে। ভালমানসির মতন কথা শোন্ ; হারামির মতোন গোঁ ধ'রে দেঁড়িয়ে থেকে না হ'ক ক্যান্ বে-ইজ্জৎ হ'স ?"

সুমতি তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না দেখিয়া পেয়াদা বলপ্রয়োগে তাহার মস্তক হইতে বস্ত্রাঞ্চল অপসারিত করিয়া কেশ-রাশি আলুলায়িত করিল ; কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় কেশদাম লম্বমান হইয়া তাহার গুল্‌ফ স্পর্শ করিল।

সুমতি রমণীসুলভ লজ্জায় অভিভূত হইয়া পুনর্ব্বার অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিবার চেষ্টা করিলে দুই জন পেয়াদা দুই পাশ হইতে তাহার দুই হাত টানিয়া ধরিল, আর একজন পেয়াদা তাহার ঘাড় ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল। তখন নাপিত তাহার নিকট সরিয়া গিয়া মাথা কামাইবার পূর্ব্বে চুলগুলি খাট করিয়া লইবার জন্য কাঁচি বাহির করিল।

সুমতি পেয়াদার কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল ; সে উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া

আর দুই জন পেয়াদা তাহার দুই পা ধরিয়া তাহাকে মাটিতে বসাইয়া রাখিল; অগত্যা সুমতি হতাশভাবে বসিয়া রহিল। নাপিত প্রথমে কাঁচি দিয়া তাহার কেশরাশি কাটিয়া ফেলিল, তাহার পর তাহার মস্তকে ক্ষুর চালাইতে লাগিল।

সুমতির হাত পা নাড়িবার শক্তি না থাকিলেও সে নাপিতকে এই নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য মাথা নাড়িতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নাপিতের সঙ্কল্প টলিল না, সে যথাসাধ্য সতর্কতার সহিত ক্ষুর চালাইলেও ক্ষুর-ধারে সুমতির মস্তকের ত্বক্ স্থানে স্থানে কাটিয়া গেল; তাহার ললাট ও চোখ মুখ ও ঘাড় বহিয়া টস্ টস্ করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, সুমতি ভগ্নস্বরে বলিল, "ওগো, তোমরা ক্ষুরখান আমার গলায় বসিয়ে দিয়ে একবারে আমাকে মেরে ফেল, আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে যাক্। এ রকম করে দগ্ধিয়ে মেরো না। হরি, দীনবন্ধু, মধুসূদন, কোথায় তুমি, এই অনাথাকে এই রাক্ষসগুলার হাত থেকে রক্ষা কর। মা দুর্গা, আর আমাকে কষ্ট দিও না।"

ন্যায়রত্ন কন্যার দুর্গতি দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি কম্পিতপদে কন্যার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িলেন, কাতরস্বরে বলিলেন, 'মা, স্থির হও। মাথা না মুড়িয়ে যখন আমাদের নিষ্কৃতি নেই, ওরা যখন কাজির হুকুম নিশ্চয়ই তামিল করবে—তখন মা, মাথা নেড়ে বাধা দিয়ে ফল কি? এতে তোমার যন্ত্রণা বাড়ছে বৈ ত নয়; রক্তে তোমার নাক কান চোখ মুখ ভেসে যাচ্ছে; বাপ হয়ে আমাকে তোমার

এই দুর্দ্দশা দেখ্‌তে হচ্ছে! ও ক্ষুর যে আমারই কল্‌জে কেটে কেটে নামাচ্ছে! মা, আর মাথা নেড় না, ওরা তোমার মাথা মুড়িয়ে দিক্, যা খুসি তাই করুক। তোমার কষ্ট যন্ত্রণা আর আমার প্রাণে সহ্য হচ্ছে না। মা জগদম্ব, তোমার মনে কি এই ছিল? এ যে অতি কঠোর পরীক্ষা, মা!''

সুমতি কাঁদিয়া বলিল, "আমি কি করে এ কালামুখ নিয়ে লোকের সাম্‌নে বের হব? কেমন করে লোককে মুখ দেখাব?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "বিস্তর পাপ করেছি মা, এ তারই শাস্তি। পাপের শাস্তি ভগবান দিচ্ছেন, এরা কেবল উপলক্ষ মাত্র। যত কষ্ট হোক, হৃদয় ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যাক্, ভগবানের দেওয়া শাস্তি বহন কর্ত্তেই হবে।"

ন্যায়রত্নের কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল, যেন তাঁহার হৃদয়-শোণিত অত্যাচারের পেষণে জল হইয়া অশ্রুরূপে নির্গত হইতেছিল। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে মা জগদম্বাকে ডাকিয়া মনে মনে বলিলেন, 'দাও মা, তোমার অধম সন্তানকে কত শাস্তি দেবে দাও। কাজি সাহেবের এই নিষ্ঠুর আদেশ, এই পৈশাচিক উৎপীড়ন, তোমারই আদেশ মনে করে সকল যন্ত্রণা সহ্য করবো মা, মাথা নত করে তোমার আদেশ পালন করতে পারি—সে শক্তি দাও, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য যেন তোমার প্রতি ভক্তি বিশ্বাস না হারাই, তোমার করুণায় সন্দেহ করার চেয়ে মানুষের বেশী পাপ আর কি আছে মা!"

সুমতির মস্তক মুণ্ডিত হইল; পেয়াদারা তাহাকে ছাড়িয়া ন্যায়রত্নের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; এক জন কঠোর স্বরে বলিল, "কি ঠাকুর! চোখ বুঁজে ভাবতে নেগেছো কি, কও ত! মেয়েডার মত তুমিও কি বজ্জাতি করবা? বুড়ো মানুষ, মাথায় যদি ক্ষুরের দুই এক পোঁচ বেধে যায় ত সাম্‌লাতে পারবা না ঠাকুর, তা আগে ভাগে বুলে দিচ্ছি।"

ন্যায়রত্ন কোন কথা বলিলেন না, তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি নিঃশব্দে নাপিতের হস্তে মস্তক সমর্পণ করিলেন। তাঁহার মাথাটি পূর্ব্ব হইতেই নেড়া, হ্রস্ব কেশরাশির মধ্যে একটি নাতিদীর্ঘ শিখা ছিল; নাপিত ব্রাহ্মণের শিখা কর্ত্তন করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া একজন পেয়াদা তাহার কাঁচিখানি তুলিয়া লইয়া ন্যায়রত্নের শিখাটী বামহস্তে আকর্ষণপূর্ব্বক 'কচ্' করিয়া কাটিয়া দিল! নাপিতের পাপের ভয় দূর হইল; সে তখন অসঙ্কোচে তাঁহার বিরল কেশে ক্ষুর চালাইয়া তাহার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিল।

উভয়ের মস্তক মুণ্ডিত হইলে পেয়াদারা দুই কলসী ঘোল তাঁহাদের মস্তকে ঢালিয়া দিল। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ও পরিধেয় বস্ত্র ঘোলের প্লাবনে সিক্ত হইল! তখন কাজি সাহেবের আদেশানুযায়ী চারি জন পেয়াদা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে চলিল। এক জন মুচি ঢোল লইয়া তাঁহাদের আগে আগে চলিল, এবং ঢোল পিটাইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদের অপরাধ ও তজ্জনিত শাস্তির কথা ঘোষণা করিতে লাগিল।

ন্যায়রত্নের নিয়তি*

গ্রামের কেন্দ্রস্থলে যে সুপ্রশস্ত তেমাথা পথ ছিল, সেই পথের ধারে গ্রামের অধিকাংশ লোক সমবেত হইয়া বিষন্নবদনে নিম্ন স্বরে আক্ষেপ করিতেছিল; প্রহরিপরিবেষ্টিত ন্যায়রত্ন ও সুমতি মুণ্ডিতমস্তকে সিক্ত বস্ত্রে সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, তাঁহাদিগকে দেখিয়া সমবেত জনমণ্ডলী ভক্তি-উদ্বেলিতকণ্ঠে তাঁহাদের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল; যেন পরহিতে উৎসৃষ্ট জীবন কোন মহাপ্রাণ মানবমিত্র মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন.! সকলেই. পথের ধূলায় দেহ প্রসারিত করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাদের প্রণিপাত করিল; তাহারা তাঁহার পদপ্রান্তে দেহ লুণ্ঠিত করিয়া, দেহ পবিত্র ও জীবন ধন্য মনে করিল। গ্রামস্থ রমণীগণ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে এই মর্ম্মভেদী বিদায়দৃশ্য সন্দর্শন করিতে লাগিল; কি এক সুগভীর অব্যক্ত বেদনায় তাহাদের বক্ষের শিরা উপশিরাগুলি টন্-টন্ করিতে লাগিল; অভাগিনী সুমতির দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহারা হাহাকার করিতে লাগিল। ন্যায়রত্ন সজলনেত্রে গদগদস্বরে বলিলেন, "মা জগদম্বে, এ-ও ত তোমারই লীলা! লীলাময়ি, যে অপমানের সুতীক্ষ্ণ শায়কে তুমি এই বৃদ্ধের জীর্ণ অবসন্ন হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছ,—তাহাই সম্মানের শতদলে পরিণত হইয়া তোমার এই অযোগ্য ভক্তকে ভক্তির অর্ঘ্য দান করিতেছে; মা, এ ত তোমারই অর্ঘ্য! এই অকিঞ্চন দীনহীন অধমকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমার পূজা তুমিই গ্রহণ করিতেছ!"

গ্রামবাসীগণ সকলেই নির্ব্বাক্, কাহারও মুখে কথা সরিতেছে

না। সুমতি দুঃখে, ঘৃণায় লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে,—ইহা লক্ষ্য করিয়া ন্যায়রত্ন হৃদয়াবেগে চঞ্চল হইয়া পুরোবর্ত্তী গ্রামবাসীগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ, আজ তোমরা দয়া করিয়া এই অভিশপ্ত, দুর্নামগ্রস্ত হতভাগ্য বৃদ্ধকে মাতৃস্বরূপিণী, চিরকল্যাণ-দায়িনী, স্নেহময়ী পল্লীজননীর ক্রোড় হইতে চিরনির্ব্বাসনের প্রাক্কালে বিদায় দান করিতে আসিয়াছ। আমাদের অপমান ও কলঙ্কের আর কিছুই বাকী নাই! আমরা চোর অপবাদ লইয়া চিরকালের জন্য নির্ব্বাসিত হইতেছি; এই গ্রামে আর আমাদের প্রত্যাগমনের অধিকার নাই। তোমরা আমার পরমাত্মীয়; এতকাল তোমাদের সঙ্গে সুখে দুঃখে একত্র বাস করিয়াছি, কত সময় হয় ত মন্দ বাক্যে তোমাদের মনে বেদনা দিয়াছি; হয় ত কত জনের সহিত মন্দ ব্যবহার করিয়াছি, তোমাদের অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি; সে সকল কথা তোমরা ভুলিয়া যাও, আমার সে সকল ত্রুটী তোমরা মনে রাখিও না।"—ন্যায়রত্নের কণ্ঠরোধ হইল; বিগলিত অশ্রুরাশি তাঁহার হৃদয়বেদনা লঘু করিতে লাগিল।

এক জন গ্রামবাসী ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, "দাদা ঠাকুর, আপনি ও কথা বল্‌বেন না! আপনি গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন—আজ হরিরামপুরের লক্ষ্মী ছাড়্‌ল, গ্রামের লোক আজ পিতৃহীন হ'লো। আমাদর মঙ্গলের জন্য আর কে চেষ্টা করবে? আমাদের সকল আশা ভরসা আপনার সঙ্গে শেষ হয়ে গেল।"

আর এক জন বলিল, "আজ যে কাণ্ড হয়ে গেল, এর পর আর কি এ গ্রামে বাস করতে আছে? অন্যত্র মাথা রাখ্‌বার যায়গা থাক্‌লে আপনার সঙ্গে আমরাও এ গ্রাম ত্যাগ করতাম। এই শ্মশানে বাস করে' আর ফল কি?"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "আজও ধর্ম্ম আছেন, আজও মাথার উপর চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে; এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই! —অবশ্যই আছে; আমরা বেঁচে থেকেই তা দেখ্‌তে পাব।"

ক্রোধে, ক্ষোভে, মনস্তাপে নানা জনে নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল; এক জন ব্রাহ্মণ হাতে উপবীত জড়াইয়া তালুক-দারকে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইলে ন্যায়রত্ন সন্ত্রস্তভাবে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "কর কি? কর কি? এমন কার্য্য কখন করিও না। তালুকদার রাজা, প্রজার পিতৃস্থানীয়; আমরা তাঁহার ভ্রমপ্রমাদের বিচারক নহি। স্থির হও, স্থির হও ভাই, আমাদের সুখদুঃখ ভগবানের হস্তে ন্যস্ত। মানুষের শক্তি-সাধ্য কতটুকু? মানুষ ত উপলক্ষ্যমাত্র।"

কথায় কথায় ক্রমে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পেয়াদারা অধীর হইয়া উঠিল; এক জন বলিল, "অনেক বাৎচিৎ হয়েছে ঠাকুর, এখন চল আর আমরা দেরী করতে পারি নে।"

ন্যায়রত্ন বিনা-প্রতিবাদে চলিতে আরম্ভ করিলেন। সুমতি অবনতমস্তকে তাঁহার পাশে পাশে চলিল। গ্রামের লোকেরা তখনও তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল; জনতা হ্রাস হওয়া দূরের কথা, গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহারা যতই অগ্রসর

হইতে লাগিলেন, ঢেঁড়ির শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ততই নূতন নূতন লোক জনতায় যোগদান করিতে লাগিল। এইরূপে সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া ন্যায়রত্ন স্বীয় বাসগৃহের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি আজন্মের ভদ্রাসন হইতে চিরবিদায়-গ্রহণের ইচ্ছায় সুমতি সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, পেয়াদারা তাহাতে আপত্তি করিল না। তিনি সুমতিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে তাঁহারা প্রাঙ্গনমধ্যস্থ তুলসী বেদীর নিকট উপস্থিত হইয়া বাস্তুদেবতাকে প্রণাম করিলেন; সেই স্থানে বসিয়া আর তাঁহাদের উঠিবার ইচ্ছা হইল না। সুমতির কোমল-হৃদয় তাহার আজন্মের বাসভূমির মমতায় আকুল হইয়া উঠিল; তাহার চক্ষু হইতে নীরবে অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। এই ভিটায় সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ঘরের ভিতরে ও বাহিরে সুখদুঃখের সহস্র স্মৃতি সংগুপ্ত রহিয়াছে; বিস্মৃতপ্রায় অতীত স্মৃতিগুলি একে একে তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সুখের শৈশবে সে কোথায় বসিয়া কি ভাবে খেলা করিত, দুঃখময় যৌবনে তাহার অন্ধকারপূর্ণ হৃদয়ে নিরাশা ও বেদনা ঘনাইয়া আসিলে, তাহার পূজনীয় পিতৃদেব কোথায় বসিয়া তাহার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি-সিঞ্চনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিয়াছিলেন, কোথায় বসিয়া তাহার পিতা কোন্ কোন্ কার্য্য করিতেন, মধ্যাহ্নে রন্ধনাদি সমাপন করিয়া সে কোথায় তাহার পিতাকে ভোজনে বসাইত, এবং কোন্ স্থানে বসিয়া তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও শাস্ত্রা-

লোচনা করিতেন,—এই সকল কথা একে একে স্মরণ হওয়ায় তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত ও বিহ্বল করিয়া তুলিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রথমে বাসগৃহে, তাহার পর পাকশালায় প্রবেশ করিল, এবং অশ্রুপূর্ণনেত্রে চারি দিকে চাহিতে লাগিল। যে সকল দৃশ্যে সে আশৈশব অভ্যস্ত, যাহা তাহার নিকট চিরপুরাতন, আজ তাহা নির্নিমেষ-নেত্রে পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও সে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না; অশ্রুর উচ্ছ্বাসে সে চারিদিক 'ঝাপ্‌সা' দেখিতে লাগিল। তাহার 'ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্ত' চির-বিদায়ের সম্ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া ক্ষুদ্র গৃহের সেই সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে হাহাকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশের অনেক ঊর্দ্ধে উঠিলেন। বেলা ক্রমেই অধিক হইতেছে দেখিয়া পেয়াদাদের ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল: তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ন্যায়রত্নকে আহ্বান করিল; কিন্তু সুমতি তখন এতই গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল যে; সেই আহ্বানধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না! আর অধিক বিলম্ব করিলে হয় ত পুনর্ব্বার লাঞ্ছিত হইতে হইবে বুঝিয়া ন্যায়রত্ন তৎক্ষণাৎ তুলসীমঞ্চের পাদমূল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক স্তূপীকৃত হস্তলিখিত গ্রন্থরাশির ভিতর হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতাখানি বাছিয়া লইয়া, সুমতির হাত ধরিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিলেন; তাহার পর তাঁহারা মা জগদম্বার মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে দেবীচরণে প্রণাম করিলেন। ন্যায়রত্ন দেবী জগদ্ধাত্রীর মহিমামণ্ডিত মুখের দিকে অশ্রুপূর্ণনেত্রে চাহিয়া

করযোড়ে বলিলেন, "মা জগদম্বে! এতদিন তুমি আমাকে যে পথে চালাইয়াছ—আমি সেই পথেই চলিয়াছি; আমাকে যে কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়াছ, সেই কর্ম্মই করিয়াছি। আজ চোর অপবাদ লইয়া, তোমার বাড়ী ঘর তোমাকেই সমর্পণ করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিলাম! কোথায় চলিলাম, জানি না; তুমিই তাহা জান; আমি এইমাত্র জানি, তুমি আমাদিগকে যেখানে লইয়া যাইবে, সেইখানেই যাইতে হইবে। আমাদের এই নির্ব্বাসন দণ্ড—তোমারই ইচ্ছার ফল।"—ন্যায়রত্নের কণ্ঠরোধ হইল; অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার শীর্ণ গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইতে লাগিল। ন্যায়রত্ন পুনর্ব্বার দেবীচরণে প্রণত হইয়া বলিলেন, "মা দয়াময়ি, দুর্গতিনাশিনী তুমি, যদি না বুঝিয়া কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, এ অধম সন্তানকে ক্ষমা করিও; চিরকালের জন্য বিদায় হই মা!"

ন্যায়রত্ন মন্দির হইতে নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, স্ত্রীপুরুষ অনেকেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা ভক্তিভরে ন্যায়রত্নের পদধূলি গ্রহণ করিল। সুমতি তাহার পূজনীয় ব্যক্তিগণকে প্রণাম করিয়া, সমবয়স্কাদের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। ন্যায়রত্ন হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তবে আমরা আসি, তোমাদের সঙ্গে এই শেষ দেখা!"

আগন্তুক গ্রামবাসিগণ সকলেই নির্ব্বাকভাবে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, কাহারও মুখে কথা সরিল না। তাহাদের সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ।

ন্যায়রত্ন চক্ষু মুছিয়া অশ্রুমুখী সুমতিকে সঙ্গে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক জন লোক তখনও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল; অবশিষ্ট সকলে নির্নিমেষনেত্রে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহারা দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে তাহারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ক্রমে তাঁহারা গ্রামের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে সুদূরপ্রসারিত প্রান্তর; শ্যামল শস্যশীর্ষে প্রান্তর সুশোভিত; দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত বৃক্ষরাজী! আরও দূরে প্রান্তর-প্রান্তস্থ ধূসর বনভূমি মেঘমালার ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছিল। গ্রামের ভিতর হইতে সঙ্কীর্ণ বক্র পথ প্রান্তর-বক্ষ ভেদ করিয়া গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে।

পেয়াদারা ন্যায়রত্ন ও সুমতিকে গ্রামপ্রান্তে রাখিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। যে কয়েক জন গ্রামবাসী তাঁহাদের সঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ তাঁহাদিগকে দুই একখানি পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করিল। কেহ কেহ প্রণামীস্বরূপ ন্যায়রত্নের হস্তে দুই একটি মুদ্রা পাথেয় দিয়া বলিল, "অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে; সম্মুখে যে গ্রাম পাইবেন, সেই গ্রামে গিয়া স্নানাহার করিবেন। ভগবান নিশ্চয়ই আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই যিনি জননীর স্তনে তাহার জন্য আহার সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তিনি নিরাশ্রয় নিরুপায় বিপন্ন সন্তানকে অনাহারে রাখিবেন না। আপনি যেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করুন, আমরা

সংবাদ পাইলেই সেইখানে গিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসিব।"

ন্যায়রত্ন তাহাদিগকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দান করিলেন; তাহার পর দুঃসহ বেদনাভার বক্ষে লইয়া কন্যা সহ রৌদ্র-প্রতপ্ত সংকীর্ণ প্রান্তর-পথে কম্পিতপদে অগ্রসর হইলেন। শত-বিহঙ্গম-কলকাকলি-মুখরিত, নানাজাতীয়-বৃক্ষরাজি-পরিবেষ্টিত, চিরজীবনের কর্ম্মক্ষেত্র, সাধনার শান্তিময় তপোবন, সহস্র সুখদুঃখপূর্ণস্মৃতির আগার, ছায়া-শীতল পল্লীখানি তাঁহাদের পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। অতীত জীবন ন্যায়রত্নের নিকট স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি কাতর-নয়নে একবার ঊর্দ্ধে—একবার সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার মস্তকের উপর সৌরকর-সমুদ্ভাসিত অনন্ত নীলাকাশ, সম্মুখে উদ্বেলিত-তরঙ্গ-সঙ্কুল অপ্রমেয় অসীম সংসার-সমুদ্র! একখণ্ড শুভ্র মেঘ ঊর্দ্ধাকাশ দিয়া সুমন্দ সমীরণহিল্লোলে লক্ষ্যহীন ভাবে অনির্দ্দিষ্ট পথে ভাসিয়া যাইতেছিল; ন্যায়রত্নও সেইরূপ—জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্নেহময়ী কন্যা সহ—অকূল সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া চলিলেন। সেই সময় এক জন রাখাল গোচারণক্ষেত্রে তাহার গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া, প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী একটি সুবিশাল বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া মেঠো সুরে গান গায়িতেছিল ঃ—

"হরি, এই কি গতি তার,
যে জন বিপদ্-তারণ মধুসূদন বলে বার বার!"

দশম পরিচ্ছেদ।

দিন যায়, সে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকে না; কাহারও দিন সুখে কাটে, কাহারও দিন দুঃখে অতিবাহিত হয়। দুঃখের দিন দুর্য্যোগপূর্ণ তমোময়ী রজনীর ন্যায় দীর্ঘ মনে হয়; মনে হয়, এ দিন বুঝি কাটিবে না! কিন্তু তাহাও কাটিয়া যায়। সুখ দুঃখ, পাপ তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা বক্ষে লইয়া সকলেরই দিন নিঃশব্দে চলিয়া যায়; কেবল পশ্চাতে রাখিয়া যায় স্মৃতি। সুখের স্মৃতি থাকে; দুঃখের স্মৃতিও পাষাণে অঙ্কিত রেখার ন্যায় দুঃখীর চিত্তপটে চিরমুদ্রিত থাকে।

ন্যায়রত্নের মান সম্ভ্রম ও সুখ শান্তির দিন চলিয়া গিয়াছে, কেবল তাহার মধুর স্মৃতি সুকোমল পুষ্পসৌরভের ন্যায় তাঁহার মনোমন্দিরে বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বপরিচ্ছেদবর্ণিত ঘটনার পর এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার নির্ব্বাসনকালে আত্মীয় স্বজনেরা পাথেয় বলিয়া তাঁহাকে যে অর্থ দান করিয়াছিল, কয়েকদিন পূর্ব্বে তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় সুমতিকে ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে! কিন্তু সে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের কন্যা, কি বলিয়া ভিক্ষা চাহিতে হয়, তাহা সে জানে না। গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষা চাইতে গিয়া তাহার মুখে কথা সরে না, তাহার মোটা মোটা চক্ষু দু'টি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে; সে অবনতমস্তকে দীননেত্রে কাতর ভাবে চাহিয়া থাকে। কি বলিতে হইবে—তাহা সে স্থির করিতে পারে না। তাহার মুখ দেখিয়া কোন গৃহস্থের সদয়হৃদয়া কন্যা বা

বধূ এক মুষ্টি ভিক্ষা দেয়, কেহ বা 'ধাড়ী মাগী, গতর খাটিয়ে খেতে পারিস্ নে? ভিক্ষে কর্‌তে লজ্জা হয় না?' ইত্যাদি দুর্ব্বাক্য বলিয়া তাহাকে দূর করিয়া দেয়! কি দুঃখে, কি কষ্টে পড়িয়া সে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে, তাহা জানিতে কাহার আগ্রহ হইবে? তাহার কষ্টের কথা ত কাহাকেও বলিবার নহে। যে দিন সে দুই চারি জন গৃহস্থের গৃহে মুষ্টি ভিক্ষা পায়, সে দিন পিতাপুত্রীর একবেলার অন্নের সংস্থান হয়; যে দিন ভিক্ষা না পায়, সেদিন উভয়েরই উপবাস! এইরূপে কোন দিন অর্দ্ধাশনে, কোন দিন অনশনে ক্রমাগত সুদীর্ঘ পথ চলিয়া ন্যায়রত্ন ও সুমতি উভয়েরই দেহ কঙ্কালসার হইয়াছে। এই কয় দিনেই ন্যায়রত্নের বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে!

কাজি সাহেবের আদেশ,—তাহারা বিজয় দত্তের এলাকায় বাস করিতে পারিবে না। সুমতিও সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহারা সেই পাপিষ্ঠ তালুকদারের অধিকারসীমায় পুনঃপ্রবেশ করিবে না, বাস করা ত দূরের কথা!

ন্যায়রত্ন বৃদ্ধ, সুমতি ভদ্রকন্যা—দীর্ঘপথ-ভ্রমণে অনভ্যস্তা। এ জন্য তাঁহারা প্রতিদিন কয়েক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াই পরিশ্রান্ত ও চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িতেন। সুস্থদেহ বলবান যুবক এক দিনে যে পথ অতিক্রম করিতে পারে, সেই পথ চলিতে তাঁহাদের তিন চারি দিন লাগিত। এই কয় দিনে তাঁহারা বিজয় দত্তের এলাকা অতিক্রম পূর্ব্বক বহুকষ্টে অন্য একজন তালুকদারের এলাকায় উপস্থিত হইলেন।

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। শুক্লপক্ষের খণ্ডচন্দ্র পূর্ব্বাকাশের বহু ঊর্দ্ধে হইতে ম্লান কৌমুদীধারা বিকীর্ণ করিয়া ধরাতল প্লাবিত করিতেছে। সুশীতল সান্ধ্য-সমীরণ মুক্ত প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। এই শান্ত সুন্দর মৌন সন্ধ্যায় ন্যায়রত্ন ও সুমতি সেই নির্জ্জন প্রান্তরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। কিছু দূরে একখানি গ্রাম। গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণী অস্ফুট চন্দ্রকিরণে ধূসর শৈলমালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল!

সুমতি কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "বাবা, এত দিনে আমাদের কষ্টের অবসান হ'ল।"

ন্যায়রত্ন অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "ভগবান জানেন।"

আবার কিছুকাল নীরব থাকিয়া সুমতি বলিল, "বাবা, সমস্ত দিন তুমি উপবাসী আছ, কিছুই তোমার খাওয়া হয় নি। সন্ধ্যা হয়ে গেল, আজ ত আর ভিক্ষে করবার সময় নেই। এখন আর এ মাঠের মধ্যে ব'সে থেকে কি হবে? ঐ ত গ্রামের গাছপালা দেখা যাচ্ছে, চল গ্রামের মধ্যে যাই।"

ন্যায়রত্ন বিনা বাক্য-ব্যয়ে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া সুমতি ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কিছুকাল পরে উভয়ে গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী আম কাঁটালের বাগান অতিক্রম করিয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পথের দুই ধারে দুই চারিটি সুবৃহৎ অট্টালিকা; কিন্তু অট্টালিকাগুলি জীর্ণ, শ্রীভ্রষ্ট। কোন কোন অট্টালিকার ছাদ ভেদ

করিয়া অশ্বথ ও বটবৃক্ষ ঊর্দ্ধে শাখা-বাহু প্রসারিত করিয়াছে ; ক্ষুধিত বাদুড়ের দল নিঃশব্দপক্ষসঞ্চালনে তাহাদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে , দুই একটা শৃগাল আহারের সন্ধানে অট্টালিকার সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, গ্রাম্য কুকুরগুলা চীৎকার করিয়া সবেগে তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। অট্টালিকাগুলির সম্মুখে লাল-ভেরেণ্ডা, কালকাশিন্দা ও আশ্শাওড়ার জঙ্গল। কোন অট্টালিকার কোন কক্ষে মৃৎপ্রদীপ মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, ভাঙ্গা জানালা দিয়া মৃদু দীপরশ্মি দেখা যাইতেছে। কোন কোন অট্টালিকা সম্পূর্ণ নির্জ্জন বোধ হইতেছে ; যেন তাহারা অতীতের সুখসমৃদ্ধির ও গৌরবের স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া ক্ষোভে দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে !

আরও কিছু পথ অতিক্রম করিয়া সুমতি এক গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিল। সে গৃহস্থের নিকট নিজেদের কোন পরিচয় না দিয়া, তাহার আঙ্গিনাস্থিত একখানি পরিত্যক্ত ভাঙ্গা ঘরে আশ্রয় প্রার্থনা করিল। নিরাশ্রয় বিদেশী লোক দেখিয়া গৃহস্থের দয়া হইল; সে সুমতির প্রার্থনায় সম্মতি দান করিলে, সুমতি ও ন্যায়রত্ন সেই রাত্রির জন্য সেই ভগ্নকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পথশ্রান্ত ন্যায়রত্ন তাঁহার মলিন উত্তরীয় প্রসারিত করিয়া তাহারই উপর শয়ন করিলেন, শয়নমাত্র তিনি নিদ্রাভিভূত হইলেন ; কিন্তু সুমতির চক্ষে ঘুম নাই ! সে তাহার পিতার পাশে বসিয়া ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতে লাগিল।—ভিক্ষা করিয়া অর্দ্ধাহারে, কোন দিন বা অনাহারে তাহারা এই কয়দিন কাটাইয়াছে ; আজ

সমস্ত দিন তাহাদের আহার হয় নাই! এ ভাবে কয়দিন চলিবে, কি উপায়ে সে তাহার বৃদ্ধ পিতার জন্য একমুষ্টি অন্নের সংস্থান করিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সুমতি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। গ্রামে দুই চারিটি অট্টালিকা আছে দেখিয়া তাহার ধারণা হইল, এই গ্রামে নিশ্চয়ই দুই চারি জন ধনবান লোক বাস করেন। সে সঙ্কল্প করিল, তাঁহাদের মধ্যে যদি কোন সদাশয় ব্যক্তি দয়া করিয়া তাহাকে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে সে সেই বৃত্তিই অবলম্বন করিবে; সেখানে যাহা পাইবে, তাহা দিয়া ও অবসরকালে কোন গৃহস্থবাড়ী কাঁথা-সেলাই করিয়া বা পৈতা কাটিয়া যাহা উপার্জ্জন হইবে, তদ্দ্বারা তাহার বৃদ্ধ পিতার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবে। যথাসাধ্য পরিশ্রম করিলে দুই জনের প্রতিপালনোপ-যোগী অর্থের সংস্থান হইবে না, ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কারণ, আমরা এই অকিঞ্চিৎকর আখ্যায়িকায় যে সময়ের কথা বলিতেছি—তখন এক মণ চাউলের মূল্য দশ টাকা ও একজোড়া মোটা কাপড়ের মূল্য ছয় টাকা হইতে পারে, এরূপ সম্ভাবনা কোনও গঞ্জিকাসেবীর উর্ব্বরমস্তিষ্কপ্রসূত অত্যন্ত অসম্ভব কল্পনারও আয়ত্তাতীত ছিল!

সুমতি ব্রাহ্মণকন্যা। দুরবস্থাপন্না অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যা ভদ্রপরিবারে পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত, এবং এই কার্য্যে তাহাদিগকে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হইত না, তাহা সে জানিত। সে চেষ্টা করিলে কোন-না-কোন ভদ্র

পরিবারে এইরূপ একটি চাকরী সংগ্রহ করিতে পারিবে ভাবিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল, এবং তাহার পিতার পদপ্রান্তে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইল।

সুমতি প্রভাতে উঠিয়া তাহার আশ্রয়দাতা গৃহস্থের কন্যার সহিত আলাপ করিল; সে কথাপ্রসঙ্গে সেই গৃহস্থকন্যার নিকট জানিতে পারিল, অল্পদিন পূর্ব্বে সেই পল্লীর অন্যতম গৃহস্থ বামদেব ভট্টাচার্য্যের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। ভট্টাচার্য্যের গৃহে ঠাকুরসেবা আছে; তিনি চাষীগৃহস্থ বলিয়া তাঁহার অনেকগুলি রাখাল কৃষাণকে দুবেলা খাইতে দিতে হয়। ভট্টাচার্য্য প্রাচীন, তাঁহার 'দ্বিতীয় সংসার' করিবার বয়স ও সুযোগ অনেক পূর্ব্বেই অতীত হইয়াছে; অথচ সংসারের ভার লইবার উপযুক্ত কোন স্ত্রীলোক নাই, এজন্য সংসারের সকল কাজ তাঁহারই ঘাড়ে পড়িয়াছে। স্ত্রীলোকের কার্য্য পুরুষের দ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না; সুতরাং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কষ্টের সীমা নাই।—সুমতি বুঝিল, সেখানে চেষ্টা করিলে পাচিকার কার্য্য জুটিতেও পারে; কিন্তু ব্রাহ্মণের একটা দোষের কথা শুনিয়া সুমতি একটু ভীত হইল। সে শুনিল, এই ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত দুর্ম্মুখ, সামান্য কারণেই তাঁহার মেজাজ গরম হইয়া উঠে; তখন তাঁহার মুখবিবর হইতে যে সকল দুর্ব্বাক্য নিঃসৃত হয়, তাহা শুনিলে মরা মানুষেরও না কি রাগ হয়!—এবং সেই সকল দুর্ব্বাক্য নিঃশব্দে পরিপাক করিতে না পারিয়া যদি কেহ প্রতিবাদ করে, তাহা হইলে ক্রোধান্ধ ভট্টাচার্য্য তাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের নরকভোগের ব্যবস্থা করেন;

এমন কি, 'পান হইতে চুণটুকু খসিলে' তাঁহার ব্রাহ্মণীরও পরিত্রাণ ছিল না! দিবারাত্রি 'ভূতের মত খাটিয়া' তাঁহাকেও নিত্য ব্রাহ্মণের নিকট গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত; মরিয়া তাঁহার হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে।

এই সকল কথা শুনিয়া সুমতি ক্ষণকাল চিন্তা করিল; শেষে সে মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিল,—ভট্টাচার্য্য মহাশয় যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে তাঁহার সংসারে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে সে প্রাণপণে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে, তাঁহার প্রত্যেক আদেশ নতশিরে পালন করিবে; তাহা হইলেও কি তাহাকে বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে? সাধ্যানুসারে তাঁহার আদেশ পালন করিলেও যদি তিনি অকারণ দুর্ব্বাক্য বলেন, তাহা হইলে সে তাহা নীরবে সহ্য করিবে। বোবার শত্রু নাই, এ কথাটার কি একেবারেই কোন মূল্য নাই?

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সুমতি তাহার পিতার সহিত বামদেব ভট্টাচার্য্য নামক দুর্ব্বাসাটির সন্ধানে চলিল। ভট্টাচার্য্যের গৃহের সন্ধান পাওয়া তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইল না।

তখনও অধিক বেলা হয় নাই, প্রাতঃসূর্য্য রক্তরাগনেত্রে পূর্ব্বাকাশ হইতে ধরাতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন মাত্র; ভট্টাচার্য্যের গৃহপ্রান্তবর্ত্তী একটি নিমগাছের শাখায় বসিয়া একটা দহিয়াল তখনও প্রভাতী সঙ্গীত গায়িতেছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানি জীর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক প্রস্ফুটিতপুষ্পপূর্ণ সাজিটি হাতে লইয়া ঠাকুরদালানে প্রবেশোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়

সুমতি তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে মস্তক অবনত করিল।

ভট্টাচার্য্য বিস্মিত নয়নে সুমতির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কে বাছা?"

সুমতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবনত মুখে বলিল, "আজ্ঞে, আমি ব্রাহ্মণকন্যা।"

ভট্টাচার্য্য ন্যায়রত্নের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার পশ্চাতে যে বুড়াটিকে দেখিতেছি, উনি কে?"

সুমতি বলিল, "উনি আমার পিতাঠাকুর।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তোমাদের বাড়ী?"

সুমতি বাসগ্রামের নাম প্রকাশ না করিয়া বলিল, "বাড়ী আমাদের অনেক দূরে।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "হুঁ! তা এখানে এসেছ কোথায়?"

সুমতি বলিল, "আপনারই কাছে।"

ভট্টাচার্য্য এ কথায় অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমারই কাছে!—আমার কাছে তোমার কি আবশ্যক?"

সুমতি মুখখানি কাঁচু-মাচু করিয়া বলিল, "ঠাকুর! বড়ই কষ্টে পড়ে' আপনার কাছে একটু কাজের চেষ্টায় এসেছি।"

ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার ন্যায়রত্নের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "তোমার বাবা ত দেখ্‌ছি বুড়ো মানুষ; ওঁর বয়স বোধ হচ্ছে আমার চেয়ে অনেক বেশী! উনি আবার কি কাজ করিবেন, আর জানেনই-বা কি কাজ?"

সুমতি বলিল, "আপনি সত্যই বলেছেন, আমার বাবার এখন আর কোন কাজ করবার শক্তি নেই ; কাজ উনি করবেন না, আমিই করবো !"

ভট্টাচার্য্যের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল ; তিনি ফুলের সাজিটি সাবধানে নামাইয়া রাখিয়া সুমতিকে বলিলেন, "তুমি ! তুমি ব্রাহ্মণ কন্যা, তুমি আমার কাছে কি কাজ করবে ?"

সুমতি বলিল, "ব্রাহ্মণ-কন্যার যে কাজ,—তা সমস্তই আমি করতে পারবো। রান্না করতে পারবো, ঘর গৃহস্থালীর যে কোন কাজের ভার দেবেন, তাই করবো।"

ভট্টাচার্য্য তখন ন্যায়রত্নের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ন্যায়রত্ন কতক কথা গোপনে রাখিয়া, এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে যতটুকু বলা যাইতে পারে, তাহা বলিয়া ভট্টাচার্য্যের কৌতূহল দূর করিলেন। ভট্টাচার্য্য তাঁহার সেই সংক্ষিপ্ত পরিচয়েই বুঝিতে পারিলেন, তিনি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ বটেন।

ভট্টাচার্য্য ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া ন্যায়রত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ঠাকুরপূজা জানেন ?"

ন্যায়রত্ন ঠাকুরপূজা জানেন কি না, এরূপ প্রশ্ন তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিবে, বা তাঁহাকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে—এ কথা তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তিনি মুহূর্ত্ত কাল ইতস্ততঃ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "ব্রাহ্মণের ছেলে, বুড়া হইয়াছি,

ঠাকুরপূজা জানি না বলিলে আপনি হয় ত আমাকে ভ্রষ্টাচারী নাস্তিক মনে করিবেন।—আমি সামান্য কিছু জানি।”

চাকরীর উমেদারী করিতে আসিয়া, কপালে জয়পত্র বাঁধিয়া নিজের ঢাক নিজে না বাজাইলে চলে না, সরল ধর্ম্মভীরু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহা জানিতেন না, বা জানিয়াও তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহার এই কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া ও ‘সামান্য কিছু জানি’—প্রকৃত জ্ঞানীর স্বভাবস্নিগ্ধ এই অপ্রগল্‌ভ উক্তি শুনিয়া, প্রখর বৈষয়িকবুদ্ধিসম্পন্ন ভট্টাচার্য্যের মনে সংশয় উপস্থিত হইল; তিনি ন্যায়রত্নকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “সামান্য কিছু জানেন! ঠাকুরপূজা করবেন, তার মধ্যে সামান্য আর অসামান্য কি আছে? আচ্ছা বলুন দেখি, নারায়ণের ধ্যান কি?”

ন্যায়রত্ন নয়ন মুদিত করিয়া নারায়ণের দিব্যমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে স্থান কাল বিস্মৃত হইলেন সুললিতকণ্ঠে উদাত্তস্বরে আবৃত্তি করিলেন,—

“ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ।”

এই ধ্যান আবৃত্তি করিতে করিতে ন্যায়রত্নের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল, উভয় চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়া তাঁহার উভয় গণ্ড প্লাবিত করিল। তাঁহার বোধ হইল, শঙ্খচক্রধারী

হিরণ্ময়বপু নারায়ণ সবিতৃমণ্ডলমধ্যস্থ শতদল পদ্মাসনে আবির্ভূত হইয়া সহাস্যবদনে ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেছেন! সেই ভট্টাচার্য্যের দেবায়তনে আর কেহ কখনও তেমন ভক্তিভরে ও আন্তরিকতার সহিত ভগবৎ-স্তোত্র আবৃত্তি করিয়াছেন কি না সন্দেহ। ভট্টাচার্য্য বুঝিলেন, বৃদ্ধ কেবল যে ব্রাহ্মণকুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ নহে, তিনি ভক্ত, ভাবুক ও প্রেমিক।

ভট্টাচার্য্য ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া ন্যায়রত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি হইয়া এই অল্পবয়স্কা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কেন পথে পথে বেড়াইতেছেন?"

ন্যায়রত্ন কাতরভাবে বলিলেন, "মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না।"

ভট্টাচার্য্য ন্যায়রত্নকে আর কোন কথা না বলিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, এই ব্রাহ্মণ ও তাহার বিধবা কন্যাটিকে গৃহে স্থান দিলে মন্দ হয় না; ব্রাহ্মণটি ঠাকুর-পূজা করিবে, তাহার কন্যা রন্ধনাদি সংসারের সকল ভার লইতে পারিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহার যুবতী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া এ ভাবে পথে বাহির হইয়াছে কেন? তাহার এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ বলিতেই বা তাহার অনিচ্ছা কেন? মেয়েটির মাথা মুড়ানো! ইহারই বা কারণ কি? যুবতী বিধবাকে স্বেচ্ছায় মস্তক মুণ্ডন করিতে ত প্রায়ই দেখা যায় না। তবে কি এই যুবতী ভ্রষ্টচরিত্রা?—সম্ভব বটে! এই ব্রাহ্মণের গ্রামের লোকেরা হয় ত যুবতীর কলঙ্কের কথা জানিতে

পারিয়া মাথা মুড়াইয়া মেয়েটীকে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিয়াছে; স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কন্যাকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, কন্যাসহ ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিয়াছে। এই জন্যই বোধ হয় ব্রাহ্মণ কন্যাসহ পথে বাহির হইবার কারণ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক।

ভট্টাচার্য্য অনেকক্ষণ ধরিয়া এই সকল কথা চিন্তা করিলেন; অবশেষে তিনি স্থির করিলেন এরূপ অজ্ঞাতকুলশীল ব্রাহ্মণ ও তাহার কন্যাকে গৃহে স্থান দেওয়া সঙ্গত নহে।

ন্যায়রত্ন সুমতি সহ গৃহপ্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া ভট্টাচার্য্যের মতামতের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ভট্টাচার্য্য ঘরের বাহিরে আসিয়া ন্যায়রত্নকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমাদের এই গ্রামের কেহই আপনাদিগকে চেনে না, আপনাদের সম্বন্ধে কোনও কথা জানে না। আপনার সহিত আলাপ করিয়া আপনাকে সুব্রাহ্মণ বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছে; কিন্তু আপনি এই যুবতী কন্যাসহ কি কারণে পথে বাহির হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতে আপনাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম! এই জন্য আমার সন্দেহ হইতেছে, আপনার মেয়েটির চরিত্র পবিত্র নহে; এরূপ সন্দেহস্থলে উহার হস্তে অন্নজলগ্রহণে আমার প্রবৃত্তি হইবে না; এবং সমাজও আমার এই কার্য্যের সমর্থন করিবে না। এ অবস্থায় আমার গৃহে কি করিয়া আপনাদের স্থান হইতে পারে?"

সুমতি স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ভট্টাচার্য্যের সকল কথা শ্রবণ করিল। সাধ্বী রমণীর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে দোষারোপের ন্যায়

মর্ম্মান্তিক কটূক্তি তাহার পক্ষে আর কিছুই নাই ; সুমতি সর্ব্বাঙ্গে শতবৃশ্চিক-দংশনজ্বালা অনুভব করিল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার পিতার হাত ধরিয়া ভট্টাচার্য্যের গৃহপ্রাঙ্গন পরিত্যাগপূর্ব্বক পথে আসিয়া দাঁড়াইল। ভট্টাচার্য্য তাহাদের এই বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া শিখা আন্দোলনপূর্ব্বক গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার অনুমানই সত্য ; আমার মুখে কুলের পরিচয় পাইয়া আর এক মুহূর্ত্ত উহারা এখানে দাঁড়াইতে সাহস করিল না ; ঠিক যেন জোঁকের মুখে চুণ পড়িয়াছে! হুঁঃ, এত বয়স হইল, এখনও কি মানুষ চিনিবার শক্তি হয় নাই? প্রভাতেই একটা পাপিষ্ঠার মুখদর্শন করিলাম, আজ দিনটা যে বড় ভাল যাইবে, এরূপ বোধ হয় না।"

সুমতির মুখ দেখিয়াই ন্যায়রত্ন বুঝিতে পারিলেন, ভট্টাচার্য্যের আরোপিত কুৎসিত অপবাদে সে মনে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছে। তিনি নানা কথায় তাহাকে সান্ত্বনা-দানের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পিতার কোন কথাই তাহার কর্ণে স্থান পাইল না। ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে তখন তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল ; কি এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার বুকের ভিতর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সুমতি সেই শান্ত সুন্দর নির্ম্মল প্রভাতে সেই গ্রাম্য পথের ধারে বসিয়া-পড়িয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিল ; জীবন তাহার নিকট জটিল প্রহেলিকা ও নিদারুণ দুর্ব্বহ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাহার ধারণা হইল, মিথ্যা কলঙ্কের পশরা বহিবার জন্যই সে এই পৃথিবীতে আসিয়াছে। তাহার জীবন

অবিরাম দুঃখ কষ্ট ও অপমানের কণ্টক-ক্ষেত্র। সে দিন কাজি সাহেব চোর অপবাদ দিয়া তাহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, সমগ্র গ্রামবাসীর সম্মুখে তাহার লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া গ্রাম হইতে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিল; আজ এই ভিন্ন গ্রামে আর এক জন অকারণ তাহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে গুরুতর কলঙ্কের কালী লেপন করিল! ইহার পর তাহার অদৃষ্টে আরও কত লাঞ্ছনা আছে, কে বলিতে পারে? সে ভাবিল, পদে পদে এরূপ লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিয়া এই আশাহীন আনন্দহীন দুর্ব্বহ কষ্টের জীবন রাখিয়া ফল কি? এখন তাহার পক্ষে মরণই মঙ্গল, জীবনে সে যে শান্তি লাভ করিতে পারে নাই, মৃত্যুর পর তাহা দুর্লভ না হইতেও পারে। মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া সে মৃত্যুর জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল; স্থির করিল, বিষপানে বা উদ্বন্ধনে সে প্রাণত্যাগ করিবে।

সুমতি আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, এমন সময় অতীন্দ্রিয় শ্রবণশক্তি-বলে সে যেন শুনিতে পাইল—কে তাহার কর্ণমূলে বলিতেছে, 'বাছা, তুমি আত্মহত্যা করিলে তোমার বৃদ্ধ পিতার কি দশা হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? কে তাঁহার পরিচর্য্যা করিবে? তুমি মরিলে এই প্রবাসে তোমার পিতারও জীবনান্ত শেষ হইবে। আত্মহত্যা মহাপাপ; একে ত এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, তাহার উপর তুমি পিতৃহত্যার পাতকেও লিপ্ত হইবে, নরকেও তোমার স্থান হইবে না। মৃত্যুর পর তোমার অশান্ত আত্মা শ্মশানবাসী প্রেতের ন্যায় নিরন্তর নিরাশ্রয়ভাবে

হাহাকার করিয়া বেড়াইবে। সহ্য কর, সহ্য কর; সহিষ্ণুতাই মনুষ্যের রক্ষাকবচ। মিথ্যা কলঙ্কের ভার দুর্ব্বহ মনে করিতেছ, কলঙ্ক সত্য হইলে কি সে ভার বহন করিতে পারিতে?"

সুমতির মনে হইল, ইহা দৈববাণী! ভগবানই তাহাকে এই পাপ-সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। সত্যই ত, সে আত্ম-হত্যা করিলে কিরূপে তাহার পিতার জীবন রক্ষা হইবে? আর কোনও কারণে না হউক, তাহার পিতার সেবা শুশ্রূষার জন্যই তাহার প্রাণধারণ করা আবশ্যক।—সুমতির সঙ্কল্প বিচলিত হইল। পিতার সুখ-দুঃখের তুলনায় সুমতি নিজের সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, প্রশংসা-গঞ্জনা নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিত। তাহার পিতা মানব-সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ; তিনি পবিত্রচেতা, মহাপণ্ডিত, ভগবদ্ভক্ত, সকল সদ্‌গুণেরই আধার; তাঁহাকেই যখন ভাগ্য-বিড়ম্বনায় এত দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা উৎপীড়ন ও মনস্তাপ সহ্য করিতে হইতেছে, তখন দুঃখে কষ্টে ও মিথ্যা কলঙ্কে কি তাহার বিচলিত হওয়া শোভা পায়? যাঁহারা মহৎ, ভগবান তাঁহাদিগকেই মহাদুঃখ সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছেন। লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাদেবী রাজমহিষী হইয়াও মিথ্যা কলঙ্কের ভার বহন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; আজীবনকাল তাঁহাকে দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। রঘুকুলরাজলক্ষ্মী, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মহিষী মহারাণী শৈব্যাকেও কি অল্প দুঃখ কষ্ট, উৎ-পীড়ন, লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে? তাঁহারা যদি সে সকল দুঃখ যন্ত্রণা নতশিরে সহ্য করিয়া থাকেন, তবে দরিদ্র ব্রাহ্মণের

বিধবা কন্যা সে, দুঃখ কষ্টে কেন অধীরা হইবে? রামায়ণ-মহাভারত-বর্ণিত পূতচরিত্রা মহিয়সী নারীগণের অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতার কাহিনীগুলি একে একে সুমতির স্মরণ হওয়ায় তাহার হৃদয়ে যেন দৈববলের সঞ্চার হইল; মিথ্যা কলঙ্ক, অপমান, গঞ্জনা তাহার নিতান্ত তুচ্ছ বোধ হইল। সুমতি উঠিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বদিন হইতে তাহার পিতা উপবাসী আছেন, এ কথা স্মরণ হওয়ায় সে অদূরবর্ত্তী পল্লীতে আর এক জন গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিল।

সেই বাঁড়ীতে একটী স্ত্রীলোক সম্মার্জ্জনীহস্তে গৃহপ্রাঙ্গন পরিষ্কৃত করিতেছিল। সুমতি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করুণস্বরে বলিল, "মা, আমি বামুনের মেয়ে; কাল থেকে আমার বুড়ো বাবা উপবাসী আছেন, দয়া করে যদি আমাকে কিছু ভিক্ষে দাও ত—"

সুমতির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই বর্ষীয়সী গৃহস্থরমণী কুৎসিত মুখভঙ্গী করিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "আ মলো যা! সময় নেই, অসময় নেই, সকাল বেলা উঠোনে ছড়া-ঝাঁট পড়্‌তে না পড়্‌তে কোত্থেকে ভিকিরী এসে হাজির! একেবারে পেট হাতে করে এসেছে! আবার বলা হচ্চে বামুন; কি রকম বামুন? ভাট না আচায্যি?"

স্ত্রীলোকটির এই দুর্ব্বাক্য সুতীক্ষ্ণ শেলের ন্যায় সুমতির মর্ম্মভেদ করিল; কিন্তু অভুক্ত ক্ষুধিত পিতার শুষ্ক মুখখানির কথা মনে পড়ায় অতিকষ্টে সে আত্মসংবরণ করিল। উদরান্নের অভাবে

ভিক্ষালাভের আশায় যাহাকে অন্যের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে, তাহার আবার মান অপমান কি? দুর্ব্বাক্য শুনিয়া বিরক্ত হইলে ভিক্ষা করা চলে না। সুতরাং সুমতি স্ত্রীলোকটির কথায় বিরক্ত না হইয়া কাতরভাবে বলিল, "না মা, আমরা ভাটও নই, আচার্য্যিও নই, আমরা ভাল বামুন।"

কিন্তু স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত মুখরা, সুমতির কাতরতা-দর্শনে তাহার মনে বিন্দুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না; সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ভাল বামুন! ভাল বামুন জাতব্যবসা ছেড়ে পেটের দায়ে ভিক্ষে করেই বেড়ায় বটে! গেরস্তর দুয়োরে 'ভিক্ষে দাও গো' ব'লে দাঁড়া'লেই বুঝি কাঁড়ি কাঁড়ি ভিক্ষে পাওয়া যায়? ঘোর কলি, ঘোর কলি! বামুনের মেয়ে পৈতে কাটা চরকা কাটা ছেড়ে পেটের দায়ে দুয়োরে দুয়োরে ভিক্ষে করে বেড়ায়,—এমন ব্যাভার চোখেও দেখি নি—কানেও শুনি নি! টাকায় দশ আড়ি (প্রায় চারি মণ) ধান ছিল; বছর মন্দ, আট আড়ির ওপর এক কাঠাও পাবার যো নেই! ভিক্ষে বড় সস্তা নয়? না লো, এখানে কিছু হবে-টবে না। ও পাড়ার মজুমদারদের বাড়ী আজ 'ছেরাদ্দ' (শ্রাদ্ধ) হচ্ছে, সেইখানে যা; বিকেলে কাঙ্গালী বিদেয় হবে, এক মাল্‌সা চিঁড়ে গুড় পাবি, বুড়ো বাপ্‌কে পেট ভরে খেতে দিস্।"

গৃহস্থ-রমণীর কথায় সুমতির চক্ষে জল আসিল। 'হা ভগবান্, শেষে শ্রাদ্ধের বাড়ীতে কাঙ্গালী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে! না জানি অদৃষ্টে আরও কত দুর্গতি আছে!' মনে মনে এই কথা

বলিয়া সুমতি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নিঃশব্দে সেই গৃহস্থের গৃহ ত্যাগ করিল।

ন্যায়রত্ন কিছু দূরে পথে বসিয়া কন্যার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সুমতি বিষণ্ণবদনে ছল-ছল নেত্রে ধীরে ধীরে পিতার নিকট উপস্থিত হইল। তখন পথে লোকজনের যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছিল; তাহাদের অনেকেই শ্রাদ্ধবাড়ীর সমারোহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে যাইতেছিল। তাহাদের কথা শুনিয়া ন্যায়রত্ন বুঝিতে পারিলেন—হরিনাথ মজুমদার সেই গ্রামের একজন ধনবান ব্যক্তি, সেই দিনেই তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ। মজুমদার খুব ঘটা করিয়া মাতৃশ্রাদ্ধ করিতেছেন; নিকটবর্ত্তী দশখানি গ্রামের আত্মীয় কুটুম্বেরা তাঁহার বাড়ীতে কুটুম্বিতা করিতে আসিয়াছে। বার জন হালুইকর ব্রাহ্মণ সহর হইতে লুচি ভাজিতে আসিয়াছে। দুই গোলা চিঁড়া ও এক গোলা মুড়কী কাঙ্গালীবিদায়ের জন্য প্রস্তুত! দেশ বিদেশের বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন—ন্যায়রত্ন পথে বসিয়াই গ্রামস্থ পথিকগণের মুখে এই সকল আলোচনা শুনিতে পাইলেন।

শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের 'পত্রী' হইয়াছে শুনিয়া ন্যায়রত্নের সেখানে যাইতে ইচ্ছা হইল।

দেশ বিদেশের এই প্রকার কত শ্রাদ্ধসভায় ন্যায়রত্নের নিমন্ত্রণ হইত, সেই এলাকার মধ্যেই তিনিই 'একপত্রী' ছিলেন; আর আজ এই শ্রাদ্ধসভায় তিনি অনাহূতভাবে উপস্থিত হইবেন, এ কথা মনে করিতে সুমতি মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিল;

কিন্তু সেই সুখ ও সম্মানের দিন অতীত হইয়াছে! দু'দিন যিনি অনশনে আছেন, ভিক্ষাও আজ যাঁহার পক্ষে দুর্লভ, তাঁহার অভিমান করা সাজে না ভাবিয়া সুমতি তাহার পিতাকে শ্রাদ্ধ-সভায় উপস্থিত হইতে নিষেধ করিল না। ন্যায়রত্ন সুমতিকে একটি প্রাচীন কৈবর্ত্তরমণীর কুটীরে রাখিয়া ধীরে ধীরে হরিনাথ মজুমদারের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। মজুমদারের বাড়ী কোন্ দিকে, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইল না; কারণ সেই পথ দিয়া দলে দলে লোক হরিনাথের মাতৃশ্রাদ্ধ দেখিতে যাইতেছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্ন যখন হরিনাথ মজুমদারের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা অধিক হয় নাই। তিনি সেখানে বহুলোকের সমাগম ও আয়োজন আড়ম্বর দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, সমারোহের শ্রাদ্ধই বটে! মজুমদার তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধ্যানুরূপ অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হন নাই। ন্যায়রত্ন ক্ষণকাল বহিঃপ্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান থাকিয়া অন্যান্য লোকের সহিত শ্রাদ্ধ-সভায় প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন সভার একধারে প্রচুর মূল্যবান্ দানসামগ্রী সজ্জিত রহিয়াছে; সুদৃশ্য মশারি-সমাচ্ছাদিত খট্টা হইতে সবৎসা গাভী পর্য্যন্ত কোন দ্রব্যই

বাদ যায় নাই। অন্যপার্শ্বে কারুকার্য্য খচিত একখানি সুবিস্তীর্ণ গালিচায় দেশ বিদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সশিষ্য শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবেশনপূর্ব্বক হাত মুখ নাড়িয়া, শিখা আন্দোলিত করিয়া শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ করিয়াছেন।

ন্যায়ের একটি জটিল সিদ্ধান্ত লইয়া তখন দুই জন বিখ্যাত নৈয়ায়িকের মধ্যে তর্ক-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। উভয়েই মহা তার্কিক; এবং ন্যায়শাস্ত্রে আপনাকে অদ্বিতীয় মনে করিয়া উভয়েই আত্মাভিমানে স্ফীত! কেহই ভ্রম স্বীকার করিবার পাত্র নহেন। সুতরাং প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিবার জন্য তাঁহারা শাস্ত্রীয় বচনের সহিত এতই অশাস্ত্রীয় গালি বর্ষণ করিয়া স্ব স্ব-পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছিলেন যে, তাঁহাদের তর্ক বিতর্ক শ্রবণ করিয়া এত দুঃখেও ন্যায়রত্নের হাস্যসংবরণ করা কঠিন হইল।

ন্যায়রত্ন সভার একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া পণ্ডিতদ্বয়ের তর্ক বিতর্ক শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি যে একজন মহাপণ্ডিত, তাঁহার সেই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, ইহা কাহারও অনুমান করিবার শক্তি ছিল না। তিনি অনাহূত অপরিচিত ভিক্ষুকমাত্র, কেহই তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিল না; তিনিও দিগ্দেশাগত নিমন্ত্রিত পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনাহূত-ভাবে উপবেশন করা শিষ্টাচার-সঙ্গত মনে করিলেন না। কিন্তু পণ্ডিতগণের স্বভাব তিনি কিরূপে পরিত্যাগ করিবেন? কথিত আছে, মহাকবি কালিদাস ছদ্মবেশে দেশ-ভ্রমণকালে একদিবস বাধ্য হইয়া রাজার

বহিয়াছিলেন; তিনি বেহারার সহিত পাল্কী কাঁধে করিলেন, তথাপি এই হীন কার্য্য হইতে পরিত্রাণ-লাভের আশায় আত্ম-পরিচয় প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে সেই রাজার মুখ হইতে যখন অশুদ্ধ বাক্য উচ্চারিত হইল, তখন তিনি তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। ন্যায়রত্ন যখন দেখিলেন, তর্কনিরত পণ্ডিতদ্বয় ভুল তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছেন, তখন তাঁহার ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইল; তিনি আর নির্ব্বাক থাকিতে পারিলেন না। তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পণ্ডিতদ্বয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বচন আবৃত্তি ও তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদের ভ্রম প্রদর্শন করিলেন।

পণ্ডিতদ্বয় স্ব স্ব ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তর্কযুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন। সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে ন্যায়রত্নের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা দেখিল, একখানি মলিন বস্ত্রপরিহিত, বিশুষ্কবদন, জীর্ণ-নামাবলি-বেষ্টিতমস্তক, শীর্ণকায় একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সভাধিরূঢ় দুইজন খ্যাতনামা বিদ্যাদিগ্‌গজের পাণ্ডিত্যাভিমান চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন! ইহা এমন অদ্ভুত অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্যাপার যে, সভার তুমুল কোলাহল মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হইল, সকলেরই মনে হইল, তাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে!

মানুষমাত্রই ভ্রম প্রমাদের অধীন; ভুল না হয় কার? ভ্রম প্রদর্শন করিলে উদারহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই ভ্রম স্বীকার করেন; কিন্তু এরূপ উদারতা সকলের নিকট আশা করা যায় না।

যে দুই জন নৈয়ায়িক সভাস্থলে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা খ্যাতি প্রতিপত্তি অধিক ছিল; এবং তাঁহাদের দম্ভস্ফীত হৃদয়ে উদারতার লেশমাত্র ছিল না। সেই সভাস্থলে দেশবিদেশাগত পণ্ডিতমণ্ডলী, অধ্যাপকবৃন্দ, ও তাঁহাদের ছাত্রবর্গের সমক্ষে এই ভাবে অপদস্থ হইয়া তাঁহারা মর্ম্মাহত হইলেন, এবং অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল, অনিমন্ত্রিত একটা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের এত স্পর্দ্ধা! সে সভাসীন সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর অপমান করিতে সাহস করিল! সশিষ্য পণ্ডিতেরা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; ক্রোধাতিশয্যে তাঁহাদের নস্যের ডিবা স্থানভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত হইল; অনেকের কাছা খুলিয়া গেল। তাঁহারা শিখা আন্দোলিত করিয়া ন্যায়রত্নকে তাঁহার ধৃষ্টতার উপযুক্ত শিক্ষা দানের জন্য অগ্রসর হইলেন! দেখিতে দেখিতে সভা ভাঙ্গিয়া গেল।

কিন্তু ন্যায়রত্ন পণ্ডিতগণের আকস্মিক ধৈর্য্যবিচ্যুতিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না; অপমান বা লাঞ্ছনা অপরিহার্য্য বুঝিয়াও প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন না। তিনি মনে করিলেন, পণ্ডিতেরা প্রকাশ্য সভায় অপদস্থ হইয়া ক্ষুব্ধ ও কুপিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ক্রোধ খড়ের আগুনের মত ক্ষণস্থায়ী; তিনি মিষ্টবাক্যে অচিরে তাঁহাদিগকে শান্ত ও সংযত করিতে পারিবেন।

কিন্তু ন্যায়রত্নের আশা পূর্ণ হইল না। ক্রুদ্ধ পণ্ডিতদ্বয়ের ভক্ত শিষ্যেরা অধিকতর অপমান বোধ করিয়া মুহূর্ত্তে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, এবং একটি যণ্ডামার্ক শিষ্য গুরুভক্তির দুর্দ্দমনীয়

উচ্ছ্বাসে ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার গলায় গামছা জড়াইয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল; অন্যান্য শিষ্যেরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, নিরুপায়, উপবাসক্লিষ্ট, দুর্ব্বল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঘাড়ে ও পিঠে ধাক্কা মারিয়া পাণ্ডিত্য-মহিমা প্রকাশ করিতে লাগিল!

এই ব্যাপারে চারি দিকে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সকল লোক সেই দিকে দৌড়িতে লাগিল। গৃহস্বামী হরিনাথ শুনিতে পাইলেন, এক জন বৃদ্ধ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হঠাৎ শ্রাদ্ধ সভায় প্রবেশ করিয়া দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে সমাগত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছে! পণ্ডিতদের ছাত্রেরা গুরুর অপমানদর্শনে ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া সেই ভিক্ষুককে ধাক্কা মারিয়া সভার বাহিরে তাড়াইয়া দিয়াছে; ইহাই গোলমালের কারণ।

হরিনাথ তখন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রাদ্ধসভায় সহসা এইরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় তিনি বিচলিত হইয়া, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বহিঃপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, পণ্ডিতের দল কিছু দূরে দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিতেছেন। ন্যায়রত্ন মৃতবৎ মাটীতে পড়িয়া প্রহার-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন; এবং একটি যুবক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতেছে। বৃদ্ধের চক্ষু নিমীলিত, এক একবার তিনি মুখ বিকৃত করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া হরিনাথের কোমল হৃদয় আর্দ্র হইল; কিন্তু যে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ অনাহূত ভাবে শ্রাদ্ধসভায় প্রবেশ করিয়া

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অপমান করিতে সাহস করে, তাহার লাঞ্ছনায় ক্ষোভ প্রকাশ করিলে পাছে তাঁহাকে পণ্ডিতগণের বিরাগভাজন হইতে হয়, এই ভয়ে তিনি সহানুভূতিসূচক কোনও কথা বলিতে সাহস করিলেন না; অগত্যা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের দুর্গতি দেখিতে লাগিলেন।

যে ব্রাহ্মণ-যুবক ন্যায়রত্নের পাশে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিল, সে হরিনাথকে দেখিয়া তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, আপনার বাড়ীতে আজ কি অন্যায় কর্ম্মই হইয়া গেল! হরিরামপুরের মহাপণ্ডিত পরমভাগবত তারানাথ ন্যায়রত্ন আপনার বাড়ীতে এইরূপ লাঞ্ছিত হইলেন, আর আপনি নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিতেছেন!"

ন্যায়রত্নের শ্রীহীন বিবর্ণ শীর্ণ দেহ, উপানৎবিহীন ধূলিধূসরিত পদযুগল এবং ভিক্ষুকের ন্যায় মলিন ও জীর্ণ পরিচ্ছদ দেখিয়া, এই বৃদ্ধ সত্যই যে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক তারানাথ ন্যায়রত্ন, ইহা বিশ্বাস করিতে হরিনাথের প্রবৃত্তি হইল না; তথাপি এই ব্রাহ্মণ-যুবক কি উদ্দেশ্যে বৃদ্ধটিকে তারানাথ ন্যায়রত্ন বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল; কিন্তু তিনি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার এক জন কর্ম্মচারী সেই স্থানে দৌড়াইয়া আসিয়া ব্যগ্রভাবে তাঁহার কানে কানে বলিল, "সভাস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অপমানিত হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন; আপনি তাঁহাদের নিকট ত্রুটী স্বীকার না করিয়া, যে তাঁহাদের

অপমান করিল, এখানে আসিয়া তাহারাই তত্ত্বতল্লাস লইতেছেন, শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া একযোগে আপনার গৃহ-ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছেন।" এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ম্মকর্ত্তা হরিনাথ সশঙ্কচিত্তে ক্রোধোন্মত্ত পণ্ডিতদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদের নিকট করযোড়ে ত্রুটীর মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া পণ্ডিতেরা নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিলেন; অনন্তর তাঁহাদেরই এক জন চাঁই 'করচ' হইতে নস্যপূর্ণ 'শামুক' বাহির করিয়া, নাসিকার লোমবহুল ছিদ্রপথে প্রায় একতোলা নস্য পুরিয়া সজলনেত্রে বলিলেন, "চল হে বিদ্যেবাগীশ! সকলকে নিয়ে সভায় চল; শাস্ত্রেই বলেছে, 'সহনঞ্চাপকারস্য সামর্থ্যেপি ক্ষমা মতা।' আমাদের যথেষ্ট অপমান হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে কৃতীর বিশেষ অপরাধ নেই; ওঁকে ক্ষমা করাই মহত্ত্ব। কি বল তর্করত্ন ভায়া?"—তর্করত্ন স্থূল শিখায় হাত বুলাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ঠিক; ক্ষমাই মহত্তের ভূষণ। এবার ওঁকে ক্ষমা করা গেল; কিন্তু দক্ষিণার সময় যেন কোন ত্রুটী না হয়।"—পণ্ডিতেরা দল বাঁধিয়া পুনর্ব্বার সভাস্থ হইলেন।

ব্রাহ্মণ যুবকের শুশ্রূষায় ন্যায়রত্ন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন, যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পার্ব্বতি, তুমি এখানে?"

পার্ব্বতী বলিল, "আপনার টোল বন্ধ হইবার পর উপস্থিত পণ্ডিতগণের অন্যতম মধুসূদন তর্কবাগীশ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিতেছি। অধ্যাপক মহাশয়ের সঙ্গেই এখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছি; কিন্তু

আপনি এখানে এ বেশে কি কারণে উপস্থিত হইলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছি!"

ন্যায়রত্ন মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "দেখ পার্ব্বতি, সে সকল কথা শুনিবার জন্য তুমি আগ্রহ প্রকাশ করিও না। কেবল তাহাই নহে, যদি তুমি একদিনও আমাকে তোমার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার এই একটী অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে;—আমার পরিচয় তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

কিন্তু পার্ব্বতী শ্রাদ্ধসভায় ন্যায়রত্নকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল, এবং অধ্যাপক-শিষ্যেরা তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে উদ্যত হইলে পার্ব্বতীই তাঁহার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় দিয়া ক্রোধোন্মত্ত ব্রাহ্মণবটুদিগের কবল হইতে তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিল; সুতরাং ন্যায়রত্ন তাঁহার পরিচয় গোপন রাখিবার জন্য পার্ব্বতীকে অনুরোধ করিবার পূর্ব্বেই সে তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; কিন্তু শেষে সে ভাবিয়া দেখিল, ইহাতে ন্যায়রত্নের উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে না। কারণ, আত্মাভিমানী পণ্ডিতের দল তাহার কথা বিশ্বাস করেন নাই; তাঁহারা প্রকাশ্য সভায় অপদস্থ হইয়া ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের শিষ্যেরা হিতাহিত-জ্ঞান হারাইয়া ঔদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। যাহা হউক পার্ব্বতী স্থির করিল, ন্যায়রত্ন সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করিবে না।

অতঃপর পার্ব্বতী সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট ন্যায়রত্নের পরিচয় প্রদান না করিলেও, এবং ন্যায়রত্নের সহিত সেই সকল পণ্ডিতের দেখা সাক্ষাৎ বা পরিচয় না থাকিলেও, তাঁহার নাম উপস্থিত পণ্ডিতগণের সকলেরই সুবিদিত ছিল ; ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার কিরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহাও পাণ্ডিত্যাভিমানী কোন অধ্যাপকের অগোচর ছিল না। বিশেষতঃ, ন্যায়রত্ন প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র হইতে যে সকল বচন ও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তর্ক-নিরত পণ্ডিতদ্বয়ের ভ্রমসংশোধন করিয়াছিলেন,—পণ্ডিতগণের ঔদারিকতা অপেক্ষা উদারতা ও ক্রোধ অপেক্ষা বুদ্ধি অধিক থাকিলে তাঁহারা তাহা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিতেন—অনাহূত আগন্তুক বৃদ্ধ ভস্মাচ্ছাদিতবহ্নিবৎ ছদ্মবেশী কোন মহাপণ্ডিত ! সুতরাং তাঁহার প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিয়া সমুচিত আদর অভ্যর্থনা করা তাঁহাদের সকলেরই কর্ত্তব্য ছিল ; কিন্তু প্রকাশ্য সভায় অপ্রত্যাশিতভাবে অপদস্থ হওয়ায় তাঁহারা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, এবং ন্যায়রত্নের নির্য্যাতনে ও কুণ্ঠিত হন নাই !

ক্রোধের বশে হঠাৎ অন্যায় করিয়া ফেলিলে, ক্রোধান্তে ভদ্রলোকমাত্রেরই মনে অনুতাপের সঞ্চার হয়। ক্রোধের উপশম হইলে পণ্ডিতেরা ন্যায়রত্নের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। এক জন প্রাচীন পণ্ডিত অনুতপ্তস্বরে বলিলেন, "উনি যদি সত্যই হরিরামপুরের সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক তারানাথ ন্যায়রত্ন হন, তাহা হইলে কার্য্যটা বড়ই গর্হিত হইয়াছে।"

আর এক জন পণ্ডিত বলিলেন, "তিনি ন্যায়রত্ন হউন বা না হউন, ব্রাহ্মণ, তাহাতে সন্দেহ নাই; তাহার উপর বয়সেও আমাদের সকলের অপেক্ষা প্রাচীন। তাঁহার ধৃষ্টতা ও দম্ভ যতই অমার্জ্জনীয় হউক, তাঁহাকে ও ভাবে লাঞ্ছিত করা অতীব নিষ্ঠুর বর্ব্বরের কার্য্য হইয়াছে।"

তৃতীয় পণ্ডিত অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানম্, চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্' ?—যাহা হইবার তাহা ত হইয়াই গিয়াছে, সে জন্য এখন আর আক্ষেপ করিয়া ফল কি? আর এই রবাহূত দরিদ্র ভিক্ষুককে ন্যায়রত্ন মনে করিয়া আপনারা যে এত হা হুতাশ করিতেছেন, তা তিনিই যে হরিরামপুরের তারানাথ ন্যায়রত্ন, ইহার প্রমাণ কি?"

প্রথমোক্ত প্রাচীন পণ্ডিতটি ধীরভাবে বলিলেন, "আমরা তাঁহাকে কেহই দেখি নাই, তাঁহার নাম শুনিয়াছি মাত্র; কিন্তু পণ্ডিত মধুসূদন তর্কবাগীশের শিষ্য পার্ব্বতী ভট্টাচার্য্য বলিতেছিল, ঐ বৃদ্ধটিই হরিরামপুরের তারানাথ ন্যায়রত্ন!"

পণ্ডিত মধুসূদন তর্কবাগীশ অদূরে উপবিষ্ট ছিলেন। এক জন পণ্ডিত বলিলেন, "আপনার সেই ছাত্রটিকে একবার ডাকুন ত তর্কবগীশ মহাশয়! সে কি বলে শোনা যাক্।"

তর্কবাগীশের আহ্বানে পার্ব্বতী ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, উক্ত পণ্ডিত তাহাকে বলিলেন, "যে প্রাচীন ব্রাহ্মণটি সভামধ্যে আমাদের অপদস্থ করিয়াছিলেন, তুমি না কি বলিয়াছ—তিনি হরিরামপুরের বিখ্যাত নৈয়ায়িক তারানাথ

ন্যায়রত্ন! তিনিই যে তারানাথ ন্যায়রত্ন, ইহা তুমি কিরূপে জানিলে?"

পার্ব্বতী উভয় সঙ্কটে পড়িল! ন্যায়রত্ন তাহাকে তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অথচ সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী তাহাকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সত্য কথা প্রকাশের অধিকার তাঁহার নাই, অথচ মিথ্যা কথা বলাও অকর্ত্তব্য। এ অবস্থায় সে কি করিবে—স্থির করিতে না পারিয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। উকীলের উৎকট জেরায়, আদালতে সাক্ষীর কাঠরায় দণ্ডায়মান এ কালের ধর্ম্মভীরু সরলপ্রকৃতি সাক্ষীর অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠে, সেই শ্রাদ্ধসভায় সেকালের অধ্যাপক-শিষ্য ভট্টাচার্য্য-নন্দনের অবস্থাও সেইরূপ সঙ্গীন হইল!

তাহাকে নির্ব্বাক্‌ দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহার অধ্যাপক তর্কবাগীশ মহাশয় কিঞ্চিৎ বিরক্তিভরে বলিলেন, "হঠাৎ কি তোমার বাক্‌রোধ হইল, পার্ব্বতি! তোমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—তাহার উত্তর দিতেছ না কেন? তুমি আমার চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিবার সময় কি আমাকে বল নাই যে, পূর্ব্বে তুমি হরিরামপুরের তারানাথ ন্যায়রত্নের টোলে অধ্যয়ন করিতে, তাঁহার অসুস্থতা নিবন্ধন টোল বন্ধ হওয়ায় আমার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছ?"

পার্ব্বতী কাতরদৃষ্টিতে তাহার অধ্যাপকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সে কথা সত্য; আমি পণ্ডিত তারানাথ

ন্যায়রত্নের টোলের ছাত্র ছিলাম, সুতরাং তাঁহাকে চিনিতাম—এ কথাই বলাই বাহুল্য। ইদানীং বহুদিন তাঁহাকে দেখি নাই; এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখের আকার ও শারীরিক গঠন দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল—ইনিই আমার ভূতপূর্ব্ব গুরু তারানাথ ন্যায়রত্ন; তবে আপনারা যদি বলেন, উহা আমার দৃষ্টির বিভ্রমমাত্র, তাহা হইলে আপনাদের কথার প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কি।"

পার্ব্বতীর কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! এমন অর্ব্বাচীনের মত কথাও ত কখনও শুনি নাই! মানুষের মত কি মানুষ থাকিতে নাই? তারানাথ ন্যায়রত্নের মুখাকৃতির সহিত এই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের মুখাকৃতির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াই তর্কবাগীশের শিষ্য সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে—এই ব্রাহ্মণই তারানাথ ন্যায়রত্ন! পার্ব্বতী আমার শিষ্য হইলে আমি উহাকে 'সিদ্ধান্তবাগীশ' উপাধি প্রদান করিতাম। আর প্রকৃতপক্ষে তারানাথ ন্যায়রত্নের যেরূপ সুনাম, সুযশ ও খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার ন্যায় পদস্থ পণ্ডিত ব্যক্তি যে দীনহীন দরিদ্র ভিক্ষুকের বেশে অনিমন্ত্রিত অবস্থায় এই শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত হইবেন, ইহা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য; ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না।"

পণ্ডিতের এই উক্তি, সভাস্থ সকল পণ্ডিতই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সন্দেহ দূর হইলেও এক জন পণ্ডিত পার্ব্বতীকে বলিলেন, "সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বোধ হয় বাহিরে

কোথাও বসিয়া আছে; তুমি একবার বাহিরে গিয়া তাহার সন্ধান লইয়া এস। আমরা তাহাকে জেরা করিলেই তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিব।”

পার্ব্বতী হরিনাথের বহির্ব্বাটিতে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ন্যায়রত্নের অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তিনি প্রকৃতই তারানাথ ন্যায়রত্ন কি না, এই প্রশ্ন লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যখন বাদানুবাদ চলিতেছিল, সেই অবসরে ন্যায়রত্ন সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

* * * * *

ন্যায়রত্ন যে বিধবা কৈবর্ত্তরমণীর আশ্রয়ে সুমতিকে রাখিয়া প্রভাতে শ্রাদ্ধবাড়ী গিয়াছিলেন, বেলা দ্বিপ্রহরে সেখানে প্রত্যাগমন করিয়া শুনিতে পাইলেন, সুমতি ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে, তখন পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই! ক্রমে তৃতীয় প্রহর অতীত হইল; তিনি উৎকণ্ঠিতচিত্তে সুমতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একে দুই দিন অনাহার, তাহার উপর শ্রাদ্ধবাড়ীতে অসহ্য লাঞ্ছনা; তাঁহার সর্ব্ব শরীর অবসন্ন হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতে না পারিয়া শয়ন করিলেন; শয়নমাত্র তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা দেবীর সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিতে না পাইলে আমাদের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করা যে অনেক সময় অত্যন্ত কঠিন হইত, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া যৎসামান্য তণ্ডুল, দুই একটি বার্ত্তাকু, আলু ও কয়েক খণ্ড তিন্তিড়ী সংগ্রহপূর্ব্বক সুমতি যখন সেই বিধবার কুটীরে প্রত্যাগমন করিল, তখন অপরাহ্ণ সমাগত-প্রায়। নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার এইরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। ভিক্ষা করিয়া ফিরিবার সময় সুমতি পথের ধারে আম কাঁটালের বাগানের মধ্যে একটি পুষ্করিণী দেখিয়াছিল,—পুষ্করিণীর একটি ঘাট ইষ্টকবদ্ধ, পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য বাঁধা ঘাট।

তখন পর্য্যন্ত ন্যায়রত্নের স্নানাহ্নিক হয় নাই। সুমতি কুটীরে আসিয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিল, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি সহ পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত হইল। সেখানে উভয়ে স্নান করিলেন। সুমতি তাড়াতাড়ি আহ্নিক শেষ করিয়া ঘাটের অদূরস্থ একটি আম্রবৃক্ষমূলে তিউড়ী খুঁড়িয়া ভাত রাঁধিতে বসিল। আলু সিদ্ধ, বেগুন পোড়া, তেঁতুল এবং কিঞ্চিৎ লবণ অন্নের পর্য্যাপ্ত উপকরণ, ইহা সে জানিত।

ন্যায়রত্ন অদূরে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। রন্ধন শেষ হইলে, সুমতি হাঁড়ীর সমস্ত ভাত একখানি কদলীপত্রে ঢালিয়া, তাহার পিতাকে পাতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া পুষ্করিণীতে হাত পা ধুইতে গেল। কিন্তু ভাতের দিকে ন্যায়রত্নের দৃষ্টি রহিল না; তিনি মুদিতনেত্রে ধ্যান করিতে লাগিলেন। সেই সুযোগে একটা কুকুর বৃক্ষান্তরাল হইতে নিঃশব্দে সেখানে গিয়া ভাতগুলির সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিল।

সুমতি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কুকুরটা অর্দ্ধেক ভাত খাইয়া

ফেলিয়াছে! সমস্তদিনের পরিশ্রমের এই পরিণাম? সুমতি আর্তনাদ করিয়া বলিল, 'বাবা, এ কি হ'ল! হায়, হায়, আপনি যে দু'দিন অনাহারে আছেন!"—মনের দুঃখে সুমতি কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার পর পুষ্করিণীর ঘাটের রানার উপর অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িল; এবং অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল। তখন তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, আমাদের তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি নাই; এবং একমাত্র অন্তর্যামী ভিন্ন তাহার সেই কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তিও বোধ হয় অন্য কাহারও নাই। কুকুরটা নির্ব্বিঘ্নে ভাতগুলি উদরস্থ করিয়া লাঙ্গুল আন্দোলন করিতে করিতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। ন্যায়রত্ন নির্নিমেষনেত্রে শূন্য দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'ভগবান, এও তোমার পরীক্ষা! তোমার এই অধম সন্তানকে পরীক্ষার অনলে আর কত দগ্ধ করিবে? নিজের জন্য ভাবি না, কিন্তু মেয়েটার কষ্ট যে আর দেখিতে পারি না।"

তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। তখন আর পুনর্ব্বার ভিক্ষায় বাহির হইবার সময় ছিল না; তাহার বা সুমতির সেরূপ প্রবৃত্তি এবং শরীরের অবস্থাও ছিল না। ন্যায়রত্নও হতাশ ভাবে অবসন্নদেহে শয়ন করিলেন। সহস্র চিন্তা তুমুল ঝটিকার ন্যায় তাঁহার হৃদয় সবেগে আলোড়িত করিতে লাগিল। তাঁহার উভয় চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অসহ্য অন্তর্ব্বেদনা তিনি আর হৃদয়ের নিভৃত অন্তরালে লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না!

তিনি আবেগভরে উঠিয়া বসিয়া, নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয়, অনাথের একমাত্র অবলম্বন মা জগদম্বাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, এবং করযোড়ে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, 'মা জগজ্জননি, তোমার শ্রীচরণে নিশ্চয়ই কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। আমার সেই পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক বুঝিয়া, বাসের জন্য আমাকে যে সামান্য কুটীর দিয়াছিলে তাহা হইতে বিতাড়িত করিলে; আমার লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া পিতৃপিতামহের বাস্তুভিটা ও আজন্মের বাসগ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করিলে; আমাকে পথের ভিখারী করিলে; আমাকে অনন্ত দুঃখের সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলে। আমাকে যত দুঃখ দিতে হয়, দাও, মা! তোমার অভয় চরণতলে মাথা রাখিয়া সকল দুঃখ, সকল কষ্ট ধীরভাবে সহ্য করিব। সকলই কাড়িয়া লইয়াছ, কিন্তু তোমার ঐ রাঙ্গা চরণ দু'খানিতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। তুমি যত কষ্ট দিতেছ, সকলই ত আমি সহ্য করিতেছি; কিন্তু মা, আমার অন্ধের যষ্টি-স্বরূপিণী, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, চিরদুঃখিনী সুমতির দুঃখ কষ্ট যে আর সহ্য করিতে পারি না! মা দুর্গতিনাশিনী, এত দুর্গতিতেও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে, তবে দয়াময়ি! দয়া করিয়া ক্ষমা কর; আমার এ দুঃসহ সন্তাপ হরণ কর। একবার করুণনয়নে সুমতির মুখের দিকে চাও; অনন্ত দুঃখের সাগর হইতে তাহাকে উদ্ধার কর মা!'

সুমতির মনেও চিন্তার তুফান বহিতেছিল; আজ এই স্তব্ধ

সন্ধ্যায়, উদার উন্মুক্ত নীলাকাশতলে,বাপীতটে ধরাশয্যায় নিপতিত থাকিয়া শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সকল কথা একে একে তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, নিত্য নূতন দুঃখের, কষ্টের, অপমান ও লাঞ্ছনার সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খল দ্বারা তাহার আশাহীন, শান্তিহীন, তমসাচ্ছন্ন মরুজীবন পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। কোন্ পাপে ভগবান্ তাহার অদৃষ্টে এত দুঃখ কষ্ট লিখিয়াছেন ? জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কি তাহাকে এইরূপই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে ? নিজের কষ্ট সে সহ্য করিতে পারে ; কিন্তু নিরাশ্রয় বৃদ্ধ পিতার দুঃখ কষ্ট যে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে ! সে জীবন দিলেও যদি তাঁহার দুঃখ যন্ত্রণার লাঘব হইত।—সুমতি মুদিতনেত্রে এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিল। অনন্ত চিন্তার কোথাও শেষ নাই বুঝিয়া সে হতাশভাবে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিল ; দেখিল, নৈশাকাশ শুভ্রজ্যোতি নক্ষত্রপুঞ্জে ভরিয়া গিয়াছে। সেই নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সুমতির মনে পড়িল, সে বাল্যকালে তাহার স্নেহময় পিতার ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহার নিকট শুনিয়াছিল, কোন একটি নক্ষত্রলোকে তাহার পুণ্যবতী জননী তাহার ভাই ভগিনীগুলিকে লইয়া বাস করিতেছেন ! সুমতি স্তব্ধভাবে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে অতৃপ্তনেত্রে চাহিয়া রহিল ; সে স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া আবেগভরে উদ্বেলিত স্বরে বলিয়া উঠিল, 'মা গো ! তুমি কোথায় আছ, মা ?' সে স্বরে সে নিজেই চমকাইয়া উঠিল ! যেন তাহার সেই নক্ষত্রলোকবাসিনী জ্যোতির্ম্ময়ী জননী

লক্ষকোটী যোজন-দূরবর্ত্তী এই মর্ত্তলোকবাসিনী চিরদুঃখিনী দুহিতার আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তরদান করিবেন, এমনই সকরুণ, এতই নির্ভরতাপূর্ণ সেই আহ্বান !

সুমতির সেই আহ্বানধ্বনি শুনিয়া ন্যায়রত্নের চিন্তা ভগ্ন হইল। সহসা তাঁহার মনে পড়িল, আজ দুই দিন সুমতির আহার হয় নাই ! সে ক্ষুধায় কিরূপ কাতর হইয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া ন্যায়রত্ন ব্যাকুলভাবে একান্তমনে মা অন্নপূর্ণার করুণা ভিক্ষা করিলেন ; এক মুষ্টি অন্নদানে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। তিনি সেই নিস্তব্ধ বাপীতট প্রতিধ্বনিত করিয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে আবেগকম্পিত-করুণ কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন,—

"রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়াং
অন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং,
নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং সর্ব্বদুঃখহন্ত্রীং।"

—জানি না, ভাগ্যবিড়ম্বিত নিরন্ন বিপন্ন ক্ষুধার্ত্ত বৃদ্ধের এই কাতর প্রার্থনা স্বর্গলোকবাসিনী, সর্ব্বান্তর্য্যামিনী, নিখিল বিশ্বের অন্নদায়িনী, মূর্ত্তিমতীকরুণাস্বরূপিণী, সর্ব্বদুঃখনাশিনী জননী অন্নপূর্ণার চরণ-সরোজে স্থান পাইল কি না ; কিন্তু তখন ভিক্ষা মিলিবার সুদূর সম্ভাবনাও বর্ত্তমান ছিল না !

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। ক্রমে শ্রাদ্ধ-বাড়ীর ক্রিয়া কর্ম্ম, এমন কি, কাঙ্গালী-বিদায় পর্য্যন্ত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল ; কিন্তু

ভগবানের এমনই বিচিত্র বিধান যে, ন্যায়রত্ন যখন একান্তমনে যুক্তকরে মা অন্নপূর্ণার নিকট একমুষ্টি অন্ন ভিক্ষা চাহিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রাদ্ধকর্ত্তা হরিনাথের মন হঠাৎ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল! কাঙ্গালী-বিদায়ের পর হরিনাথ গৃহপ্রাঙ্গণে একখানি কম্বলাসনে উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে করিতে, তাঁহার ক্রিয়া-কর্ম্মের কোন ত্রুটী হইয়াছে কি না, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন; সহসা তাঁহার মনে পড়িল, একটি প্রাচীন ব্রাহ্মণ প্রভাতে তাঁহার গৃহে আসিয়া শ্রাদ্ধসভায় পণ্ডিতদিগের হস্তে অত্যন্ত নিগৃহীত হইয়াছিলেন। প্রহৃত হইয়া তিনি বহির্বাটীতে পড়িয়া আছেন দেখিয়াছিলেন; তাহার পর নানা কার্য্যের ব্যস্ততায় আর তাঁহার সন্ধান লওয়া হয় নাই! মধ্যাহ্নে তাঁহার আহার হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ীর সকলকে ডাকাইয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না; কেবল একটি পরিচারক তাঁহাকে জানাইল,—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি ঠাকুরদের কাছে গলাধাক্কা ও কিল চড় খাইয়া অনেকক্ষণ বাহিরে পড়িয়া ছিলেন; তাহার পর একটু সুস্থ হইয়াই উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন; আর তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখা যায় নাই।

হরিনাথ এই সংবাদে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহে আসিয়া অপমানিত হইয়া অভুক্ত অবস্থায় চলিয়া গিয়াছেন! এই দানসাগর শ্রাদ্ধ, এত আয়োজন, বিপুল অর্থব্যয়—সমস্তই পণ্ড হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা

হইল। আজ এই পাশ্চাত্যসভ্যতাপ্লাবিত দেশে বৈদেশিক আদর্শে হিন্দুসমাজের মতি-গতি রুচি-প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এ কথা অতিরঞ্জিত বলিয়াই অনেকের ধারণা হইতে পারে; কিন্তু আমরা যে সময়ের ঘটনা অবলম্বনে এই অকিঞ্চিৎকর কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি, তখন হিন্দু সমাজের অবস্থা এইরূপই ছিল। অতিথি তখন গৃহস্বামীর নিকট নারায়ণ-জ্ঞানে পূজিত হইতেন;—দাতা দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। হায় সেকাল!

হরিনাথ উৎকণ্ঠিতচিত্তে সেই দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সন্ধানে চারি দিকে লোক প্রেরণ করিলেন; গভীর রজনীতে পাঁচ সাত জন লোক মশাল লইয়া অভুক্ত বৃদ্ধকে খুঁজিতে বাহির হইল। হরিনাথ আদেশ করিলেন,—"তাঁহাকে যেখানে পাও, খুঁজিয়া সযত্নে লইয়া আসিবে। তিনি আসিতে অস্বীকার করিলে তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে আনিতেই হইবে।"

ন্যায়রত্ন যখন তদ্গতচিত্তে মা অন্নপূর্ণার ধ্যান করিতেছিলেন, সেই সময় দুই জন গোয়ালা মশাল-হস্তে পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত হইল; বাঁধা ঘাটের 'রানার' উপর লোক দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা এখানে কারা গো?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "আমরা পথ-চল্‌তি লোক; তোমরা কে?"

আগন্তুকদ্বয়ের এক জন অগ্রসর হইয়া বলিল,—"আমরা মজুমদার-বাড়ী থেকে আসেছি, ঐ—ও পাড়ায় যে বাড়ীতে কর্ত্তার মায়ের ছেরাদ্দ হয়েছে।"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "তা, এখানে কি মতলবে এসেছ ?"

আগন্তুক মশালটা ন্যায়রত্নের সম্মুখে ধরিয়া' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওহো, আপনি ত সেই ঠাকুরই বটো! আপনি সকালে ছেরাদ্দ-বাড়ীতে গিয়েলে না ?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "হাঁ, আমি সেখানে গিয়াছিলাম বটে।"

আগন্তুক বলিল, "ছেরাদ্দের মজ্‌লিসে সেই টিকিওয়ালা ঠাকুরদের সাত্তে আপনার পেল্লাই কেজিয়ে বেদেলো না ?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "না বাপু! আমি তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করি নি, তাঁরাই আমার কথায় রাগ করেছিলেন।"

আগন্তুক বলিল, "হ্যাঁ ঠাকুর, হ্যাঁ; বামুনে আগ এম্‌নি ধারাই! গন্দানী না দিলে তেনাদের ঝাঁজ দেখানো হয় না। তা ঠাকুর, আজ আমার মুনিব-বাড়ী আপনাদের সেবা হয় নি, কত্তা হায় হায় করচেন; আপনাদের চরণ ধর্‌য়া লিয়ে যাত্তি ক'য়ে দিলেন। আপনাকে গরু-খোঁজা কর্‌য়া খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এখানে আস্যে নাগাল পালাম। হেঁই ঠাকুর, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি গা তুল্যা চলেন।"

দুই জন লোককে মশাল লইয়া পুষ্করিণীর দিকে আসিতে দেখিয়া সুমতি উঠিয়া বসিয়াছিল। তাহাদের সহিত তাহার পিতার আলাপ শুনিয়া সে বুঝিল, প্রভাতে শ্রাদ্ধবাড়ীতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। পাছে সে তাঁহার লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হয়, এই ভয়ে ন্যায়রত্ন কন্যার নিকট সে সকল

কথা প্রকাশ করেন নাই। সুমতির আগ্রহে তিনি তাঁহার লাঞ্ছনার বিবরণ সংক্ষেপে তাহার গোচর করিলেন।

পণ্ডিতেরা অকারণ তাঁহার অপমান করিয়াছে শুনিয়া সুমতির হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে পূর্ণ হইল। আবার তিনি সেই বাড়ীতে পদার্পণ করিবেন ? সুমতি তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিল।

হরিনাথের ভৃত্যদ্বয় অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও সুমতি ঠাকুরাণীর মত-পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না। যদিও তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া ন্যায়রত্নের কোমল হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল, এবং শ্রাদ্ধগৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে অপ্যায়িত করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না ; তথাপি কন্যার অমতে তিনি সেখানে যাইতে পারিলেন না। ভৃত্যদ্বয় দুঃখিতচিত্তে প্রস্থান করিল।

কিছুকাল পরে গৃহস্বামী হরিনাথ স্বয়ং ভৃত্যদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হইলেন ; তিনি ন্যায়রত্নকে বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

ন্যায়রত্ন তাড়াতাড়ি উঠিয়া, হাত ধরিয়া তাঁহাকে পাশে বসাইলেন ; দীনতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনি কেন আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন ? আপনি ত কোন দোষের কার্য্য করেন নাই।"

হরিনাথ বলিলেন, "আমার বাড়ীতে পণ্ডিতেরা আজ অকারণ আপনার অপমান করিয়াছেন ; আমি তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারি নাই। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা আমার নিমন্ত্রিত ; তাঁহারা অন্যায় কার্য্য করিলেও তাঁহাদের আচরণের প্রতিবাদ

করা আমার সাধ্যাতীত। এজন্য আমি আপনার নিকট গুরুতর অপরাধী ; আমার এ অপরাধ আপনাকে মার্জ্জনা করিতেই হইবে।"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "আমার কর্ম্মদোষেই আমি অপমানিত হইয়াছি, সে জন্য আপনি অপরাধী হইতে পারেন না। আপনার গৃহে আমার নিমন্ত্রণ হয় নাই ; অনিমন্ত্রিত অবস্থায় একে ত আমার সেখানে যাওয়াই উচিত হয় নাই ; তাহার উপর আমার অনধিকারচর্চ্চা বড়ই দোষাবহ হইয়াছে। নিমন্ত্রিত পণ্ডিতেরা সভারূঢ় হইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন। তাঁহাদের বিচারে ভ্রম ছিল স্বীকার করি,—কিন্তু তাঁহারা আমাকে ত তাঁহাদের ভ্রমসংশোধনের জন্য আহ্বান করেন নাই ; তবে আমি কোন্ অধিকারে তাঁহাদের ভ্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক সভাস্থলে তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিলাম ? কার্য্যটি আমার পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে ; তাই ভগবান্ আমার ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল দিয়াছেন, পণ্ডিতেরা কেবল উপলক্ষ মাত্র !"

হরিনাথ বলিলেন, "আমার ধারণা হইয়াছে, ছদ্মবেশে আপনি কোন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ; এরূপ শাস্ত্রজ্ঞান, এরূপ সূক্ষ্ম বিচার, এ প্রকার আত্মানুশীলন—কোন সাধারণ ব্রাহ্মণে সম্ভবে না—আপনার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।"

এ কথা শুনিয়া ন্যায়রত্ন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আমাকে ঐ অনুরোধটি করিবেন না ; আমার নিজের সম্বন্ধে আপনাকে আমি কোন কথাই বলিতে পারিব না।" আমি যা

কমলার প্রসাদবঞ্চিত হতভাগ্য দরিদ্র ব্রাহ্মণমাত্র,—আমার পরিচয় সম্বন্ধে আপনি ইহার অধিক কোন কথা জানিবার জন্য উৎসুক হইবেন না।”

হরিনাথ বলিলেন, “সে যাহাই হউক, আপনি ব্রাহ্মণ, আমার অপেক্ষা অধিক প্রাচীন; আমার পূজনীয় ব্যক্তি। আপনি অভুক্ত অবস্থায় আমার বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে আমার অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইয়াছে। আমার গৃহে আপনি পুনর্ব্বার পদধূলি না দিলে—কিঞ্চিৎ আহার না করিলে, আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না; আমার সকল কার্য্যই পণ্ড হইয়া যাইবে।”

সুমতি অন্য ‘রাণায়’ বসিয়া ছিল; ন্যায়রত্ন তাহার নিকট উঠিয়া গিয়া নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিলেন। হরিনাথ তাঁহাদের যে দুই চারিটি অস্ফুট কথা শুনিতে পাইলেন, তাহাতেই বুঝিলেন, মেয়েটি এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরই কন্যা, এবং উভয়েই সমস্ত দিন অনাহারে আছেন।

পিতা ও কন্যা উভয়েরই সারা দিন আহার হয় নাই শুনিয়া, হরিনাথের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল; তিনি তখন উভয়কেই তাঁহার গৃহে লইয়া যাইবার জন্য যৎপরোনাস্তি আকিঞ্চন প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাদিগকে জানাইলেন, তাঁহারা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিলে, তিনিও জলগ্রহণ করিবেন না। সকলের আহার শেষ না হওয়ায় হরিনাথ তখন পর্য্যন্ত জলবিন্দুও পান করেন নাই।

এই কথা শুনিয়া ন্যায়রত্ন বা সুমতি আর তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। ন্যায়রত্ন সুমতিকে লইয়া হরিনাথের সহিত তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। হরিনাথ পরম-সমাদরে অতিথিসৎকার করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন, এবং বুঝিলেন এতক্ষণে তাঁহার ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। তিনি তাঁহাদের বাসের জন্য একটি ঘর খুলিয়া দিলেন; সেই ঘরে তাঁহারা রাত্রিযাপন করিলেন। ন্যায়রত্ন ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন,—"মা অন্নপূর্ণা, এ তোমারই লীলা! ক্ষুধিত সন্তান কাতরপ্রাণে মা বলিয়া ডাকিলে তুমি কি স্থির থাকিতে পার?"

হায় মা! তোমার অনন্ত করুণায় নির্ভর করিয়া কয়জন তোমাকে ডাকার মত ডাকিতে পারে?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিনাথ মজুমদারের গৃহে রাত্রিযাপন করিয়া অতি প্রত্যুষে সুমতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। ন্যায়রত্ন তখনও নিদ্রিত ছিলেন; সুমতি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বলিল,—"বাবা রোদ উঠ্‌লে তোমার পথ-চল্‌তে বড় কষ্ট হবে। চল, সকালে সকালে হাঁট্‌তে আরম্ভ করি; তা হলে' রোদ না পাক্‌তেই অনেক দূর যেতে পারবো।"

ন্যায়রত্ন তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং ভগবানের নাম লইয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই কন্যাসহ হরিনাথের গৃহ ত্যাগ করিলেন। তখনও পথে জনমানবের সমাগম হয় নাই। বিহঙ্গেরা শিশিরসিক্ত তরু-পল্লবের অন্তরালে বসিয়া প্রভাতী-সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে মাত্র; এবং গ্রাম্য দেবমন্দিরে মঙ্গল-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি নীরব হইলেও তাহার শেষ স্বর সুমন্দ প্রভাত-বায়ুহিল্লোলে ভাসিয়া আসিয়া ন্যায়রত্নের হৃদয়ে শান্তি ও প্রসন্নতার সঞ্চার করিতেছিল। দূরস্থ মুসলমান-পল্লীতে ভক্ত মুসলমানেরা সমস্বরে ঈশ্বরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কি বলিয়া তাহারা প্রার্থনা করিতেছিল, ন্যায়রত্ন তাহা বুঝিতে না পারিলেও বহুদূরাগত সেই গভীর নির্ভরতাপূর্ণ প্লুত স্বরলহরী শ্রবণ করিয়া তিনি অনুভব করিলেন, তাহা ভক্ত হৃদয়েরই আকুল উচ্ছ্বাস—নিখিল বিশ্বের প্রণম্য ও শরণ্য অখিলব্রহ্মাণ্ডপতির চরণোদ্দেশে প্রেরিত হইতেছে।

অল্পকাল পরে তাঁহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া প্রান্তরে প্রবেশ করিলেন। ন্যায়রত্ন সেই মধুর উষায় মুক্ত প্রকৃতির নেত্রতৃপ্তিকর মনোহর শোভা দেখিয়া মুগ্ধহৃদয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ কি বিপুল রহস্যে হৃদয় পূর্ণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে, এবং উষার বিচিত্র বর্ণচ্ছটা প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার বিরাটদেহ উদ্ভাসিত করিতেছে। সম্মুখে দিগন্তব্যাপী শস্যশীর্ষ শোভিত হরিৎ প্রান্তর কমলার শ্যামাঞ্চলের ন্যায় প্রসারিত রহিয়াছে। দিগন্তসীমায় আকাশের

প্রান্তর আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ। ক্রমে পূর্ব্বাকাশ লোহিতালোকে উদ্ভাসিত করিয়া সূর্য্যদেব যেন ভূগর্ভ হইতে অনন্ত-মহিমায় সমুদিত হইলেন। তাঁহার রক্তাভ রশ্মিজাল শ্যামল শস্যশীর্ষ-সঞ্চিত শুভ্র শিশির-বিন্দুতে প্রতিফলিত হইয়া অনুপম শোভা বিকাশ করিতে লাগিল।

ন্যায়রত্ন প্রান্তরবক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে দেব দিবাকরের সেই তেজোমহিমামণ্ডিত মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে বিহ্বলপ্রায় হইলেন, বিপুল পুলকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইল। যিনি এই সুবিশাল জগন্মণ্ডলের জীবনস্বরূপ, যাঁহার আলোকে চরাচর উদ্ভাসিত, যাঁহার উত্তাপে সমগ্র বিশ্ব সঞ্জীবিত, যাঁহার আকর্ষণে অনন্ত সৌরজগৎ নিয়ন্ত্রিত, যিনি সপ্তবর্ণের আদিকারণ বলিয়া সপ্তাশ্ববাহিত রথে সমাসীন-রূপে কল্পিত, নভোমণ্ডল যাঁহার প্রভায় কখন নীলিম, কখন পীতাভ, যাঁহার প্রসাদে এই সুবিশাল বসুন্ধরা অনন্তকোটী জীবের অধ্যুষিত, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে তিনি জড়পিণ্ড হইলেও সৃষ্টির আদিকারণ সূর্য্যদেবের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় ন্যায়রত্নের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল; তিনি তাঁহার নিষ্প্রভ নেত্রের ক্ষীণ দৃষ্টি পূর্ব্বগগনে প্রসারিত করিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—

"রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরং দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।”

অনন্তর যুক্তকরে প্রণাম করিয়া সুমতি সহ তাঁহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন!

তাঁহারা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক জন পথিক বিপরীত দিক হইতে আসিয়া গ্রামান্তরে যাইতেছে। ন্যায়রত্ন কোথায় যাইবেন, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। তিনি সেই পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, সেই স্থান হইতে দশ ক্রোশের মধ্যে কোন ভদ্রপল্লী নাই! পূর্ব্বদিকে পাঁচ ক্রোশ দূরে রামদেবপুর নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে বটে, কিন্তু সেখানে কোন ব্রাহ্মণের বাস নাই; কোন ভদ্রলোকও সে গ্রামে বাস করে না।

পথিক তাহার গন্তব্য পথে প্রস্থান করিলে, সুমতি বলিল,—“চল বাবা, আমরা ঐ রামদেবপুরেই যাই। লোকটির কাছে শুনা গেল, সেখানে কোন ভদ্রলোক নেই! নেই বা থাকুল ভদ্রলোক; ভদ্রলোকের—ব্রাহ্মণের ব্যবহার ত কা’ল সেই ভটচাজ্জি ঠাকুরের কাছেই পাওয়া গিয়েছে। শ্রাদ্ধ-সভাতেও ভদ্রতার নমুনা দেখে এসেছ! ভদ্রলোকের চেয়ে চাষাই ভাল, বাবা!”

ন্যায়রত্ন কন্যার কথায় কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া অন্যমনস্কভাবে চলিতে লাগিলেন।

এই কয়েকদিন ক্রমাগত পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া

ন্যায়রত্ন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। নিদারুণ অবসাদে তাঁহার শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল! অন্য লোক এক প্রহরে যে পথ চলিত, সেই পথ চলিতে তাঁহার দুই প্রহরেরও অধিক সময় অতিবাহিত হইতেছিল। সুমতি মনে করিয়াছিল, মধ্যাহ্ন কাল সমাগত না হইতেই যদি তাহারা রামদেবপুরে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে যেরূপেই হউক, যৎকিঞ্চিৎ চাউলাদি সংগ্রহ করিয়া কোথাও তাহা রন্ধন করিবে, এবং তদ্দ্বারা পিতার ক্ষুন্নিবারণ করিয়া, তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য, স্থির করিবে; কিন্তু দেড় প্রহর বেলা অতীত হইল, সূর্য্যদেব প্রায় মাথার উপর আসিলেন, তাঁহার প্রচণ্ড কিরণ অগ্নিশিখাবৎ অসহ্য হইয়া উঠিল, তখনও তাঁহাদিগকে ছায়াহীন জলাশয়বর্জ্জিত তপনতাপপ্রতপ্ত বিশাল প্রান্তর ভেদ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইল! পথ আর ফুরায় না। সুমতি কাতরদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া দেখিল—সেই বিশাল প্রান্তরের শেষ নাই, তাল-খর্জ্জুর-কুঞ্জ ভিন্ন সম্মুখে গ্রামের কোন চিহ্ন নাই। তাহার মনে হইল, এ পথ তাহার চিরদুঃখময় জীবনপথের ন্যায় অনন্ত, অসীম!

ন্যায়রত্নের মস্তকে ছত্র ছিল না; মুণ্ডিতমস্তক উত্তরীয় দ্বারা আবৃত: মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড আতপতাপ তাহাতে নিবারিত হয় না। ঘর্ম্মধারায় তাঁহার জীর্ণ দেহ প্লাবিত হইল। একে নিদারুণ পথশ্রম, তাহার উপর মধ্যাহ্ন কালের প্রখর রৌদ্র। ন্যায়রত্ন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন; তথাপি পাছে সুমতি তাঁহার কাতরতায় বিব্রত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি সমস্ত

কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়া কম্পিতপদে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন; কিন্তু বিধাতা যখন বিমুখ হন, তখন বিপদের উপর নূতন বিপদ আসিয়া আক্রমণ করে! ন্যায়রত্নেরও তাহাই হইল। নিয়মিত সময়ে আহারের অভাব, দেহের নির্য্যাতন, সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম, বিশ্রামের ব্যাঘাত প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহার সুপ্ত শূল বেদনা বহুদিন পরে এই অসীম প্রান্তরপথে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল! যতক্ষণ তাঁহার সাধ্য হইল, তিনি সেই যন্ত্রণা সহ্য করিলেন; তাহার পর আর তাঁহার চলিবার শক্তি রহিল না। সেই মাঠের মধ্যে নিকটে বা দূরে এমন কোন শাখাবহুল বৃক্ষ ছিল না, যাহার শীতল ছায়ায় বসিয়া তিনি একটু বিশ্রাম করেন; মধ্যে মধ্যে দুই একটি তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষ ছিল; ন্যায়রত্ন আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া একটি সুদীর্ঘ তালবৃক্ষের পত্রচ্ছায়ায় অবসন্নভাবে শয়ন করিলেন, এবং সেই দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তিলাভের জন্য মনে মনে মা জগদম্বার করুণা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি অধিক, কেবল তাঁহারাই তাহা নীরবে সহ্য করেন। সুমতি পিতার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল; সে অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে পিতার শিয়রপ্রান্তে বসিয়া স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাঁহার মস্তকটি ক্রোড়ে তুলিয়া লইল; তাহার পর অঞ্চল দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে করিতে কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা খুব কষ্ট হচ্ছে কি?"

ন্যায়রত্ন কোন কথা না বলিয়া নীরবে পড়িয়া রহিলেন। চক্ষু নিমীলিত, অসহ্য যাতনায় তিনি এক একবার মুখ বিকৃত করিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া সুমতির আশঙ্কা ও উদ্বেগ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। সুমতি সাবধানে তাঁহার ললাটের ঘর্ম্ম-ধারা অপসারিত করিয়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল,—"বাবা!"

ন্যায়রত্ন যেন তাহার আহ্বান শুনিতে পান নাই—এই ভাবে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—"সুমতি!"

সুমতির মনে হইল, তাঁহার চেতনা ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে; তাহার কথা তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করে নাই! সুমতি তাঁহার মস্তকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যাকুলস্বরে বলিল,—"কেন বাবা?"

ন্যায়রত্ন শুষ্ককণ্ঠে জড়িতস্বরে বলিলেন,—"বড় তৃষ্ণা, একটু জল দাও মা!"

জল! এই জনহীন নির্জ্জন বিশাল প্রান্তরে পিপাসায় পিতার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে; এখানে সে কি উপায়ে পানীয় সংগ্রহ করিবে?—সুমতির মাথা ঘুরিয়া গেল। সে আকুলদৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিল; মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্র যেন শুষ্কহাস্যে তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল!

সুমতি বসিয়া ছিল। সে পিতার মস্তক ধীরে ধীরে অঞ্চলের উপর নামাইয়া রাখিয়া দণ্ডায়মান হইল, এবং সতৃষ্ণনেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; দেখিল, অসীম প্রান্তর মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে ধূ ধূ করিতেছে,—কোন দিকে জনমানবের সমাগম নাই!

কিন্তু তাহার বোধ হইল, অনেক দূরে কয়েক জন কৃষক ক্ষেত্রে হলচালন করিতেছে। এক জোঁয়ালে বাঁধা একটি সাদা ও একটি কাল বলদ দেখিয়া তাহার এই ধারণা সত্য মনে হইল।

সুমতি বলিল,—"বাবা, একটু স্থির হয়ে থাক, আমি এখনি জল এনে দিচ্ছি।"—সুমতি যথাসাধ্য দ্রুতপদে কৃষকদের দিকে অগ্রসর হইল।

ন্যায়রত্ন বা সুমতি কেহ কখনও এ অঞ্চলে আসেন নাই; সুতরাং এ দিকের পথ ঘাট সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণা ছিল না। তাঁহারা জানিতেন না যে, দূরবর্ত্তী ঐ তাল-খর্জ্জুরকুঞ্জের অন্তরালে ক্ষুদ্র রামদেবপুর গ্রামখানি লুকায়িত রহিয়াছে। সুমতি দূর হইতে যাহাদিগকে হল চালনা করিতে দেখিয়াছিল—তাহারা রামদেবপুরেরই কৃষক, এবং এই সকল কৃষিক্ষেত্র রামদেবপুরেরই এলাকাভুক্ত।

গোপজাতীয় বলরাম ঘোষ রামদেবপুরের এক জন মাতব্বর চাষী গৃহস্থ। সে তাহার দুই পুত্রের সঙ্গে সেখানে জমী চাষ করিতে আসিয়াছিল; এবং তাহারাই পিতাপুত্র তিন জনে হলচালন করিতেছিল।

মধ্যাহ্নকাল সমাগত দেখিয়া বলরামের স্ত্রী রাইমণি ঘোষাণী পতি ও পুত্রদের জন্য পানীয় জল ও কিছু খাবার লইয়া কৃষিক্ষেত্রে আসিতেছিল; তাহার কক্ষে এক কলসী সুশীতল পানীয় জল, কলসীর মুখ একটি বাটী দিয়া ঢাকা,—সেই বাটীতে এক দলা

শুষ্ক ইক্ষু গুড়, এবং হস্তস্থিত একটি পুঁটুলীতে কতকগুলি ছোলা ভিজা।

রাইমণি কৃষিক্ষেত্রের প্রান্তস্থিত ‘আইলে’র উপর একটি বাব্‌লা গাছের ছায়ায় জলের কলসীটি নামাইয়া তাহার কনিষ্ঠ-পুত্র রাধানাথকে ডাকিয়া বলিল, “বাবা আদু, ব্যালা অনেক হ’য়েচে, দোপর গড়ে যায়, একটু জল খেয়ে নে ; পিত্তি পড়ে অসুখ কর্‌বে, ঝট্‌ করে আয় বাবা! কাজ কম্ম নিয়ে আস্‌তে দেরী হয়ে গিয়েচে। আহা, তেষ্টায় বাছার আমার মুখ শুকিয়ে এট্টু হ’য়ে গিয়েচে! আজ ‘ওদ্দুর’ও পড়চে যেন আগুনের ফুল্‌কি!”

রাইমণি সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে পাইল, একটি মেয়ে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে তাঁহাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে! এই নির্জ্জন প্রান্তরে এরূপ দৃশ্য সর্ব্বদা দেখা যায় না, সুতরাং সুমতিকে সেই ভাবে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিয়া রাইমণির বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহার স্বামী ও পুত্রদ্বয়ও লাঙ্গলের মুঠা ধরিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া, ব্যাপার কি জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সুমতি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে শ্বাসরুদ্ধস্বরে বলিল, “বাবা, আমি বামুনদের মেয়ে, আমার বাবা বুড়ো মানুষ ; আমরা অনেক দূর থেকে আস্‌ছি। ক্ষিদে তেষ্টায় বাবার আর চল্‌বার শক্তি নেই! তিনি ঐ তাল-গাছতলায় পড়ে আছেন, জল জল করে কাব্‌রাচ্ছেন ; তা তোমরা

যদি সৎ-সুন্দুর হও, তবে একটু জল দিয়ে আমার বাবার প্রাণ বাঁচাও; নৈলে তোমাদের মাঠে ব্রহ্মহত্যা হয়।"

সুমতির ব্যাকুলতা দেখিয়া ও তাহার কাতর কথা শুনিয়া বলরাম তৎক্ষণাৎ লাঙ্গল ছাড়িয়া দিল, ব্যগ্রভাবে বলিল, 'তুমি ও কি কথা কও ঠাক্‌রুণ! আমরা তিন তিনটে গোয়ালার মরদ থাক্‌তে আমাদের ক্ষ্যাতের পাশে খামোকা বেম্মহত্যে হবে? গোয়ালার হাতের জল দুদের সাতে যে বামুনের প্যাটে না পড়েচেন, সে বামুনই নয়! তবে আর ঠাকুরকে জল খাওয়াতে ভয়ডা কি? চল ত ঠাক্‌রুণ—তোমার বাবা কোন্ গাছতলায় পড়ে জলের জন্যে কাব্‌রাচ্ছে, তেনাকে জল খাইয়ে আসি।—আয় রে আদু, নাঙ্গল ছেড়ে দিয়ে আমার সাতে চল্। বিশে, তুই এখানে থাক্, আমরা ঝট্ করে ঘুরে আস্‌চি।"

রাধানাথ তাহার মাতার নিকট আসিয়া বলিল, "শুন্‌চিস্ তো মা! তেষ্টায় উনার বাপের ছাতি ফেটে যাচ্চে, দে জলের কলসী; আর গুড়ের বাটুটেও দে। ঠাকুরকে তো আগে বাঁচাই, শ্যাষে আমাদের অদেষ্টে যা হয় হবে। চাষার পেরাণে অনেক সয়; ভদ্দর নোক, বামুন, এই ওদ্দূরে তেষ্টায় তেনার ছাতি ফাট্‌বে না ত কি আমাদের ছাতি ফাট্‌বে?"

কলসীর জলে হাত ধুইয়া রাধানাথ গুড়ের বাটী সহ জলের কলসী কাঁধে তুলিয়া লইল।

রাইমণি সহানুভূতিভরে বলিল, "আহা! যা বাবা যা, ঝট্ করে জল নিয়ে যা। বামুন ঠাকুরের পেরাণ রক্ষে হবে, আজ আমার

জল ,আনা সার্থক। আহা মা, 'ওদ্দুরে' তোমারও মুখখান ত শুকিয়ে আমচুর হয়ে গিয়েছে, কদ্দুর থেকে আস্‌চো আপনারা ?"

সুমতি বলিল, "অনেক দূর থেকে আস্‌ছি মা! আমরা বড় দুঃখী।"

সুমতিকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া রাইমণি বলিল, "তা আপনাদের খাওয়া দাওয়া হয় নি বল্‌চো, আমাদের বাড়ী চল না; আমাদের বাড়ীতে তোমাদের পায়ের ধূলো পড়লে আমাদের জন্ম সার্থক হবে!"

সুমতি ব্যগ্রভাবে বলিল, "বাবা যদি বেঁচে থাকেন তবে নিশ্চয় তোমাদের বাড়ী যাব; তোমাদের এ দয়া জন্মে ভুল্‌তে পারব না।"

বলরাম বলিল, "তক্কোর দয়া! বামুনকে যদি তেষ্টার জল না দিলাম, তো এ কাটামোতে করলাম কি? ওরে বিশে! ঝট্ করে কুলে আর পিয়াকা বলদ নাঙ্গল থেকে খুলে গাড়ীখান জুড়ে নিয়ে আয়। ঠাকুরের সেবা হয় নি, বুঝ্‌লি—বড্ডা ওদ্দুর, ঠাকুর এ ওদ্দুরে হেঁটে যেতে পারবে না। খোবাণ, তুমিও এসো, ঠাকরুণকে গুছিয়ে নিয়ে এসো!"

সদয়হৃদয়া গোপপত্নী স্বামী ও কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত সুমতির অনুসরণ করিল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ লাঙ্গল হইতে বলদ খুলিয়া গাড়ী জুড়িতে চলিল।

যথাসম্ভব দ্রুত চলিয়া তাহারা নির্দ্দিষ্ট তালবৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, ন্যায়রত্ন তখন সংজ্ঞাহীন! সুমতি তাড়াতাড়ি

তাঁহার মাথার নিকট বসিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল, "বাবা, জল এনেছি, জল খাও।"

ন্যায়রত্ন কোন উত্তর দিলেন না; তখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে, উভয় চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছে।

পিতার কোন সাড়া না পাইয়া সুমতি কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, "হায়, হায়, কি হ'লো! তেপান্তর মাঠের মধ্যে অঘোরে বাবার প্রাণ গেল?"

বলরাম বলিল, "আমরা থাকৃতে থামোকা ঠাকুর 'মিত্যু' হবেন? দেও ত ঘোষাণ, ঠাকুরের মাথায় ঘটীখানেক জল ঢেলে। বড্ড গরম কি না ঠাকুরের ভিরমি নেগেচে।"

রাইমনি বলিল, "মিন্‌সের য্যামোন আক্কেল! শুধু জল ঢাল্‌লেই কি গেয়ান হবে? মাঠাকৃরুণ, তুমি খুব করে উনার মাতায় আঁচলের 'বাসাত' কর, আমি উনার চোকে মুখে মাতায় জলের ঝাপ্‌টা দিই। ভয় কি মা, কেঁদ না! আমরা যখন এসে পড়েচি—তখন উনাকে সুস্থ না করে কি ছাড়বো?"

সুমতি অতি সাবধানে পিতার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া অঞ্চল দ্বারা বীজন করিতে লাগিল; রাইমণি তাঁহার মস্তকে ও চোকে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল।

এই ভাবে কিছুকাল শুশ্রূষার পর ন্যায়রত্নের সংজ্ঞা হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। সুমতি তখন গুড়ের বাটীর গুড় রাইমণির হাতে

দিয়া বাটীটা ধুইয়া ফেলিয়া তাহার পিতাকে অল্প অল্প করিয়া জল পান করাইল। রাইমণি কোমলস্বরে বলিল, "বাসি মুখে শুধু জল কি খেতে আছে বাবা! একটু গুড় মুখে দাও।" কিন্তু তিনি প্রাণের দায়ে জলপানে বাধ্য হইলেও পূজা আহ্নিক না করিয়া মিষ্টমুখ করিতে সম্মত হইলেন না।

ন্যায়রত্ন জলপানে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া রাইমণি ও তাহার স্বামীপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; বলিলেন, "আজ তোমরা এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করেছ, ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন।"

বলরাম ও তাহার স্ত্রীপুত্র ন্যায়রত্নের চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল; তাহার পর বলিল, "ঠাকুর, আশীব্বেদ কর, যেন আমাদের চাষ আবাদ বজায় থাকে, আর পেরাণ ভ'রে আপনার মতন বামুনের সেবা করে জম্ম সাথক কর্‌তে পারি।"

ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ গাড়ী লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। বলরাম তাহাকে বলিল, "গাড়ী থুয়ে এদিকে আয় রে বিশে! ঠাকুরের পায়ের ধুলো নে!"—তাহার পর সে করজোড়ে ন্যায়রত্নকে বলিল, "ঠাকুর, আপনার হুকুম পেলে তোমাদের আমার বাড়ীতে নিয়ে যাই। আমরা গোয়ালা, তোমাদের সেবার কোন বাধা হবেন না। তোমাদের কেষ্ট ঠাকুর আমাদের এই গোয়ালের ঘরেই 'পিরতিপালন' হয়েলো। আহা, আজ তোমাদের সেবা হন নি; খিদে তেষ্টায় আর এই

'ওদ্দুরে' উনারি মুখও শুকিয়ে আম্‌চুর হয়েচে! আমাদের যা সয়, আপনাগোর ভদ্দোর নোকের কি তা সয়?"

ন্যায়রত্ন ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমার যে আর চলবার শক্তি নেই, বাবা!"

বলরাম বলিল, "আপনি হেঁটে যাবা ক্যানে ঠাকুর? হেঁটে যাবা ত বিশে গাড়ী আন্‌লো ক্যানে? আপনি এই গাড়ীতে মজা কর‍্যা শুয়ে যাবা।"

ন্যায়রত্ন সুমতির মুখের দিকে চাহিলেন। সুমতি সেই বিপদ্‌কালে ইহা ভগবানেরই অনুগ্রহ মনে করিল। এত দয়া সে ত কোনও ভদ্রলোকের নিকটে কোন দিন লাভ করে নাই! তাঁহাদের সম্মতিক্রমে ঘোষেরা পিতা পুত্রে ন্যায়রত্নের হাত ধরিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিল। রাধানাথের মায়ের অনুরোধে সুমতিও গাড়ীর এক পাশে উঠিয়া বসিলে বিশ্বনাথ গাড়ী হাঁকাইতে লাগিল। বলরাম গাড়ীর পাশে-পাশে চলিল।

রাধানাথ লাঙ্গল গরু লইয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য মাঠের দিকে গেল; সেদিনের মত তাহাদের চাষ বন্ধ রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

রামদেবপুর ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। গ্রামের অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই কৃষক; কৃষিকর্ম্মই তাহাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। চাষ ভিন্ন তাহারা আর কোনও কর্ম্ম জানেও না, বোঝেও না। তাহারা প্রত্যহ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রথমেই তাহাদের বলদগুলিকে সযত্নে খাইতে দেয়; তাহার পর একটু বেলা হইলে, পূর্ব্বদিনের বাসি পান্তা যাহা ঘরে থাকে, তাহাই তেঁতুল ও লবণের সাহায্যে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করিয়া, পায়ে পানাই ও মাথায় 'মাথাল' আঁটিয়া, বলদগুলির সহিত মিষ্ট আলাপ করিতে করিতে তাহাদিগকে লইয়া গ্রামপ্রান্ত-বর্ত্তী ক্ষেতের দিকে অগ্রসর হয়। তাহাদের স্কন্ধে লাঙ্গল, এক হাতে খড়ের বুঁদি, অগ্নিসংযোগে তাহা ধূমায়মান; অন্য হস্তে গেঁটে কল্‌কে-শোভিত একটি থেলো হুঁকা। এই সর্ব্বসন্তাপহারী হুঁকাটিই তাহার কঠোর পরিশ্রমের একমাত্র অবলম্বন; এই জন্য দা-কাটা গৃহজাত তামাক ও বুঁদীর আগুন তাহার কার্য্যক্ষেত্রের অপরিহার্য্য সঙ্গী। ইহাই বাঙ্গালার কৃষকের প্রকৃত চিত্র। এই অশিক্ষিত উচ্চাভিলাষহীন দরিদ্র কৃষকেরাই সমাজের মেরুদণ্ড; কিন্তু দুইশতাব্দী পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থা যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপই আছে!

এই সকল কৃষকের স্ত্রীলোকেরা মোটা খাইয়া মোটা পরিয়া

প্রসন্ন মনে দিবারাত্রি যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করে, তাহারা যত অল্পে সন্তুষ্ট, পৃথিবীর কোনও দেশে তাহার তুলনা মিলে কি না, জানি না। রাত্রি এক প্রহর থাকিতে তাহারা শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ধান ভানে, চিঁড়া কোটে, মুড়ি ভাজে। রাত্রিশেষে ঢেঁকির শব্দে সমগ্র পল্লী প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে! তাহার পর উষালোকে পূর্ব্বাকাশ সুরঞ্জিত হইলে তাহারা বাহিরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; গোয়াল পরিষ্কার করে; কেহ কেহ তাহাদের কুটীরের প্রাচীরের পশ্চাতে গোবরের 'চাপড়ী' দেয়; কারণ, কৃষকপত্নীরা তাহা শুকাইয়া ইন্ধনস্বরূপ ব্যবহার করে। কেহ গৃহের সঙ্কীর্ণ আঁঙ্গিনাখানিতে ছড়া ঝাঁট দেয়, মা-লক্ষ্মীর মন্দিরতুল্য পবিত্র গোলাগুলির সম্মুখভাগ গোময়াম্বুলিপ্ত করে, ঘর নিকায়; তাহার পর তুষের আগুনে ধান সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের পরিধানে জোলার তাঁতে নির্ম্মিত মোটা কাপড়। আমরা যে সময়ে কথা বলিতেছি, সে সময় ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতীরা বস্ত্র দ্বারা তাহাদের লজ্জা নিবারণ করিত না। চরকার সূতায় জোলারা কাপড় বুনিত, সেই সকল কাপড় পুরাতন হইলেও ছিঁড়িতে জানিত না, এবং কোনও দিন ধোবার বাড়ী পাঠাইবার আবশ্যক হইত না; কৃষকরমণীরা মলিন বস্ত্রগুলি ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া কোনও জলাশয়ে কাচিয়া আনিত। যে সকল কৃষকের অবস্থা একটু সচ্ছল, তাহাদের কন্যারা কাঁসা পিতলের দুই এক-খানি অলঙ্কার পরিত; কাহার ভাগ্যে রূপার পৈঁছা বা মর্দ্দানা জুটিলে সে আপনাকে মহাভাগ্যবতী মনে করিত! ইহাতে

তাহারা যে সুখ ও আনন্দ পাইত, লক্ষপতির প্রাসাদে বিলাসের অসংখ্য উপকরণের মধ্যেও তাহা নাই।

সংসারের সকল কাজ শেষ হইলে কৃষকরমণীগণ গ্রামপ্রান্ত-বাহিনী নদী বা বিলের ঘাটে উপস্থিত হয়; সেখানে গ্রামস্থ অধিকাংশ গৃহস্থবধূর সমাগম হওয়ায় তাহারা সকলে মিলিয়া তাহাদের সংসারিক সুখ দুঃখের আলোচনা করে; মুখে গল্প চলে বটে, কিন্তু সেখানে হাতেরও বিশ্রাম নাই! কেহ ক্ষারে সিদ্ধ কাপড় কাঠের পিঁড়ির উপর আছ্ড়াইয়া কাচিতে থাকে, কেহ বালি দিয়া বাসন মাজে, কেহ কাহারও মাথা ঘষিয়া দেয়; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গল্প চলে,—স্বামীর কথা, ছেলেমেয়ের কথা, রন্ধনের কথা—সে সকল আলোচনার সহিত বহির্জগতের কোনও সম্বন্ধ নাই; তাহাদের ক্ষুদ্র পল্লী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের সঙ্কীর্ণ সীমায় তাহাদের গল্পের সমস্ত উপাদান নিহিত। এই ক্ষুদ্র পল্লী তাহাদের নিকট সমগ্র পৃথিবী! কোনও ভিন্ন গ্রামে কাহারও পুত্র কন্যার বিবাহ হইলে তাহারা সেই গ্রাম সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা জানে মাত্র; কিন্তু সেই সকল গ্রামও তাহাদের বাসপল্লী হইতে দুই চারি ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত।

স্নানান্তে কৃষকরমণীরা জলপূর্ণ কলসী বামকক্ষে লইয়া অন্য হাত দুলাইতে দুলাইতে সারি বাঁধিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। তাহাদের মধ্যে অবরোধপ্রথার তেমন আদর নাই; যুবতীরা অপরিচিত বা নিঃসম্পর্কীয় লোকের সম্মুখে যাইতে কুণ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু বর্ষীয়সী কৃষকপত্নীরা মধ্যাহ্নে স্বামী পুত্রের জন্য তাহাদের কৃষি-

ক্ষেত্রে জলখাবার লইয়া যায়; এবং তাহাদের স্বামী পুত্রেরা মাঠের কাজ শেষ করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তাহাদিগকে পরিতোষ-সহকারে আহার করায়; অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরিবেশনান্তে কাছে বসিয়া তাহাদের ভোজন লক্ষ্য করে। মোটা চাউলের লাল ভাত তাহাদের খাদ্য, ভাতের উপকরণও যৎসামান্য; কিন্তু আহার করিতে করিতে যদি তাহারা কোনও তরকারীর প্রসংশা করে—তাহা হইলে এই সকল কৃষকরমণীর মনে আর আনন্দ ধরে না! এই জন্যই বোধ হয় কোনও কৃষকপরিবারের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া এক জন দিগ্বিজয়ী সম্রাট বলিয়াছিলেন, 'যদি পৃথিবীতে কোথাও সুখ ও সন্তোষ থাকে, তবে এইখানেই আছে।'

গৃহস্থালীর কাজ শেষ হইলে অপরাহ্নেও এই সকল কৃষকরমণী আলস্যে সময় কাটায় না; তাহারা কেহ কাঁথা শেলাই করে, কেহ জাঁতায় গম পেষে, চাকিতে অরহর, বা ছোলা ভাঙ্গিয়া ডাল প্রস্তুত করে, কেহ চরকার কাছে বসিয়া 'ঘেনর ঘেনর' শব্দে সুতা কাটিতে আরম্ভ করে। উদয়াস্ত সমস্ত দিনের মধ্যে তাহাদের বিরাম বিশ্রাম নাই; আলস্য বা ও ঔদাস্য কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। কাজ লইয়াই তাহারা সুখী, কাজের অভাবই তাহাদের অসুখের কারণ। রোগ হইলে যতক্ষণ তাহারা অভিভূত হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না; এবং যখন একেবারে 'নাতান' হইয়া পড়ে, তখন রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা, তাহারা যে

খাটিতে পারিতেছে না, এই কষ্টই তাহাদের অধিকতর মর্মান্তিক হয়।—সংসারের সেবাই তাহাদের জীবনের ব্রত।

এই সকল দরিদ্র কৃষকের বাড়ী ঘরগুলিই বা কেমন পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন! ঘরের মেঝে হইতে গৃহপ্রাঙ্গন পর্য্যন্ত ঝর-ঝর করিতেছে। প্রায় সকল গৃহস্থের বাড়ীতেই তাহাদের অবস্থানুযায়ী ধান ও অন্যান্য শস্যপূর্ণ দুই চারিটি গোলা আছে। গোলায় খড়ের চাল, বাঁশের বাখারি ও চাটাইনির্ম্মিত এই সকল গোলার অভ্যন্তরভাগ গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা অনুলিপ্ত। গোলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারে সিন্দূর ও চন্দনের ফোঁটা শোভা পাইতেছে। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের অদূরে শাক শব্‌জীর এক একটি বেড়। তাহার ভিতর দুই চারি ঝাড় কলাগাছ আছে। যখনকার যে শাক, তাহা বেড়ের একাংশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে; আঙ্গিনার একপাশে পাতকুয়া, প্রত্যহ অপরাহ্নে তাহা হইতে জল তুলিয়া শাকের ক্ষেতে ঢালিয়া দেয়; বেড়ার কোথাও দুই চারিটী বেগুনের গাছ আছে; কোথাও এক সারি 'আকাশ-মরিচে'র গাছ, সবুজ পাতার ভিতর হইতে পাকা মরিচগুলি হিঙ্গুলের মত বর্ণ বিকাশ করিতেছে। কোথাও একটি বাঁশের মাচায় লাউ গাছ উঠিয়াছে; ছোট বড় লাউগুলি মাচার নীচে ঝুলিতেছে, সাদা সাদা ফুলে গাছ ভরিয়া গিয়াছে। ঘরের কোণে কঞ্চিতে ভর করিয়া পুঁই গাছ ঘরের চালে উঠিয়াছে। তাহার লতায় পাতায় ঘরের চাল ঢাকিয়া গিয়াছে। কাহারও ঘরের কাণাচে এক ঝাড় বাঁশ। বায়ু-প্রবাহে বাঁশ-

গুলি আন্দোলিত হইয়া 'সর সর শব্দ করিতেছে। আঙ্গিনার এক পাশে গাঁদা, সন্ধ্যামণি, বা অতসীর ফুল ফুটিয়া চারি দিক আলো করিয়া রাখিয়াছে।

গ্রামে বাজার নাই। সপ্তাহে এক দিন মাত্র জমীদারের কাছারীবাড়ীর সম্মুখে সামান্য একটা হাট বসে। গ্রামে স্থায়ী বাজার না থাকিলেও গ্রামবাসিরা বিশেষ কোনও অসুবিধা বা অভাব বুঝিতে পারে না। প্রায় সকলেরই ক্ষেতে ধান হয়। মুগ, কলাই সকল ক্ষেত্রে উৎপন্ন না হইলেও, অরহর, ছোলা, মশুর, শর্ষপ, মশিনা, প্রভৃতি ডাল ও তৈলের 'খন্দ' এবং গোধুম ও যব সকলেই অল্পাধিকপরিমাণে উৎপন্ন করে; সুতরাং ডাল ও তৈলের জন্য তাহাদিগকে মুদীর দ্বারস্থ হইতে হয় না। বাড়ীর 'বেড়ে' সময়োপযোগী শাক শব্‌জী উৎপন্ন হয়। ক্ষেতে যে কাপাসের তুলা উৎপন্ন হয়, কৃষকরমণীরা তাহা চরকায় কাটিয়া সুতা প্রস্তুত করে, এবং সেই সুতা জোলাদের দিয়া পরিধেয় বস্ত্র ও গামছা প্রস্তুত করাইয়া লয়; পারিশ্রমিক অর্থের বিনিময়ে তাহারা কৃষকদের নিকট ধান ও অন্যান্য শস্য গ্রহণ করে। এইরূপে সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্তই তাহাদের ক্ষেতে উৎপন্ন হয়। হাট হইতে লবণ সংগ্রহ করিয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত। মৎস্যকে তাহারা অন্নের অপরিহার্য্য উপকরণ মনে করে না। যে দিন গ্রামান্তর হইতে জেলেনীরা নিকটবর্ত্তী নদী বা বিলের চিংড়ী, পুঁটি, ময়া (মৌরুলা) বা ট্যাংরা মাছ বিক্রয় করিতে আসে, সে দিন কৃষকরমণীরা আধ পালি ধান

বা ছোলার বিনিময়ে তাহাই ক্রয় করে, এবং সেই বিশেষ দিনটিতে তাহাদের স্বামী পুত্রের ভোজন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল মনে করে। সকলের গৃহেই দুই একটী দুগ্ধবতী গাভী আছে; তাহার দুগ্ধে ছেলেদের, এমন কি, ছেলের বাপেদেরও 'ধাউত রক্ষা' হয়। এই সকল কারণে সে কালে যখন পল্লীরমণীগণ গৃহকার্য্যের অবসানে 'পিঁড়ে'য় বসিয়া নিশ্চিন্তমনে চরকা কাটিত, তখন কি সুগভীর সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ হইয়া চরকার একঘেয়ে শব্দের সহিত সুর মিলাইয়া তাহারা ছড়া কাটিত,—

'চরকা আমার সোয়ামী পুত, চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে আমার দুয়োরে বাঁধা হাতী!'

'দুয়োরে হাতী বাঁধা' বিপুল ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন; রাজা বা বড় বড় জমীদার ভিন্ন সাধারণ লোকের দরজায় হাতী বাঁধা থাকে না। কিন্তু যাহাদের মন অনাবশ্যক অভাবের ভারে প্রপীড়িত নহে, স্ব স্ব অবস্থায় যাহারা সন্তুষ্ট, তাহাদের সেই সন্তোষ ও শান্তি দুয়ারে হাতী-বাঁধা অনেক লক্ষপতিরও বিস্তর তপস্যার ফল বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে!

ক্রয় বিক্রয়ের প্রণালীর কথা শুনিয়াই আমাদের এ কালের সহরবাসী পল্লীচরিত্রানভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিয়াছেন, গৃহস্থদের কাহারও কোনও দ্রব্য ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে মূল্যস্বরূপ ধান্য বা অন্য কোন শস্য প্রদান করা হয়। আবার অনেকে পরস্পরকে ধান্যের পরিবর্ত্তে কলাই বা গোধুম দিয়া, কেহ কেহ গোধুম বা ছোলার পরিবর্ত্তে শর্ষপ, মসিনা বা তুলা দিয়া স্ব স্ব

অভাব পূর্ণ করে ; সুতরাং কোন কৃষকের ক্ষেত্রে তাহার আবশ্যকানুযায়ী শস্য উৎপন্ন না হইলেও তাহার অভাবে তাহাকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কেবল ইহাই নহে, ছুতার লাঙ্গল বা কামার লাঙ্গলের ফাল, বিদে, কোঁদালি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া নগদ মূল্যের পরিবর্ত্তে মজুরীস্বরূপ ধান ও অন্যান্য শস্য পাইয়া থাকে ; প্রত্যেক লাঙ্গলের জন্য বা লাঙ্গলের ফালের জন্য কি পরিমাণ শস্য দিতে হইবে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট আছে ! অনেক কৃষক কামার বা ছুতারকে দিয়া কাজ করাইয়া লইয়া তখনই তাহার প্রাপ্য পরিশোধ করে না ; কামার কুমারেরা সংবৎসর ধরিয়া তাহাদের কাজ করিয়া দেয়, নূতন শস্য উৎপন্ন হইলে তাহারা বস্তা বোঝাই করিয়া তাহাদের বার্ষিক প্রাপ্য লইয়া যায়। টাকা পয়সার মুখ তাহারা কদাচিৎ দেখিতে পায়। একটী মোহর আমাদের পক্ষে যেরূপ আদরের সামগ্রী—একটী টাকাও তাহাদের নিকট সেইরূপ ! এমন কি, মজুরেরা ফসল কাটিয়া বা বেড় বাতাড় বাঁধিয়া নগদ পয়সায় মজুরী পায় না, তাহারা 'ধানে খন্দে' তাহাদের মজুরী আদায় করে ; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মজুরেরও তেমন দরকার হয় না, দুই চারি ঘর চাষা এক যোগে পর্য্যায়ক্রমে পরস্পরের সাহায্যেই যে বিপদ সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করে, এরূপ নহে, এই উপায়ে তাহারা সংসারিক সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন করিয়া থাকে। এই প্রকার 'অদল বদলে' কাজ চালাইবার নিয়ম ও পদ্ধতি প্রচলিত থাকায় গ্রামস্থ সকল লোক পরস্পরের সহিত সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ

হইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। সকলেরই হৃদয় যেন এক-সূত্রে বাঁধা! যে উন্মার্গগামী হতভাগ্য গ্রামবাসী কর্ম্মদোষে সেই একতাসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, সে গ্রামস্থ অন্য সকলের সহানুভূতি ও সহায়তায় বঞ্চিত হইয়া নিঃসঙ্গ বনবাসের ক্লেশ অনুভব করে, এবং উপায়ন্তর না দেখিয়া অবশেষে বিদ্রোহী ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রামবাসীদের শরণাপন্ন হয়; কিন্তু সে বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহাকে যথাসাধ্য ভোজের আয়োজন করিতে হয়! গ্রামস্থ যে সকল লোকের সহিত তাহার কোনও না কোনও আত্মীয়ের একটু সম্বন্ধ আছে, তাহারা স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলিয়া এই ভোজ উপলক্ষে তাহার গৃহে উপস্থিত হয়; এমন কি, সেই সময় তাহাদের কাহারও গৃহে ভিন্ন গ্রামের কোনও কুটুম্ব উপস্থিত থাকিলে সে-ও 'কুতি'র গৃহে পরম সমাদরে আহূত হয়, এবং সকলে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া তাহার কার্য্যোদ্ধার করে; মনে হয়, তাহার গৃহে প্রীতির বারোয়ারি উৎসব আরম্ভ হইয়াছে!

গ্রামে বিদ্যাচর্চ্চা নাই। কৃষিবিদ্যা ভিন্ন কেবল দুই প্রকার বিদ্যাকে তাহারা আমোল দেয়। একটী বিদ্যা কাষ্ঠশিল্পসম্বন্ধীয়,—যাহার সাহায্যে লাঙ্গল, ঢেঁকি, গরুর গাড়ীর চাকা ও 'ধুরো' প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; অন্য বিদ্যা লৌহশিল্পসম্বন্ধীয়,—যাহা লাঙ্গলের ফাল, কোদালী, নিড়ানী, কাস্তে, দা প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য অপরিহার্য্য। তাহারা জানে, এইদুই বিদ্যা না থাকিলে কৃষি-কার্য্য অচল হয়। অন্যান্য বিদ্যার আলোচনা তাহারা আদৌ

আবশ্যক মনে করে না। কারণ, রামদেবপুরের গোমস্তা হীরু মণ্ডলের মত দুই হাতে ঘুষ লওয়া ভিন্ন 'বিদ্যেন' হইয়া অন্য কোনও লাভ আছে—ইহা তাহাদের ধারণা করিবারও শক্তি নাই! আধুনিক ভদ্রসমাজে যাঁহারা শিক্ষিতাভিমানী, তাঁহাদেরই বা সে শক্তি কোথায়? আমরাও কি অর্থোপার্জ্জনকেই বিদ্যা-শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি না? এই জন্যই ত এখন বি এ পাশের মূল্য কুলিগিরির মজুরী অপেক্ষা কমিয়াছে দেখিয়া হাহাকার রবে আমরা দিঙমণ্ডল পূর্ণ করিতেছি!

কিন্তু বিদ্যা যখন আমাদের অহঙ্কারের জয়ঢাক ও বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উপাধির বোঝা মাত্র না হইয়া কন্যাদায়গ্রস্ত হতভাগ্যের চক্ষুজল মুছাইতে পারিবে, স্বদেশের কল্যাণ ও উন্নতিসাধনে নিয়োজিত হইবে, তখনই তাহা সার্থক হইবে। ভগবৎ কৃপায় নূতন যুগে যদি সে সময় আসে!

কিন্তু এ সকল চিন্তা গ্রাম্য চাষাদের মাথায় কেন, তাহাদের বিস্ময়োৎপাদক, বিদ্যার জাহাজ হীরু মণ্ডলের মস্তিষ্কেও উদিত হইবার আশঙ্কা নাই! সুতরাং চাষারা নিশ্চিন্তমনে চাষ করে, অন্য লোকে পৈতৃক পেশা অনুসারে নিজের কাজ করে। ছেলেরা গরু চরায়, বাঁশী বাজায়, এবং মেঠো সুরে—

'সুমুষ্ট ফল খাও রে কৃষ্ট, আমি—এনেছি—ই—ই'

বলিয়া মাঠ কাঁপাইয়া গান করে; হাতের 'পাচন'কে 'এড়ো' করিয়া মাঠের আমবাগানে আম পাড়ে, তেঁতুল পাড়ে, পাকা কৎবেল পাড়িয়া ভাঙ্গিয়া খায়; তবে ব্রজের রাখালের মত

গোপনারীর কলসী ভাঙ্গিতে শেখে না। হেঁড়েডুডু, দাণ্ডাগুলি প্রভৃতি খেলায় পরমানন্দে তাহাদের মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হয়। রৌদ্রে তাহারা অবসন্ন হয় না, শীতেও কাতর হয় না। মুক্ত প্রান্তরের নির্ম্মল বায়ু তাহাদের দেহে নবজীবনের হিল্লোল বহিয়া আনে। এই সকল বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া লাঙ্গল ধরিতে শিখিলেই তাহাদের পিতা মাতা মনে করে, 'ছেলে লায়েক হয়েছে!' ভদ্রলোকের ছেলেরা বি. এ. পাশ করিয়াও পিতার গলগ্রহ হইয়া থাকিতে লজ্জা বোধ করিতেছে না, কিন্তু চাষাদের বার তের বছরের ছেলে তাহাদের কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায়। কৃষকযুবকেরা কঠোর পরিশ্রমের পর অপরাহ্নে স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া তামাক খায় ও গল্প আরম্ভ করে। আমাদের দুই তিন জন হাকিম একত্র হইলেই যেমন 'সার্ব্বিসে'র কথা, উপরালা জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা, ভবিষ্যৎ আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথার আলোচনা হয়, দুই উকীলে দেখা হইলে যেমন ব্যবসায়গত সুখ দুঃখের কথা চলে, সেইরূপ এই সকল কৃষকযুবকেরা একত্র সমবেত হইলেই তাহাদের জমীর ও চাষের কথার আলোচনা চলে। কাহার কোন্ জমীখানি ভাল, কাহার কোন বলদে কেমন লাঙ্গল টানে, বা গাড়ী বহে, কাহার ক্ষেতে কত ধান হইয়াছে, এবার কাহার কাহার 'খন্দ' ভাল হইয়াছে,—এই সকল আলোচনাতেই তাহাদের মধুর সন্ধ্যা অতিবাহিত হয়। তাহারা শীতকালে অগ্নিকুণ্ড করিয়া বহ্নি সেবন করে, আবার খেজুর-রস পাড়িয়া ঠিলি ধরিয়া চুমুক দেওয়াও চলে। গ্রীষ্মকালেও তাহাদের আড্ডা মন্দ জমে না। বিশেষ

কোনও পর্ব্বদিনে (যেমন অম্বুবাচীতে) লাঙ্গল বন্ধ থাকিলে, তাহারা ঢাক বাজাইয়া মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, ও সন্ধ্যার পর নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হয়। (যুদ্ধকালে রণ-দামামা ও যুদ্ধজয়ের পর সংকীর্ত্তন সভ্যসমাজেও দেখিতে পাইতেছি !) কেহ চাক পলু লইয়া, কেহ বা ছিপ্ লইয়া নদীতে বা খাল বিলে মাছ ধরিতে যায়। সামান্য চ্যাং, শোল, ফলুই, বাইন মাছ পাইলেই তাহারা আনন্দে অধীর হইয়া উঠে ! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৎস্য তাহাদের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য, আমাদের ভদ্রসমাজের পোলাওয়ের ন্যায় মহা সৌখীন খাদ্য !—এইরূপ নানা কর্ম্মে রত থাকায় গ্রামস্থ কৃষক-যুবকেরা পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করিবার অবসর পায় না।

গ্রামের ও গ্রামের কৃষকগণের জীবনযাত্রার এই বিবরণ শুনিয়া কেহ কেহ মাথা নাড়িয়া বলিবেন, 'বৃদ্ধ গ্রন্থকার আফিংএর ঝোঁকে স্বপ্ন দেখিতেছে ! এ রকম গ্রাম একালেও আছে,—ইহা তামা তুলসী গঙ্গাজল হাতে লইয়া বলিলেও বিশ্বাস করি না !' আমরা বর্ত্তমান কালের কথা বলিতেছি না ; এখন কৃষকের ও কৃষক-পল্লীর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, আমাদের দুর্ব্বল লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে পারে না। সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ এই সকল কৃষকের ও তাহাদের পল্লীর প্রতি যাঁহাদের গভীর ঔদাসীন্য, তাঁহারা প্রতিষ্ঠাবান স্বদেশহিতৈষী হইতে পারেন, কিন্তু স্বদেশহিতের প্রথম সোপান—সমাজের মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা-সাধন, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, সেই সময়

রামদেবপুরের অবস্থা এইরূপই ছিল। এখন ইহা স্বপ্নের বিষয় হইলেও রামদেবপুরের কৃষকগণ তখন এইরূপ সুখেই ছিল। বলরাম ঘোষ এই গ্রামের মণ্ডল। তাহার আটখানি লাঙ্গল ছিল, এবং সে দশ 'খাদা' অর্থাৎ, দেড় শত বিঘারও অধিক পরিমাণ জমী আবাদ করিত। বাড়ীতে আট নয়খানি ঘর, কুড়ি পঁচিশটা বড় বড় গোলা; ধান ও নানা প্রকার শস্যে গোলাগুলি পরিপূর্ণ। গোয়ালে গরু মহিষ ধরিত না! ঘরে প্রতি দিন এক মণ দুধ হইত। তদ্বারা দধি, ক্ষীর, ছানা, মাখম, ঘৃত প্রস্তুত হইত। দেখিলে মনে হইত, মা লক্ষ্মী সশরীরে তাহার গৃহে বিরাজ করিতেছেন। একাল হইলে ভাবিতাম, লোকটা কি মূর্খ! এত যার ঐশ্বর্য্য, সে দুপুরের রৌদ্রে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া মাঠে লাঙ্গল বহে! আবার মাঠের মধ্যে কোথায় কোন্ ব্রাহ্মণ পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া মরিতেছে শুনিয়া সপরিবারে গাড়ী লইয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে যায়! ক্ষ্যাপা না কি?

সেই মূর্খ বলরাম সে দিনের মত চাষ বন্ধ করিয়া ন্যায়রত্ন ও সুমতিকে গাড়ীতে তুলিয়া বাড়ী লইয়া আসিল। সে দিন তাহার কি আনন্দ! তাহার পক্ষে সে কি সুপ্রভাত, যে দিন ব্রাহ্মণের পদরজে তাহার গৃহ পবিত্র হইল, তাহার জীবন সার্থক হইল! সে ন্যায়রত্নকে সযত্নে গাড়ী হইতে নামাইয়া পরম ভক্তিভরে তাঁহার পা দু'খানি ধুইয়া দিল; পাদোদক পান করিয়া মাথায় হাত মুছিল। তৃপ্তিতে তাহার নেত্রযুগল অর্দ্ধনিমীলিত হইল! ন্যায়রত্নের জন্য একখানি ঘর তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করা হইল।

এই ঘরে তাহার লক্ষ্মীপূজা হইত। সুমতি মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই গৃহে অধিষ্ঠিত হইল।

বলরামের স্ত্রী রাইমণি মাঠ ভাঙ্গিয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া, সুমতির হাত মুখ ধুইবার ব্যবস্থা করিল ; তাহার স্নানের জন্য জল তুলিয়া দিল ; তাহার পর এক ঘড়া জল নিজের মাথায় ঢালিয়া সুমতির রন্ধনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। খাদ্যসামগ্রী সমস্তই তাহার গৃহে ছিল ; রাইমণি তাহার পুত্রবধূ ও কন্যার সাহায্যে অতি অল্প সময়েই সকল আয়োজন শেষ করিল। সুমতি শ্রান্ত দেহেও মনের আনন্দে রন্ধন করিল ; পিতাকে আহার করাইয়া স্বয়ং আহার করিল। পরে বলরামের স্ত্রী তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন মহাপ্রসাদজ্ঞানে পরিবারস্থ সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া চরিতার্থ হইল।—বলরামের মনে হইল, তাহা অমৃত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্ন আহারান্তে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণে বলরাম তাঁহার কাছে গিয়া বসিল, এবং তিনি কোথা হইতে আসিতেছেন, কোথায় যাইবেন, ইত্যাদি সকল কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। সেই দয়ার্দ্রহৃদয় আশ্রয়দাতাকে

তাঁহার বিপদের কথা শুনাইয়া ব্যথিত করিতে ন্যায়রত্নের প্রবৃত্তি হইল না; বিশেষতঃ, ভূস্বামীর নিন্দনীয় ব্যবহারের আলোচনা অবৈধ বলিয়াই তাঁহার ধারণা ছিল। যাহা হউক, সে দিন ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া বলরাম বুঝিতে পারিল, আপাততঃ ঠাকুরের ঘর বাড়ী নাই; তিনি নিরাশ্রয় হইয়া কন্যা সহ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায় যাইবেন—তাহারও স্থিরতা নাই; সুবিধা হইলে তাঁহারা রামদেবপুরেও বাস করিতে পারেন। বলরামের ন্যায় পরোপকারী ভক্তিমান ধার্ম্মিক লোক যে গ্রামের মণ্ডল, সে গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস না থাকিলেও তাহা বাসের অযোগ্য নহে।—বলরাম ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া কোনও মতামত প্রকাশ করিল না; সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। ন্যায়রত্ন তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলেন, সে কি একটা মতলব করিয়া উঠিয়া গেল।

গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই বলরামকে তাহাদের মুরুব্বী বলিয়া মনে করিত; কেহই বলরামের আদেশ বা উপদেশ অগ্রাহ্য করিত না। বলরাম, তাহার দুই পুত্র ও রাখাল কৃষাণদের গ্রামস্থ সকল লোকের বাড়ী বাড়ী পাঠাইয়া সংবাদ দিল, তাহাদের সহিত কোনও গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ আছে; সন্ধ্যার পর তাহার বাড়ীতে বৈঠক বসিবে, সেই বৈঠকে তাহাদের উপস্থিত থাকা আবশ্যক।

সন্ধ্যার পর বলরামের বাড়ীতে প্রকাণ্ড বৈঠক বসিল; গ্রামস্থ যাবতীয় লোক সেই বৈঠকে উপস্থিত হইল। তাহাদের

সহিত বলরামের কি পরামর্শ, হঠাৎ গ্রামে কোনও বিপদের আশঙ্কা ঘটিয়াছে কি না, ইহা বুঝিতে না পারিয়া, তাহাদের আহ্বানের কারণ জানিবার জন্য সকলেই অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিল। বলরাম তাহাদের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া, বৈঠকের এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, 'ভাই সকল, আমি যে আজ কি জন্মে তোমাদের এখানে আস্‌তে বুলেছিলাম, তা শোন। আমার বাপদাদার পুণ্যির জোরে আজ আমার বাড়ীতে এক 'বেরাম্মন' ঠাকুরের পায়ের ধুলো পড়েছেন। এই ঠাকুরটি 'পেরাচীন নোক'। খবর নিয়ে জান্‌তে পেরেছি, তাঁর না আছে ঘড় বাড়ী, না আছে মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই! মেয়ে গলায় ক'রে তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখ, আমাদের এই রামদেবপুর গাঁয়ে একঘরও বেরাম্মনের বাস নেই; হিন্দুর গাঁয়ে বেরাম্মন নেই, এ কি সামান্যি নজ্জার কথা? বেরাম্মনরাই হলো আমাদের 'দেবদা'। আমরা যদি এ-গাঁয়ে এই ঠাকুরটিকে বসাতে পারি, তাতে পুণ্যি আছে! আমরা ত কেউ মৌরুসি পাট্টা নিয়ে সংসারে আসি নি, এক দিন যেতে হবে সম্মাইকে; 'ধম্মডা' আগে দেখ্‌তে হয়, সঙ্গে যদি কিছু যায় ত তাই যাবে। প্যাটে ত আমরা সম্মাই খাই, প্যাটে না খায় কে? যদি কিছু পুণ্যির কাজ করে যেতে পারি, তবেই বেঁচে থাকা 'সাথ্থক'। তাই আমি বলি কি, এই বেরাম্মন ঠাকুর যাতে এ গাঁ থেকে আর কোত্থু না যান—সে রকম চেষ্টা চরিত্তির করলে হয় না? এতে তোমাদের মতটা কি শুনি। এ কাজে তোমরা রাজী আছ কি না বল।'

বৃদ্ধ হলধর ঘোষ দূর সম্পর্কে বলরামের মামা। সে বৈঠকের মধ্যে উঠিয়া বলিল, ‘বলা বাবাজি যে পিস্তাব করেছে—সে বড্ডাই সরেশ পিস্তাব, এ পিস্তাবে যে মাথা নাড়বে—সে সুমুদ্দি হেঁদুই নয়। বেরাম্মন আমাদের দেবদা, এক ঘর দেবদা গাঁয়ে বসাবো, এর বাড়া খোসের কথা আর কি আছে? কি কও তোমরা দশ ঠাকুর?’

দশ ঠাকুর একযোগে বলিল, ‘ঠাউর মশায়কে গেরামে বসাও, আর কিছু না হোক, দায়ে অদায়ে ত একটু ‘চন্নামেত্তো’ (চরণামৃত) পাওয়া যাবে। কথায় বলে, হেঁদুর কাজই হচ্ছে গো-বেরাম্মনের সেবা। তা গরু ত আমাদের অনেক আছে, কেবল বেরাম্মনের সেবাতেই আমরা বঞ্চিৎ ছিলাম, ভগবান যখন ঠাউরকে এথেনে পেটিয়েছে, তখন আর তেনাকে ছাড়া হবে না।’

বৈঠকে সকলেই একবাক্যে বলরামের প্রস্তাবের সমর্থন করিল দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। তখন ব্রাহ্মণকে কোথায় স্থান দেওয়া যায়, এই কথা লইয়া বৈঠকে আলোচনা আরম্ভ হইল। সকলেই দরিদ্র কৃষক, তাহারা সহসা এই জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিল না; তখন বলরাম সর্ব্বসমক্ষে প্রস্তাব করিল, তাহার বাড়ীর অদূরে নদীতীরে তাহার দুই বিঘা লাখরাজ জমী আছে; সেই জমীতে ব্রাহ্মণকে বসাইতে পারিলে, সেই জমী দুই বিঘার যেরূপ সদ্ব্যবহার হইবে, এরূপ আর কিছুতেই হইবে না। এই দুই বিঘা জমী সে ব্রাহ্মণের গৃহনির্ম্মাণের জন্য দান করিল; কিন্তু গৃহনির্ম্মাণের

কি ব্যবস্থা হইবে ? গ্রামস্থ কৃষকেরা পরামর্শ করিয়া সাধ্যানুসারে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে সম্মত হইল। কেহ তাহার ঝাড়ের দশখানি, কেহ কুড়িখানি বাঁশ, কেহ তাহার ক্ষেত্রের পাটের দড়ি, কেহ তাহার এক বিঘা ভুঁয়ের খড় দিতে প্রতিশ্রুত হইল। বৈঠকে তিন জন ঘরামী উপস্থিত ছিল; তাহারা পারিশ্রমিক না লইয়া ঘর বাঁধিয়া ছাইয়া দিতে রাজী হইল। ঘরামীর জোগাড়েরা অতি দরিদ্র, দিন আনে দিন খায়; তাহাদের খাটাইতে হইলে মজুরী দিতে হইবে বুঝিয়া বলরাম বলিল, সে স্বয়ং তাহাদের মজুরী দিবে। সে সোৎসাহে তাহার প্রতিবেশী নটবর ঘোষকে বলিল, 'ভয় কি মিতে ? ঠাকুরের ঘর তুলে দিতে না হয় আমার আধ গোলা ধান বের করতে হবে; বলা কি তাতে ডরায় ? মা লক্ষ্মীর কেবৃপা থাকলে অমন পাঁচ গোলা ধান আমার ক্ষেতের এক কোণা থেকেই উঠবে।'

গ্রামে কামার, কুমার, মজুর প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই ছিল; তাহাদের মধ্যে যাহারা সে দিন বৈঠকে উপস্থিত হইতে পারে নাই, এই সাধু প্রস্তাব শুনিয়া তাহারাও পরে ন্যায়রত্নের গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল।

সেই বৈঠকে ইহাও স্থির হইয়াছিল যে, যত দিন পর্য্যন্ত ঠাকুরের বাড়ী প্রস্তুত হইয়া তাহা বাসোপযোগী না হয়, তত দিন ঠাকুর বলরামের বাড়ীতেই বাস করিবেন। ন্যায়রত্ন একে প্রাচীন ব্রাহ্মণ, তাহার উপর তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহের কোনও অবলম্বন নাই; সকলের চেষ্টায় তাঁহার ঘর বাড়ী হইল, কিন্তু

তাঁহার সংসার চলিবার উপায় কি ? বলরাম প্রস্তাব করিয়াছিল, তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য প্রত্যেক চাষী গৃহস্থকে প্রতি বৎসর এক কাঠা ধান ও অন্যান্য খন্দ কিছু কিছু দিতে হইবে ; ধান ভিন্ন যে যেশস্য উৎপন্ন করে—তাহাই সে কিছু কিছু প্রদান করিয়া তাঁহাদের অভাব দূর করিবে। বলরামের এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া সকলেই তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিল। সেই বৈঠকে ইহাও স্থির হইয়াছিল যে, চাষী ভিন্ন অন্য প্রজাদিগকে তাহাদের বাৎসরিক আয়ের অনুপাতে একটি নির্দ্ধারিত নিয়মে কিছু কিছু পড়তা দিতে হইবে। এ বিষয়ে কেহ আপত্তি করিলে তাহাকে একঘরে হইয়া থাকিতে হইবে,—গ্রামবাসীরা তাহার সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিবে না। একঘরে হইয়া থাকা সশ্রম কারাদণ্ড অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড—তাহা গ্রামস্থ সকলেই জানিত।

পরামর্শ শেষ হইলে যখন বৈঠক ভঙ্গ হইল, তখন এক প্রহর রাত্রি অতীত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন তখন সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া, একখানি কম্বলের আসনে বসিয়া সুমতির সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন ; ভবিষ্যতে তাঁহারা কোথায় যাইবেন,কি করিবেন, এই অকূল সংসার-সমুদ্রে কোথায় কূল পাইবেন, পিতা-পুত্রীতে তাহারই আলোচনা চলিতেছিল। তাঁহারা বাড়ীর ভিতরে ছিলেন, বাহিরের গোলমাল শুনিয়া, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া রাইমণির নিকট জানিতে পারিয়াছিলেন, কি একটা বিষয়ের মীমাংসার জন্য বাহিরে গ্রামের লোকের বৈঠক বসিয়াছে ; কিন্তু অনধিকারচর্চ্চা মনে করিয়া ন্যায়রত্ন সে দিকে

অগ্রসর হন নাই, বৈঠকের কারণ জানিবার জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

বৈঠক ভাঙ্গিলে বলরাম প্রফুল্লচিত্তে ন্যায়রত্নের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'ঠাকুর, আপনার আহ্নিক-টাহ্নিক শেষ হয়েছেন ত? আমি আপনার কাছে এসে খোঁজ খবর নিতে পারি নি, বাইরে আমাদের একটা বৈঠক ছিল।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'হাঁ তা শুনেছি, বৈঠকে বিস্তর লোক এসেছিল না? সব কাজ শেষ হয়েছে?'

বলরাম বলিল, 'হাঁ ঠাকুর, আপনার আশিব্বাদে। আপনাকে ত আমরা ছাড়চি নে। যখন দয়া করে' পায়ের ধূলো দিয়েছেন, তখন এই গেরামেই আপনাকে থাকতে হচ্ছে। আমরা আপনার দাস, আমাদের ছেড়ে আপনি আবার কোথায় পথে পথে ঘুরতে যাবা ঠাকুর? তা হবে না।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আমাকে গ্রামে রাখবে? কোথায় রাখবে? আমি চিরকাল তোমার গলগ্রহ হ'য়ে থাকব, এ কি তুমি আমার কাছে প্রত্যাশা কর?'

বলরাম বলিল, 'তাই যদি হবে, তবে আর আমাদের বৈঠক করা কেন? আপনার বাসের কি বন্দোবস্ত হবে, তাই ঠিক করবার জন্যেই ত এই বৈঠক। তা বৈঠকে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে; এখন আপনি এ গাঁয়ে বাস করতে আজী হলেই হয়। আপনি আজী না হলে আপনার চরণ ধরে আজী করাব।"

ন্যায়রত্ন তখনও সকল কথা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না।

বলরাম বৈঠকের সকল বিবরণ তাঁহার গোচর করিয়া তাঁহার সম্মতির অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

বলরাম তাঁহাকে তাহাদের গ্রামে স্থায়ীভাবে বসাইবার জন্য এই অল্প সময়ের মধ্যে যে এত কাণ্ড করিয়াছে—ইহা শুনিয়া ন্যায়রত্ন ও সুমতির বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই অশিক্ষিত মূর্খ চাষার হৃদয় কত উচ্চ, তাহার নিঃস্বার্থ পরোপকারের প্রবৃত্তি কি প্রবল, তাহার নিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি কি অবিচল—ইহা বুঝিয়া ন্যায়রত্ন ও সুমতির কোমল হৃদয় তাহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইল; তাঁহাদের মনে হইল—পৃথিবীতে এমন আপনার জন তাঁহাদের আর কেহই নাই! বলরামের সহিত কোনও কালে তাঁহার পরিচয় ছিল না, সে ভিন্নগ্রামবাসী, ভিন্ন জাতি; তথাপি সে এই গৃহহীন, নিরুপায়, অকূল পাথারে ভাসমান বৃদ্ধের অন্ধকারময় জীবনপথ আলোকিত করিবার জন্য সম্পূর্ণ অচিন্ত্যনীয় উপায়ে আলোকবর্ত্তিকা-হস্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—ইহা মা জগদম্বারই লীলা। ইহা দয়াময় বিধাতার অভিপ্রায় মনে করিয়া ন্যায়রত্ন অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলরামের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। এই নির্ব্বান্ধব স্থানে কতকগুলি চাষার মধ্যে জীবনের অবশিষ্ট কাল বাস করিতে হইবে ভাবিয়া সুমতি বড় বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ, সে সত্যবালাকে এখনও ভুলিতে পারে নাই; এমন দিন ছিল না—যে দিন সে তাহার সখীর কথা মনে করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ না করিত। সে জানিত, সেই ভাগ্যবতী তালুকদার-নন্দিনীর

সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাই তাহাদের বর্ত্তমান সর্ব্বনাশের মূল কারণ, তাহার নিষ্ঠুর পিতার নিদারুণ অত্যাচার উৎপীড়নেই তাহাদিগকে গৃহহীন হইয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া একবস্ত্রে গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছে; কিন্তু কুচক্রী পিতার কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সত্যবালা কি চেষ্টার ত্রুটী করিয়াছে? এমন কি, তাহার মিথ্যা কলঙ্কমোচনের জন্য, মহা সম্ভ্রান্ত তালুকদারের কন্যা হইয়াও সে কাজি সাহেবের প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত হইতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। এই সকল কথা স্মরণ করিয়া এক এক সময় সত্যবালার জন্য সুমতির বুকের ভিতর আন্‌চান্ করিয়া উঠিত, উদ্বেলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রশমিত করিতে না পারিয়া সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিত; অবশেষে মনকে এই বলিয়া প্রবোদ দিত যে, এ দুঃখ কষ্ট চিরস্থায়ী হইবে না, বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান এক দিন না এক দিন তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন; মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্ততঃ একবারও তাহার প্রিয় সখীর দেখা পাইবে। কিন্তু এই বহুদূরবর্ত্তী পল্লীতে, কতকগুলি কৃষকের মধ্যে যদি জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটিয়া যায়, তাহা হইলে এ জীবনে সত্যবালার সহিত তাহার সাক্ষাতের আশা কোথায়? দুঃখে কষ্টে সুমতির বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু পিতার মুখের দিকে চাহিয়া সে আত্মসংবরণ করিল। তিনি বলরামের আশ্রয়ে বাস করিয়া যদি সুখী হন, তবে তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিবে,— সে এমন মেয়ে নহে। পিতার সুখ শান্তির জন্য সে নিজের

হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া দিতে পারিত। পিতাকে সেই গ্রামে বাস করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া সুমতিও বলরামের প্রস্তাবের সমর্থন করিল। বলরাম হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে সেই রাত্রেই তাহার আত্মীয় প্রতিবেশীদিগকে এই সুসংবাদ জানাইয়া আসিল। নিষ্ঠাবান হিন্দু তাঁহার আরাধ্য দেবতার মূর্ত্তি মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে আনন্দ লাভ করেন, আজ বলরামের ভক্তিপরিপ্লুত হৃদয়ও সেই আনন্দে পরিপূর্ণ।

একটি শুভ দিন দেখিয়া ন্যায়রত্নের বাসগৃহের পত্তন হইল। গ্রামস্থ সকল লোক স্ব স্ব অঙ্গীকার অনুসারে এই নব-গৃহের নির্ম্মাণে সাহায্য করিতে লাগিল। গ্রামের সমস্ত লোক একপ্রাণে যে কার্য্যে যোগদান করে, তাহা সুসম্পন্ন হইতে অধিক বিলম্ব হয় না; অল্প দিনের মধ্যেই নদীতীরে বলরামের লাখরাজ জমীতে ন্যায়রত্নের বাসের ঘর, পাকশালা, গোয়াল প্রভৃতি তিন চারিখানি ঘর এবং দুই তিনটী গোলা প্রস্তুত হইল। ন্যায়রত্ন দেখিলেন, তাঁহার স্বগ্রামে বাস্তভিটায় তাঁহার যে সকল ঘর ছিল, এই সকল ঘর অপেক্ষা ত নিকৃষ্ট নহেই, বরং অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। তাঁহার বাড়ী ছিল ব্রাহ্মণপণ্ডিত অধ্যাপকের বাড়ীর মত; আর এ বাড়ী হইল পল্লীগ্রামের অবস্থাপন্ন চাষী গৃহস্থের বাড়ীর মত! এই বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে পিতৃপিতামহের পবিত্রস্মৃতিমণ্ডিত বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যের লীলা-নিকেতন স্বগ্রামের সেই জীর্ণ বাড়ীখানির কথা তাঁহার মনে পড়িত, আর তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না। নূতন

কি কখন পুরাতনের মায়াকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে ?

কিন্তু আর ফিরিবার উপায় নাই ! ন্যায়রত্ন ভাবিলেন, যদি তিনি কর্ত্তব্যপথ স্থির করিতে না পারিয়া ভ্রমক্রমে বিপথে পদার্পণ করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে এই ভুলকেই প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া, এই জীবন-সন্ধ্যায় আবার নূতন করিয়া দোকান খুলিতে হইবে। তবে তাহাই হউক, ইহাই বোধ হয় বিধিলিপি ! 'যথা নিযুক্তোহস্মি, তথা করোমি'—এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া ন্যায়রত্ন চন্দ্র তারা শুদ্ধ দেখিয়া শুভ দিনে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার গৃহপ্রবেশের দিন গ্রামে যেন মহোৎসব আরম্ভ হইল ! বলরাম সে দিন ক্ষেতের কাজ বন্ধ রাখিয়া গ্রামবাসীদের সহিত গৃহপ্রবেশোৎসবে যোগদান করিল। এমন কি, সরলহৃদয়া কৃষকবধূরাও সেই আনন্দে বঞ্চিত হইল না। ন্যায়রত্নের গৃহদ্বারে কদলীতরু শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপিত হইল, উভয়পার্শ্বে আম্রশাখাসহ পূর্ণ ঘট সংস্থাপিত হইল। অবশেষে গৃহপ্রবেশের সময় এক দল কৃষক-বালক নববস্ত্র পরিধান করিয়া গলায় এক এক ছড়া ফুলের মালা ঝুলাইয়া ন্যায়রত্নকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। কৃষকবধূরা একত্র সমবেত হইয়া শঙ্খধ্বনি দ্বারা মঙ্গল সূচনা করিতে লাগিল ; যেন আজ গ্রামে গ্রাম্যবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইতেছে ! পুরুষেরা করতাল মৃদঙ্গ কাঁশি প্রভৃতি লইয়া মহোৎসাহে 'নগর-সঙ্কীর্ত্তনে' বাহির হইল। আর এক দল বালক 'গাব্‌গুবাগুব্‌' (গোপীযন্ত্র) ও খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে পথে পথে গান গায়িয়া চলিল,—

'আস্তে এক রসিক পাগোল
বাদালে গোল লদ্যার মাঝে দ্যাখ্‌সে তোরা !
পাগলের সঙ্গে যাবো, পাগোল হবো,
হেরবো রসের লব গোরা !'

সমস্ত দিন গ্রামবাসীদের আনন্দোৎসব চলিল। বলরাম ঘোষ পূর্ব্বদিন গ্রামস্থ লোকের নিকট হইতে প্রচুরপরিমাণে চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল; উৎসবান্তে সায়ংকালে তাহা গ্রামস্থ দুঃখী কাঙ্গালীদের বিতরণ করা হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্নের নবগৃহ-প্রবেশের পর ছয় মাস অতীত হইয়াছে। তাঁহার নূতন ঘর-বাড়ী হইয়াছে, নদীতীরবর্ত্তী পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন বাসভবনের অঙ্গনে সংস্থাপিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাগুলি বিবিধ শস্তে—ধানে খন্দে পরিপূর্ণ, গ্রামবাসীরা স্ব-স্ব-ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যরাশি আনন্দের সহিত তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়া তাঁহার সংবৎসরের ভরণপোষণের উপায় করিয়া দিয়াছে! তাঁহার আর কোনও অভাব নাই; কি করিয়া সংসার চলিবে, এ চিন্তায় তাঁহাকে ব্যাকুল হইতে হয় না। গ্রামের সমগ্র প্রজামণ্ডলী স্বেচ্ছায় যাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছে, উদরান্ন-সংগ্রহের জন্য তাঁহার চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা কি?

ন্যায়রত্ন সংসার-চিন্তার ভার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেও, তাঁহার জীবন-সন্ধ্যা মহত্তর চিন্তায় অতিবাহিত হইতে লাগিল। গ্রামের সমস্ত লোককে তিনি তাঁহার স্বকীয় পরিবারভুক্ত মনে করিতেন; তাহাদের কল্যাণচিন্তাই যেন তাঁহার জপ তপ হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষুদ্র রামদেবপুর গ্রামের জনসাধারণের অভিভাবকের স্থান অধিকার করিলেন।

ন্যায়রত্ন প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে এক এক পাড়ায় বেড়াইতে যাইতেন। এক এক দিন এক এক গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া বসিতেন; এবং তাহার কুশলবার্ত্তা, অভাব অভিযোগ প্রভৃতির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি যে দিন যাহার গৃহে পদার্পণ করিতেন, সে দিন সে যেন হাতে স্বর্গ পাইত; যেন তাহার গৃহে ইষ্টদেবতা আসিয়াছেন! গৃহস্থের বালকবালিকাগণ হইতে কুলবধূরা পর্য্যন্ত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিত, এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে, আগ্রহসহকারে তাঁহার মধুর উপদেশ শ্রবণ করিত। ন্যায়রত্ন যদি শুনিতে পাইতেন, কাহারও ঘরে খাদ্যসামগ্রী নাই, বা গরুর অভাবে কাহারও জমীতে চাষ হইতেছে না; কিংবা বীজের অভাবে কেহ জমীতে বীজ বপন করিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া গ্রামের লোকের নিকট 'পড়্তা' করিয়া তাহার অভাব দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। গ্রামের জনসাধারণ তাঁহাকে এতই ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিত যে,

তাঁহার কোনও চেষ্টা প্রায়ই বিফল হইত না। কোনও কারণে গ্রামে কোনও বিবাদ বা দলাদলি বাধিলে, ন্যায়রত্ন পাঁচজনকে সঙ্গে লইয়া সেই বিবাদ বিসংবাদ মিটাইয়া দিতেন। সকলেই তাঁহাকে হিতৈষী সুহৃদ মনে করিত; সুতরাং তাঁহার নিরপেক্ষতায় কেহই সন্দেহ করিত না। ক্ষুদ্র গ্রাম, গ্রামের অধিবাসীদের অধিকাংশই চাষী গৃহস্থ বা সাধারণ শ্রমজীবী। গ্রামে কোনও কবিরাজ ছিল না; কোনও পরিবারে কেহ পীড়িত হইলে গৃহস্বামী 'ঠাকুর রক্ষা কর' বলিয়া ন্যায়রত্নেরই শরণাপন্ন হইত। ন্যায়রত্ন সেই সংবাদ শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না; তিনি রোগীকে দেখিতে যাইতেন, দুই বেলা তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতেন, ঝাড়িয়া দিতেন, 'জলপড়া' খাওয়াইতেন, সাহস ভরসা দিতেন, এবং মিষ্ট বাক্যে তাহাকে আশ্বস্ত করিতেন; পরে গৃহে ফিরিয়া তাহার মঙ্গলকামনায় শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতেন। ন্যায়রত্নের শুভ ইচ্ছায় ও শান্তি-স্বস্ত্যয়নের প্রভাবে অনেক রোগী আরোগ্যলাভ করিত। অনেক প্রকার মুষ্টিযোগ ও গাছ গাছড়ার ঔষধও তাঁহার জানা ছিল; সেই সকল ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াও তিনি অনেক রোগীকে নিরাময় করিয়া তুলিতেন। বস্তুতঃ, কিছু দিনের মধ্যেই গ্রামবাসীরা বুঝিতে পারিল—ন্যায়রত্ন তাহাদের আশ্রিত নহেন, তাহারাই তাঁহার আশ্রিত। তিনি যেন সেই গ্রামের জীবন্ত বাস্তু-দেবতা!

ক্রমে ন্যায়রত্নের অনাবিল নিঃস্বার্থ জনহিতৈষা রামদেবপুর গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে সংক্রামিত হইয়া পড়িল।

সকলেরই যেন তিনি নিতান্ত আপনার জন। তাঁহার সন্তোষবিধানের জন্য তাহাদের কি আগ্রহ! তিনি গ্রামের সর্ব্বসাধারণের 'দাদাঠাকুর'। বালক, যুবক, বৃদ্ধ, সকলেরই তাঁহার প্রতি কি গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস! বৃদ্ধেরা ভক্তিভরে তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করে, যুবকেরা তাঁহার সৎপরামর্শে পরিচালিত হয়; বালকেরা অসঙ্কোচে তাঁহার সহিত খেলা করে। কেহ তাঁহাকে ভয় করে না; অথচ 'দাদাঠাকুর শুনে কি মনে করবেন, হয় ত মনে ব্যথা পাবেন'—ভাবিয়া কেহ কোনও অন্যায় কর্ম্ম করিতে বা কাহারও অপকার করিতে সাহস করে না। কুলবধূরাও তাঁহাকে লজ্জা করে না, তিনিও অসঙ্কোচে তাহাদের সহিত আলাপ করেন; সকলের অন্তঃপুরেই তাঁহার অবারিত গতি। তাঁহার উপর গ্রামস্থ সকলেরই সমান আবদার ও অধিকার।

সারা দিন মাঠের কাজ করিয়া কৃষকেরা অপরাহ্নকালে গৃহে ফিরিয়া আসে, কিন্তু সন্ধ্যার পর আর তাহাদের ঘরে মন বসে না! ন্যায়রত্নের চরিত্র প্রভাবে চুম্বকের লৌহাকর্ষণের ন্যায় তাহাদের মুগ্ধ সরল হৃদয় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সন্ধ্যার পর ন্যায়রত্নের বাড়ীতে 'বৈঠক' বসে। ন্যায়রত্ন তাহাদিগকে সম্মুখে বসাইয়া রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদির গল্প বলেন, গল্পচ্ছলে তাহাদিগকে কত হিতোপদেশ প্রদান করেন; আমোদের সঙ্গে তাহারা শিক্ষালাভ করে। এইরূপে ন্যায়রত্ন ধীরে ধীরে গ্রামবাসীদের মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

এই প্রকার কর্ম্মবৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া ন্যায়রত্নের দিনগুলি বেশ সুখশান্তিতেই অতিবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু সুমতির অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জলের মাছ ডাঙ্গায় তুলিলে তাহার অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হয়, এই গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া সুমতির অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল; অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর হইলেই যে মানুষ সুখী হয়, সুমতির এ ধারণা দূর হইয়াছে। তাহার পিতা গ্রামবাসীদের সহিত মিলিয়া বেশ সুখ শান্তিতে কালযাপন করিতেছেন; তাঁহার অভাব নাই, উদ্বেগ নাই, তাঁহার জন্য সুমতির আর কোন চিন্তাও নাই; তথাপি সুমতির মনে সুখ নাই! তাহার হৃদয় কি অশান্তি ও অতৃপ্তিতে পূর্ণ, তাহা সে বুঝিতে পারে না; কিন্তু সর্ব্বক্ষণ তাহার মনে হয়, কি যেন একটা অভাব শ্মশানচারী প্রেতের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে! যতক্ষণ সে গৃহকার্য্যে রত থাকে, বা বৃদ্ধ পিতার সেবা করে, ততক্ষণ সে ভালই থাকে। গৃহকার্য্যের অবসানে নির্জ্জন কুটীরের এক প্রান্তে যখন সে বিশ্রাম করিতে বসে, তখন শত চিন্তার তরঙ্গাঘাতে তাহার হৃদয় আলোড়িত ও অধীর হইয়া উঠে; তাহার মনে হয়, তাহার হৃদয় বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন নৈশাকাশের ন্যায় অন্ধকারপূর্ণ; এই বিপুল বিশ্বে সে একাকী; নিতান্ত একাকী! তাহার নিজের কোনও কাজ নাই; তাহার প্রাণের কথা বলিবার মানুষ নাই; তাহার অবসর-যাপনের কোনও উপলক্ষও নাই। গ্রামস্থ রমণীগণের সহিত সে অসঙ্কোচে মিশিতে পারে না, তাহাদের কাহারও সহিত

সে চিন্তার আদান-প্রদান করিতে পারে না; যেন বাহিরের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ-ভরা আলোকাম্বরা বসুন্ধরা ও তাহার মধ্যে কি এক দুর্ভেদ্য বিরাট প্রাচীর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! সেই বাধা অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া মুক্তির আনন্দ উপভোগ করা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই সচ্ছলতা ও নিরুদ্বেগ স্বচ্ছন্দতার মধ্যেও কি অভাব ও অপূর্ণতার হাহাকার নিত্য তাহার অশান্ত হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়া শূন্যে বিলীন হইত, তাহা সে বুঝিতে না পারিলেও সর্ব্বদা তাহার মনে হইত, তাহারা পরের ঘরে বাস করিতেছে, পরের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে, পরের অনুগ্রহে জীবনধারণ করিতেছে! কিন্তু পরপ্রত্যাশী হইয়া এ ভাবে তাহারা কত দিন কাটাইবে, গ্রামবাসিগণের দয়ার ঋণ কিরূপে পরিশোধ করিবে? এমন অনির্দ্দিষ্ট অনিশ্চিত ভাবে জীবনযাপনের শেষ ফল কি? এই নির্ব্বাসনের অবসান কোথায়? তাহার পিতার জীবনের সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, ঘোর তামসী-বিভাবরীসমাগমের আর ত অধিক বিলম্ব নাই; অকূল জীবন-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে সে কোথায় গিয়া কূল পাইবে? পিতার অবর্ত্তমানে সে কোথায় কাহার আশ্রয় লাভ করিবে? এই সকল চিন্তায় সে অধীর হইয়া উঠিত; কিন্তু সে কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিত না। পাছে পিতা মনে বেদনা পান, তাহার মানসিক চাঞ্চল্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে সে এ সকল কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিত না;

নিজের দুঃখ, বেদনা, অশান্তি বুকের ভিতর পুরিয়া রাখিত। যাহার বর্তমানে কোনও সুখ নাই, ভবিষ্যতের কোনও আশা নাই, অতীতের স্মৃতিই বুঝি তাহার একমাত্র সম্বল; তাই সুমতি অতীত স্মৃতির সমাধি বক্ষে ধরিয়া, গত-জীবনের বেদনাভরা সুখস্মৃতির আলোচনা করিয়া, সুখহীন, বৈচিত্র্য-বিরহিত, একক জীবনের দুঃসহ দিনগুলি অতি কষ্টে অতিবাহিত করিতে লাগিল। এমন সময় ন্যায়রত্ন এক দিন পীড়িত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন।

সুমতি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি পিতার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া থাকে, তাঁহাকে বাতাস করে, গায়ে হাত বুলায়, তাঁহার পা টিপিয়া দেয়। কোনও দিন তাঁহার জ্বরত্যাগ হইলে সে আশা করে, আজ হয় ত আবার আর জ্বর আসিবে না। সে একমনে ভগবানের নিকট পিতার আরোগ্য কামনা করে; কিন্তু তাহার কামনা পূর্ণ হয় না, জ্বর ছাড়িয়া ন্যায়রত্নের আবার জ্বর আসে। জ্বরের প্রদাহে তিনি সময়ে সময়ে অস্থির হইয়া উঠেন; সুমতি নীরবে অশ্রু ত্যাগ করে, আর দয়াময় হরিকে ডাকে।

এইরূপে এক সপ্তাহ অতীত হইল, জ্বর ত আরোগ্য হইলই না, শেষে জ্বরের উপর জ্বর আসিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কাশি দেখা দিল, এবং বুকে পিঠে এমন বেদনা হইল যে, ন্যায়রত্ন নিঃশ্বাস ফেলিতেও অসহ্য কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন।

সেই দিন পিতার অবস্থা দেখিয়া সুমতির বড় ভয় হইল।

রাত্রেই রোগের বৃদ্ধি।—ন্যায়রত্ন রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন। গভীর রাত্রি, চরাচর সুষুপ্ত; কোনও দিকে জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। নদীতীরে—ন্যায়রত্নের বাসগৃহের অদূরে কয়েকটি ঝাউগাছ ছিল; উদ্দাম নৈশ বায়ুপ্রবাহে তাহাদের শাখা প্রশাখা সঞ্চালিত হইয়া সন্ সন্ শব্দ করিতেছিল, যেন তাহা কোনও অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলের পূর্ব্বাভাস। সহসা নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শৃগালের দল নদীতীরে—নদীর অপর পারে ঐকতানিক সঙ্গীতালাপে যামিনীর তৃতীয় যামের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিল। কিন্তু এই গভীর রাত্রেও সুমতির চক্ষে নিদ্রা নাই, সে নিদ্রাহীননেত্রে অক্লান্তভাবে পিতার পরিচর্য্যা করিতেছে; সাশ্রুনয়নে পিতার যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছে, 'বাবা যদি এ যাত্রা রক্ষা না পান, তবে আমার দশা কি হইবে? আমার আর কে আছে? গ্রামে আত্মীয় স্বজন কেহ নাই, একটি ব্রাহ্মণ নাই, একাকিনী আমি কি করিব? বাবার অভাবে কোথায় গিয়া দাঁড়াইব? একা এখানেই বা কাহার ভরসায় থাকিব, কিরূপেই বা থাকিব?'

পিতা যদি এ যাত্রা রক্ষা না পান—এই কথা মনে হইতেই সুমতি অস্থির হইয়া উঠিল, তাহার বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল, হৃদয় অবসাদে আচ্ছন্ন হইল; পিতাকে পাখা দিয়া বাতাস করিতে করিতে সে যে কতক্ষণ নীরবে কাঁদিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

ঘরের-কোণে তৈলাক্ত দীপগাছার উপর একটা মাটীর প্রদীপ মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল ; তৈলের অভাবে তাহা নির্ব্বাপিত-প্রায় হইয়াছে দেখিয়া সুমতি উঠিয়া গিয়া ভাঁড় হইতে দুই পলা তেল তুলিয়া প্রদীপে ঢালিয়া দিল, দীপশিখা পুনর্ব্বার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুমতি ভাবিল, এরূপ তেল সে কোথায় পাইবে—যাহার সাহায্যে তাহার পিতার নির্ব্বাপিতপ্রায় জীবন-দীপও মুহূর্ত্তে এমনই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে ?

গ্রামে চিকিৎসক নাই ; এক সপ্তাহ ন্যায়রত্ন রোগে ভুগিতেছেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহার চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। গ্রামের লোক রোগে আক্রান্ত হইলে ন্যায়রত্নের মুষ্টিযোগে ও চেষ্টা যত্নে আরোগ্য লাভ করে ; তাঁহার চিকিৎসা কে করিবে ? সুমতির মনে হইল, বিচক্ষণ বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করাইলে তখনও তাঁহার জীবনরক্ষা হইতে পারে। তৈল যেমন দীপরশ্মি উজ্জ্বল করিল, কবিরাজের যথাযোগ্য ঔষধে তাঁহার জীবন-দীপও সেইরূপ উজ্জ্বল হইতে পারে। কিন্তু গ্রামে বৈদ্য নাই, গ্রামান্তর হইতে কে বৈদ্য ডাকিয়া আনিবে ? কিরূপে তাহার পিতার প্রাণরক্ষা হইবে ?

সুমতি দ্বার খুলিতেই শীতল প্রাতঃসমীরণের একটা 'ঝাপ্টা' তাহার চোখে-মুখে লাগিল। সে বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, পূর্ব্ব দিক ফরসা হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাকাশের বহু ঊর্দ্ধে একটি প্রকাণ্ড তারা ঝক্ঝক্ করিতেছে ; নদীতীরবর্ত্তী শাখাবহুল বটবৃক্ষের পল্লবসংলগ্ন নিভৃত নীড়ে বসিয়া একটা

কুল্য' (দেশী ঈগল) দীর্ণ কণ্ঠের দীর্ঘ ধ্বনি দ্বারা নিশাবসানের সম্ভাবনা-বার্ত্তা সুপ্ত চরাচরে বিঘোষিত করিতেছে। সুমতি প্রভাতের প্রতীক্ষায় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া রহিল। রোগ-যন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া রাত্রিশেষে ন্যায়রত্ন তন্দ্রামগ্ন হইয়াছিলেন।

তন্দ্রাঘোরে ন্যায়রত্ন স্বপ্ন দেখিলেন; কিন্তু তাহা দুঃস্বপ্ন নহে, সে স্বপ্ন বড় মধুর, বড় উজ্জ্বল। ন্যায়রত্ন দেখিলেন, তাঁহার ব্রাহ্মণী কল্যাণী কত কাল পরে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি পঞ্চভূতাত্মক দেহ লইয়া আসেন নাই, তাঁহার ছায়াদেহ হইতে কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইয়া সেই কক্ষ আলোকিত করিয়াছে! কি এক স্বর্গীয় সৌরভে সেই কুটীর আমোদিত হইতেছে, যেন তাঁহার সম্মুখে শত পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়াছে! ন্যায়রত্নের বাহেন্দ্রিয় সুপ্ত, কিন্তু তাঁহার অন্তরেন্দ্রিয় প্রস্ফুটিত; তাঁহার কণ্ঠ নীরব, কিন্তু তিনি বাক্যের অতীত স্বরে কল্যাণীকে বলিলেন, 'কল্যাণি, অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, তুমি কেমন আছ?'

জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী কোমলস্বরে বলিলেন, 'বেশ আছি, সুখেই আছি। তুমি বড় কষ্ট পাইতেছ দেখিয়া তোমাকে একটি কথা বলিতে আসিয়াছি। তোমাকে শীঘ্রই তোমার ঐ জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। তুমি প্রস্তুত হও। আমি আর এক দিন আসিব,—সেই দিন তুমি আমার সঙ্গে যাইবে।'

ন্যায়রত্ন আর কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু শরৎসন্ধ্যায়

যেমন করিয়া বৃক্ষচূড়াবলম্বী উজ্জ্বল তপনকিরণ মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয় —সেই ভাবে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী নারীমূর্ত্তি চক্ষুর নিমিষে অদৃশ্য হইল!

ন্যায়রত্ন স্বপ্নঘোরে ডাকিলেন, 'কল্যাণি! কল্যাণি!'—তাঁহার রুদ্ধকণ্ঠ যেন সহসা বাক্‌শক্তি লাভ করিয়া সুপ্ত চেতনার মধ্যেই এই অস্ফুট ধ্বনি উচ্চারণ করিল!

সে স্বর সুমতির কর্ণে প্রবেশ করিল; তাহার পিতা কি নিদ্রা-ভঙ্গে তাহাকে ডাকিয়াছেন? সুমতি ব্যগ্রভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পিতার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল, উজ্জ্বল দীপা-লোকে দেখিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে, ঘর্ম্মধারায় তিনি প্লাবিত হইয়াছেন। সুমতি সাবধানে তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া ডাকিল, 'বাবা! বাবা!'

ন্যায়রত্ন নিরুত্তর; তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত। সুমতি তাঁহার মুখে হাত দিয়া দেখিল, দাঁত লাগিয়াছে। সুমতি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল, কিন্তু সে নির্ব্বোধ বালিকার ন্যায় ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিল না; ক্রমাগত দুঃখ কষ্টের কঠোর আঘাত সহ্য করিয়া তাহার হৃদয় ঘাতসহ হইয়া উঠিয়াছিল। এই তরুণ বয়সে ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে সে অনেক সহ্য করিয়াছে, এখনও কত সহ্য করিতে হইবে, তাহা সে জানিত। সুমতি মন সংযত করিয়া তাঁহার চোখে মুখে জল দিয়া ঘন ঘন পাখার বাতাস করিতে লাগিল। একান্তমনে জগজ্জননীকে ডাকিয়া বলিল, 'মা জগদম্বে, রক্ষা কর।'

এইরূপ শুশ্রূষায় অনেকক্ষণ পরে ন্যায়রত্নের চেতনাসঞ্চার হইল। তখন প্রভাত হইয়াছে।

সুমতি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, কেমন বোধ হচ্ছে?'

ন্যায়রত্ন ক্লান্তস্বরে বলিলেন, 'কে, সুমতি! আমার বোধ হচ্ছিল—' ন্যায়রত্ন কথা শেষ না করিয়াই নীরব হইলেন। তাঁহার মুদিত নয়নের প্রান্তে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল; কিন্তু সুমতি অল্প কাল পূর্ব্বে তাঁহার চোখে মুখে জল দিয়াছিল, বলিয়া তাহা অশ্রুর অস্তিত্ব বুঝিতে পারিল না।

সুমতি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, 'ঘুম আস্ছে' বাবা?'

ন্যায়রত্ন কোনও উত্তর দিলেন না। সুমতি মনে করিল, তাঁহার ঘুম আসিয়াছে; সে আর তাঁহাকে ডাকিল না। বস্তুতঃ ন্যায়রত্ন তখন জাগিয়া ছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক হইতে স্বপ্নের প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই; তিনি সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথাই ভাবিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইল, এ স্বপ্ন অমূলক নহে, ইহা বিধাতার ইঙ্গিত, তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে!

সুমতি নিঃশব্দে বাহিরে গেল, বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে ব্যগ্রভাবে বলরাম ঘোষের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

বলরাম তখন তাহার ঘরের 'পিঁড়া'য় বসিয়া একটা ডাবা হুঁকায় ধূমপান করিতেছিল। তাহার রাখাল কৃষাণেরা বহু পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কেহ গো দোহন করিতেছিল, কেহ গরুকে জাব মাখিয়া দিতেছিল, কেহ বিচিলী চুরাইতেছিল। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের

নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই উঠিয়া কেহ ধান ভানিতেছিল, কেহ চিঁড়া কুটিতেছিল, কেহ বাড়ীর আঙ্গিনায় ছড়া-ঝাঁট দিতেছিল।

তত প্রত্যুষে সুমতিকে ব্যগ্রভাবে আসিতে দেখিয়া বলরাম বিস্মিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে একটু ভয়ও হইল। সে জানিত, 'বাবা ঠাকুর' 'শক্ত কাহিল'। বলরাম তাড়াতাড়ি হাত হইতে হুঁকা নামাইয়া সুমতিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'দিদি ঠাকৃরুণ, রাত পোয়াতে না পোয়াতে উঠে আস্‌লে যে! বাবা-ঠাকুরের 'আবস্তা' ভাল ত?'

সুমতি রুদ্ধমানকণ্ঠে বলিল, 'আর ভাল! বলাই দাদা, কাল রাত্রে বাবা ত ফুরিয়েই গিয়েছিলেন।'

বলরাম দুই চোখ কপালে তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিল, 'আঃ সব্বোনাশ! তুমি বল্‌ছো কি, দিদি ঠাকৃরুণ! কাল সাঁজের ব্যালা তাঁকে দেখ্যা আলাম্। তিনি কইলেন ভালই আছেন, আর এক আত্তিরের মদ্দি তিনি ফুইরিয়ে যাবার মতোন হয়েলেন?'

সুমতি বলিল, 'হাঁ বলাই দাদা, শেষ রাত্রে হঠাৎ তাঁর দাঁত লেগে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন; একে রাত্রিকাল, তার উপর আমি একা স্ত্রীলোক, কি যে করি, কিছুই ভেবে স্থির কর্‌তে পারি নে, বাবার চোখে মুখে জল দিই, পাখা করি, দাঁতি ছাড়িয়ে দিই, তার পর তিনি একটু সুস্থ হয়ে ঘুমুলেন। রাত্রে একবারও চোখের পাতা বুঁজতে পারি নি, সমস্ত রাত্রি ব'সে কাটিয়েছি। ভোর হ'তে না হ'তেই তোমার কাছে আস্‌ছি। কি করবো বলাই দাদা! কোথায় যাব? কি করে বাবা এ যাত্রা

রক্ষা পাবেন? তুমিই আমার বল বুদ্ধি ভরসা, বাবা যাতে রক্ষা পান—তার একটা উপায় কর। আমার যে আর তিন কুলে কেউ নেই, বলাই দাদা!'

সুমতি অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল।

বলরাম সুমতির কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল; সে তাহাকে সান্ত্বনাদানের অভিপ্রায়ে বলিল, 'কেঁদ না দিদি ঠাক্‌রুণ! বাবাঠাকুরের আবস্তা ছাখে যদি তুমি এ্যামোনধারা অসামাল হয়্যা পড়ো, তাহলি তাঁর 'তাওৎ' করবা ক্যামোন্ করো? আমরা তামান্ গাঁ-ভোর নোক বাবাঠাকুরকে বাপ্ দাদার মতোন্ ছিদ্দা ভক্তি করি, আমরা থাকৃতে তোমার ভাবনাডা কি? গাঁ-শুদ্দ্ লোক যার ভাই ভাইপো, তার আবার চিন্তে? তবে কথাডা কি জানো দিদিঠাক্‌রুণ! বাবা ঠাকুরের ঐ ক্যামোন্ এক 'জিজ্', তিনি ওসুদ খাবে না। ওসুদ পত্তোর না খেলে কি ব্যায়রাম সারে? গরু যে গরু, ব্যায়রাম হ'লে তাকেও আমরা 'দেগে' দিই।'

সুমতি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল, 'বলাই দাদা, ওটা তোমার বুঝবার ভুল! বাবা ওসুদ্ খাবেন না, এমন কথা কোন দিনও বলেন নি। তিনি ওসুদ যে খাবেন, তেমন কবরেজ কোথায়? তোমাদের এ অঞ্চলে কি ভাল কবরেজ আছে? তিনি হাতুড়ে বোদ্যির ওসুদ ব্যবহার করিতেই নারাজ, বলেন, হাতুড়ের ঔষধ খাওয়া মহাপাপ। প্রাণ গেলেও তিনি কোন হাতুড়ে বোদ্যির ওসুদ খাবেন না।'

বলরাম চিন্তিত ভাবে বলিল, 'তবেই ত ফ্যারে ফেল্‌লে দিদি ঠাক্‌রুণ! আমাদের এ তল্লাটের মদ্দি হরি নাপ্‌তির মতোন ডাক্‌সাইটে কব্‌রেজ আর এট্টাও নেই। তাকেই ত ডাক্‌তে চেয়েলাম, তা বাবাঠাকুর না কর্‌লেন। ক্রেমেই ত বাড়াবাড়ি হয়ে উঠ্‌ছে, বল ত তাকে ডেকে আনি।'

সুমতি মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না বলাই দাদা! তাকে ডেকে কাজ নাই! বাবা সেই নাপ্তের ওষুদ্ খাবেন না; তাকে ডাকার কথা শুন্‌লেই তিনি হয় ত রেগে উঠ্‌বেন। যে কবরেজের উপর রোগীর শ্রদ্ধা না থাকে, তার ওষুদে কোনও ফল হয় না। আশ-পাশের কোনও গ্রামে কি কোনও ভাল কব্‌রেজ নেই?'

বলরাম ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, আমাদের পাশের গাঁয়েই এক জন বদ্দির বাড়ী। বদ্দির নাম সাম সেন। মস্ত কব্‌রেজ, কেটে জোড়া দিতে পারে, আর তার বিদ্যের 'সোমোর' নেই! পাড়াগেঁয়ে গরীব লোক ত আর এত বড় কব্‌রেজকে পৃতিপালন করতে পারে না, তাই সাম সেন সহরে কব্‌রেজী করে। শুনেছি তিনি পূজোর সময় বাড়ী এসেছে, আজও বাড়ীতেই আছে, বল ত তেনাকেই একবার ডাকি, তবে তেনার খাঁই বড্ড জিয়াদা! বেশী টাকা নৈলে রা কাড়ে না।'

সুমতি বিষণ্ণভাবে বলিল, 'বলাই দাদা, তুমি আমাদের অবস্থা ত সকলই জান! আমাদের নগদ টাকাকড়ি কিছুই নেই, তবে আমরা তাঁর খাঁই কি করে মিটাবো? দাদা, এক দিন তুমিই বাবার প্রাণদান করেছ, এত দিন তুমিই আমাদের

বজায় রেখেছ, আমার বল বুদ্ধি ভরসা সবই তুমি—তুমি যদি দয়া করে এ দুদ্দিনে—'

নিরক্ষর অসভ্য চাষা বলরাম ঘোষ আত্মপ্রশংসা শ্রবণে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'আরে ও কি কথা কও, দিদি ঠাকরুণ! আমি তোমাদের এমন কি 'উগ্‌গোর' (উপকার) করিছি যে, সেই তুচ্ছু কথা তুলে দশ মুখে বল্‌তে নাগ্‌লে? আমাদের বাপ দাদাদের বেস্তর পুণ্যি ছিল, তাই বাবাঠাকুরের নাগাল পেয়েছি; তাঁকে এই চাষার গাঁয়ে বসাতে পেরেছি। তাঁর ধার শোধ্‌ দেওয়া কি আমাগোর মত্তোন্‌ নোকের সাধ্যি? তুমি হুকুম দিলেই কব্‌রেজ মশাইকে নিয়ে আস্‌তে পারি; না হয় বাবাঠাকুরের চিকিচ্ছেয় আমার এক গোলা ধানই যাবে; বদ্যিকে দুদ্‌ খেতে না হয় একটা গাই বাছুর দেব; এর বেশী সে আর কি দাবী করবে?'

সুমতি বলিল, 'তবে দাদা, তুমি কবরেজ মশায়ের খোঁজে শীঘ্র যাও, এই বেলাতেই যাতে তিনি আসেন, তা করা চাই।'

বলরাম উঠিয়া তাহার রাখাল কৃষাণদের ডাকিল। তাহারা তাহার সম্মুখে আসিলে সে প্রত্যেককে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ভার দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, এবং কোমরে একখানি ময়লা চাদর জড়াইয়া তালপাতার ছাতি ও তৈলপক্ক বাঁশের লাঠি লইয়া গ্রামান্তরে যাত্রা করিল।

সুমতি বলরামকে কবিরাজের সন্ধানে পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি

বাড়ী ফিরিয়া আসিল। একে উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি জাগরণ, তাহার উপর এই দুশ্চিন্তা, তাহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তখন কিরূপ শোচনীয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। চিন্তাকুলচিত্তে সে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার পিতার তখনও নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই; সে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত না করিয়া ধীরে ধীরে গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।

সংসারের কাজ শেষ হইলে সুমতি এক জন প্রতিবেশিনীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কবিরাজ শ্যাম সেনের কথা জিজ্ঞাসা করিল; কবিরাজের বাড়ী কোন্ গ্রামে, সেই গ্রাম রামদেবপুর হইতে কত দূর,—ইত্যাদি সংবাদ বলরামকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়াছিল বলিয়াই সুমতি প্রতিবেশিনীকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সেই বর্ষীয়সী গোপকন্যা তাহার কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারিল না। তখন সুমতি বাড়ী ফিরিয়া বৈদ্যের আগমনপ্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া রহিল; কোনও কাজেই তাহার মন বসিল না।

প্রায় মধ্যাহ্নকাল, বলরাম এক পা ধূলা লইয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে কবিরাজ সহ ন্যায়রত্নের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। সুমতি কবিরাজকে দেখিয়াই ঘরের ভিতর গিয়া তাহার পিতাকে বলিল, 'বলাই দাদা তোমার জন্যে কবিরাজ নিয়ে এসেছে; কবিরাজ মহাশয়কে ডেকে আনি?'

ন্যায়রত্নের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, তিনি চক্ষু মুদিয়া স্থিরভাবে পড়িয়া ছিলেন; সুমতির কথা শুনিয়া চক্ষু মেলিয়া তাহার

মুখের দিকে চাহিলেন, ক্ষীণস্বরে বলিলেন, 'কোন্ কবিরাজ মা! সেই নাপ্তে বেটা আমার চিকিৎসা করতে এসেছে না কি?'

সুমতি সেই হাতুড়ে নাপিতের প্রতি তাহার পিতার অশ্রদ্ধার কথা জানিত, সে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, 'নাপিত কেন? সেই নাপিত ছাড়া কি দেশে আর কবিরাজ নেই বাবা? ইনি সহরের খুব বড় কবিরাজ, পাশের কোন্ গ্রামে বাড়ী, নাম শ্যাম সেন।'

সুমতির কথা শেষ না হইতেই বলাই দ্বারপ্রান্ত হইতে ডাকিল, 'দিদি ঠাক্‌রুণ!'

সুমতি বাহিরে আসিয়া কবিরাজ মহাশয়কে গৃহে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিল। কবিরাজ ন্যায়রত্নকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিলেন; তাহার পর গম্ভীর ভাবে তাঁহার হাত ধরিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী দেখিলেন, এবং তাঁহার রোগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা তাঁহাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কবিরাজ প্রৌঢ়বয়স্ক, ধীরপ্রকৃতি এবং সুচিকিৎসক। আয়ুর্ব্বেদে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল; বর্ত্তমান কালের উপাধি-ব্যাধিমণ্ডিত বাক্যবাগীশ ধন্বন্তরীগণের ন্যায় তিনি চরক সুশ্রুতের কতকগুলি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ন্যায়রত্নের নিকট স্বীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান না করিলেও কবিরাজী চিকিৎসা-প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার সহিত এরূপ দুই চারিটি কথার

আলোচনা করিলেন, যাহা শুনিয়া ন্যায়রত্ন সহজেই বুঝিতে পারিলেন, কবিরাজ মহাশয়ের বেশ পড়াশুনা আছে,—যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও আছে। বিশেষতঃ এই কবিরাজটি যাঁহার ছাত্র, তিনি রাঢ় অঞ্চলের এক জন বিখ্যাত কবিরাজ ; ন্যায়রত্ন তাঁহাকে চিনিতেন, এবং ধন্বন্তরী-কল্প কবিরাজ বলিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। এরূপ বিজ্ঞ কবিরাজের উপযুক্ত ছাত্রের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে ন্যায়রত্নের আপত্তি হইল না।

কবিরাজ মহাশয় বলরাম ঘোষের নিকট শুনিয়াছিলেন, তাহাদের 'বাবাঠাকুর' পরম ধার্ম্মিক ও মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ; তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, ন্যায়রত্ন 'গয়লার পুরুত' কি 'গুরু-ঠাকুর', কি সেই শ্রেণীর কোনও ব্রাহ্মণ হইবেন, কিন্তু ন্যায়রত্নের সহিত দুই চারিটি কথার আলোচনা করিয়াই তাঁহার ধারণা হইল, সত্যই তিনি সুপণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ভক্ত সাধক। কবিরাজ মহাশয় তাঁহার উত্তরীয়-প্রান্ত হইতে ঔষধের পুঁটুলি খুলিয়া লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটি বড়ী ও একটি পাচনের ব্যবস্থা দিয়া ন্যায়রত্নের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দর্শনী সম্বন্ধে তিনি ন্যায়রত্ন বা সুমতিকে কোনও কথা বলিলেন না ; বলরাম ঘোষের সহিত তাহার কোনও বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারিলেন না।

সুমতি বলরামকে নিভৃতে ডাকিয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলরাম বলিল, 'সে খোঁজে তোমার দরকারডা কি, দিদি ঠাকরুণ! সে যা করতে হয়, আমি করবো। এখন ওসুদ-পত্তোর খাওয়ানো

যাতে দস্তুর মতোন হয়—তুমি তাই কর। বাবাঠাকুরকে বাঁচানো চাই দিদি!'

সুমতি বলিল, 'মা জগদম্বা যদি মুখ তুলে চান, তবেই বাবা রক্ষা পাবেন, কিন্তু বলাই দাদা, তোমার ঋণ আমরা কখনও শোধ দিতে পারব না।'

'আমাদের দেনা পাওনা এ জন্মে শোধ হবে না দিদি!' বলিয়া বলরাম বহির্দ্বারে কবিরাজের অনুসরণ করিল। সুমতিও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া সজলনেত্রে কাতরভাবে কবিরাজকে বলিল, 'কবিরাজ মশায়! কি রকম বুঝ্‌ছেন? আমার বাবা এ যাত্রা রক্ষা পাবেন ত?'

কবিরাজ গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'দেখ মা, এই সবেমাত্র চিকিৎসা আরম্ভ হ'লো, ফলাফলের কথা এখনই কি করে বল্‌ছি? চিকিৎসাটা আরও পূর্ব্বে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। গোড়ায় আদৌ চিকিৎসা হয় নি! প্রাচীন বয়স, শরীরে কিছু নাই, বড়ই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন; রোগও কিছু কঠিনই হয়েছে। তুমি খুব সাবধানে ওঁর শুশ্রূষা কর, নিয়ম মত ঔষধ পথ্য দাও। চিকিৎসার সময় অতীত হয়েছে, এ কথা বলিনে; তবে চেষ্টামাত্র আমাদের সাধ্য, পরমায়ু দেওয়ার মালিক আমরা ত নই, সুতরাং রক্ষা পাওয়া না পাওয়া—সে ভগবানের হাত।'

সুমতি বুঝিল, তাহার পিতার জীবনরক্ষা সম্বন্ধে কবিরাজেরও সন্দেহ হইয়াছে; তিনি কোনও আশা ভরসা দিতে পারিলেন

না। সুমতি দশ দিক অন্ধকার দেখিল, তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল; সে আড়ষ্ট-দেহে সেই খানেই বসিয়া পড়িল।

সেই সময় এক জন ভিখারী কিঞ্চিৎ ভিক্ষার আশায় বলরাম ঘোষের গৃহদ্বারে আসিয়া গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান করিতেছিল,—

'মা মা ব'লে আর ডাক্‌বো না,
তারা, দিয়েছ, দিতেছ কত যন্ত্রণা!'

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্নের চিকিৎসার জন্য কবিরাজের সহিত বলরামের কি বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা ন্যায়রত্ন বা সুমতি কোনও দিন জানিতে পারেন নাই; তবে কবিরাজ যে নিঃস্বার্থভাবে প্রত্যহ পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ভিন্ন গ্রামের এই নিঃস্ব রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিতেন, ইহা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কবিরাজ প্রতিদিনই ন্যায়রত্নকে দেখিতে আসিতেন; যে দিন সকালে আসিতে না পারিতেন, সে দিন অপরাহ্নে আসিতেন; সযত্নে তাঁহার রোগের অবস্থা পরীক্ষা করিতেন; ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন; তাঁহাকে প্রফুল্ল রাখিবার উদ্দেশ্য তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আগ্রহ সহকারে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। কবিরাজ মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, সাহিত্য-

রসজ্ঞ ও ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি; ন্যায়রত্নের সহিত কথাবার্ত্তায় কয়েক দিনেই ন্যায়রত্নের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। কোনও দিন কোনও কারণে তিনি ন্যায়রত্নকে দেখিতে আসিতে না পারিলে, সে দিনটি তাঁহার বৃথা গেল বলিয়া মনে করিতেন।

ন্যায়রত্ন তাঁহার পল্লী-ভবন হইতে নির্ব্বাসিত হইবার পর এ পর্য্যন্ত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিবার লোক পান নাই। তাঁহার অন্তর্বেদনা বুঝিতে পারে, এবং সহানুভূতি প্রকাশ করে, এরূপ কোনও লোকের সহিত আত্মীয়তা স্থাপিত না হওয়ায় তাঁহার মনের সকল কথা মনের মধ্যেই গোপন ছিল; কবিরাজের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা স্থাপিত হইলেও তিনি যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনাইবেন, ন্যায়রত্ন এরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। একদিন অপরাহ্নে কবিরাজ ন্যায়রত্নের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন, 'কয়েক দিন হইতে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াও সঙ্কোচবশতঃ তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই; কিন্তু কথাটা জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতুহল হইয়াছে।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'এমন কি কথা কবিরাজ? তোমাকে গোপন করিতে হয়, এমন কথা আমার কিছুই নাই; তুমি অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে পার।'

কবিরাজ বলিলেন, 'আপনার ন্যায় মহাপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন

ব্রাহ্মণ কন্যা সঙ্গে লইয়া এই সুদূর পল্লীতে কতকগুলি অশিক্ষিত নিরক্ষর চাষী গৃহস্থের মধ্যে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন, ইহার কারণ কি, তাহা আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও স্থির করিতে পারি নাই।'

ন্যায়রত্ন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'এই কথা?—কবিরাজ, আমি দৈব বিড়ম্বনায় আমার পৈতৃক বাসগ্রাম ত্যাগ করিবার পর এই দীর্ঘ কালের মধ্যে এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। যে কথা আমার নিজের কথা, যাহার সহিত সংসারের অন্য কোনও লোকের সুখ দুঃখের কোনও সংস্রব নাই, সেই তুচ্ছ ব্যক্তিগত কথার আলোচনা করিয়া অন্যের সময় নষ্ট করিবার আগ্রহও আমার নাই। তবে তুমি আমার হিতৈষী সুহৃদ, তুমি তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ বলিয়াই আজ তোমাকে আমার এই সুখ শান্তিহীন ব্যর্থ জীবনের কাহিনী বলিতেছি শোন'—

এইরূপ ভূমিকা করিয়া ন্যায়রত্ন তাঁহার পূর্ব্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রবলপ্রতাপ তালুকদার বিজয় দত্ত কাজি সাহেবের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার ঘর বাড়ী ও যে কয়েক বিঘা লাখরাজ জমী ছিল, তাহা কাড়িয়া লইয়া মিথ্যা অভিযোগে তাঁহাকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিবার পর তিনি নিরাশ্রয় ভাবে একবস্ত্রে পথে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে কিরূপে সদাশয় বলরামের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ কবিরাজের গোচর করিলেন। কবিরাজ কৌতূহলপূর্ণহৃদয়ে

নিস্তব্ধভাবে ন্যায়রত্নের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের করুণ কাহিনী শ্রবণ করিলেন। সমস্ত ঘটনা তাঁহার উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুত বোধ হইল। সকল কথা শুনিয়া কবিরাজের হৃদয় সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'কি পৈশাচিক অত্যাচার! এই অত্যাচারের প্রতীকারের কি কোনও ব্যবস্থা হইতে পারে না?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'প্রতীকারের ব্যবস্থা আর কি হইবে? দরিদ্রের প্রতি সবলের অত্যাচারের প্রতীকার সহজ নহে। আমাদের দেশের দরিদ্রেরা প্রবলের শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহাই তাহাদের নিয়তি।'

কবিরাজ বলিলেন, 'কিন্তু এইরূপ নিশ্চেষ্টতা কি পুরুষকারের ব্যভিচার নহে? এই অত্যাচারের কথা নবাব বাহাদুরের গোচর করিলে কি কিছুই ফল পাওয়া যাইত না?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আমার কর্ম্মফল আমি ভোগ করিলাম।'

কবিরাজ ঈষৎ উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, 'বিলক্ষণ! এক জন অন্যায় অত্যাচার করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল; আপনার অপমান করিয়া, মিথ্যা কলঙ্কের ডালি আপনার মাথায় চাপাইয়া, আপনাকে বাসগ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করিল; আর আপনি কর্ম্মফল ভোগ করিলেন ভাবিয়া নিয়তির ঘাড়ে সকল দায়িত্ব চাপাইয়া নিশ্চিন্তমনে নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিতেছেন! অপূর্ব্ব যুক্তি বটে! কিন্তু আপনার এই যুক্তি মানিতে হইলে ত নরপিশাচেরা যথেচ্ছা অপরাধ করিয়া শাস্তি পায় না।'

ন্যায়রত্ন মৃদু হাসিয়া কবিরাজের মুখের দিকে প্রশান্তনয়নে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'এত ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই কবিরাজ! তুমি স্থিরচিত্তে একটু ভাবিয়া বল দেখি, বাড়ী ঘর কি আমার? যদি আমার হইত তাহা হইলে তাহা আমারই থাকিত, কেহই তাহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিত না।'

কবিরাজ বলিলেন, 'আপনি সংসারী; সংসারবিরাগী উদাসীন, বা যোগী তপস্বী নহেন; আপনি যখন গার্হস্থ্যাশ্রমে আছেন; ঘর বাঁধিয়া সংসারে বাস করিতেছেন—তখন সংসারীর মতই কথা বলুন। বিজয় দত্ত তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, এই অধিকারে সে কি আপনার বাড়ী ঘর, আপনার পৈতৃক লাখেরাজ সম্পত্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে পারে?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'সংসারী সাজিয়া সংসারে বাস করিতেছি বলিয়া, যে সত্যের উপর সমস্ত সংসার নির্ভর করিতেছে, মোহের ঘোরে তাহা ত মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না! তুমি যে অধিকারের কথা বলিতেছ, সে অধিকার—তালুকদার বিজয়-দত্তের নাই, তালুকদারের প্রজা—আমারও নাই। বাড়ী বল, ঘর বল, বিষয় সম্পত্তি বল, আমার বলিতে এ সংসারে আমাদের কিছুই নাই। আমার পরিধানের এই বস্ত্র, আমার গাত্রের এই নামাবলীখানি, ইহাতেও আমার কোন অধিকার নাই। আমি নিজের কর্ম্মের দ্বারা যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি, আমার বলিতে সেই ক্ষেত্র আছে। আমার কর্ম্মফলে কেহ আমাকে

বঞ্চিত করিতে পারিবে না ; তদ্ভিন্ন আমার বলিতে আর কি আছে? কিছুই নাই। মাঠের ক্ষুদ্র তৃণগাছটি হইতে জোত জমা, বিষয় সম্পত্তি, তালুক মুলুক সমস্তই মা জগদম্বার। আমরা তাঁহার 'রাখালী' বা জিম্মাদার। আমার ঘর, আমার বাড়ী, আমার জমিদারী, আমার রাজ্য—বলিয়া দীনতম প্রজা হইতে বহুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধিশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত ; চারি দিকে কেবলই আমার আমার রব! কিন্তু মা যে দিন জবাব দিবেন—সে দিন এই আমার আমার ধ্বনি চিরনীরব হইবে ; ঘর বাড়ী, বিষয় সম্পত্তি রাজ্য সমস্তই ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় যাইতে হইবে জানি না, কিন্তু তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিবার অবসর হইবে না! সত্য যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত কত রাজার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, কত মহাপরাক্রান্ত বাদশাহের উত্থান ও পতন হইয়াছে, কিন্তু রাজ্য যাঁহার—তাঁহারই আছে ; কেবল হাতফের, কেবল 'রাখালী'র বদল হইয়াছে মাত্র! এই সনাতন সত্য তুমিও জান, আমিও জানি ; এমন কি, ঐ যে ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া দেহতত্ত্বের গান গায়িতেছে, সে-ও জানে। ঐ ভিক্ষুক মুখে বলিতেছে বটে—'মুদ্‌লে আঁখি, সকল ফাঁকি, মায়ায় বদ্ধ এ সংসার!'—কিন্তু ভিক্ষার ঝুলিটি সে ত অসার বলিয়া ত্যাগ করিতে পারে নাই। শুকদেব গোস্বামী ত্যাগীর আদর্শ হইয়াও কৌপীনখানি পাছে আগুনে পুড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিলেন! ত্যাগের আদর্শই ভারতের সনাতন আদর্শ। ভোগের ভিতর দিয়া ত্যাগের যে শিক্ষা,

তাহাই প্রকৃত শিক্ষা ; এই জন্য পৌরাণিক যুগে জনক রাজা হইয়াও ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং ঐতিহাসিক যুগে কপিলবস্তুর রাজনন্দন সোনার সিংহাসনে পদাঘাত করিয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই পৃথিবীর কোটী কোটী মানবের নিকট মোক্ষের পথ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু তোতার মত কেবল 'বুলি আওড়াইয়া' কোন ফল নাই। হৃদয়ে আমরা যে সত্য উপলব্ধি করিব, কার্য্যে তাহা প্রয়োগ করিব, কথায় ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। তবে তুমি আমার কথা শুনিয়া এ কথা মনে করিও না যে, আমি সংসারের সকল লোককে ঘর বাড়ী বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া কৌপীন আঁটিয়া বনে যাইতে বলিতেছি। আমার বিশ্বাস, সংসারে থাকিয়া সংসারের নশ্বরতা ভুলিয়া ইহসর্ব্বস্ব হইলে আমাদের আত্মার অধঃপতন অনিবার্য্য।'

ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া কবিরাজ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। এই মহতী বাণী দৈববাণীর ন্যায় তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তিনি মনে মনে ন্যায়-রত্নকে শতবার প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার ধর্ম্মভাব, উৎপীড়ককে ক্ষমা করিবার শক্তি, তাঁহার উদারতা ও আদর্শ-চরিত্রের কথা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কবিরাজ প্রস্থান করিলে ন্যায়রত্ন শুমতিকে ডাকিলেন। তিনি রোগশয্যায় পতিত থাকিয়া কোনও দিন এত অধিক কথা

বলেন নাই ; কথায় কথায় তাঁহার ভাবের উৎসমুখ যেন খুলিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি প্রাণের আবেগে কবিরাজকে এত কথা বলিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহাতে তিনি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুমতি তাঁহার আহ্বানে তাঁহার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিলে, তিনি চক্ষু মুদিয়া কিছুকাল নীরব রহিলেন। তাহা দেখিয়া সুমতি উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিল, 'বাবা, আমাকে ডেকেছো ? এখন শরীর কেমন বুঝ্‌ছো ?'

ন্যায়রত্ন তাঁহার শীর্ণ হাতখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া অবনতমুখী সুমতির মাথায় রাখিয়া, মনে মনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'আমি কেমন আছি, তাই জিজ্ঞাসা করছো, মা ! সেই কথা বল্‌তেই তোমাকে ডেকেছি ! সুমতি, তুমি মনে কষ্ট পাবে ভেবে এত দিন বলি বলি করেও তোমাকে বলা হয় নাই। কিন্তু আর তা না ব'লে থাকা যায় না ! তোমার মা আমাকে ডেকেছেন, আমাকে শীঘ্রই তাঁর কাছে যেতে হবে। তাঁর ডাক শুনেছি ; বুঝেছি—আমার আর বেশী বিলম্ব নেই।'

সুমতি পিতার কথা শুনিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। সে বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিল, 'বাবা, তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে ? তুমি আমাকে ফেলে গেলে আমি কার কাছে থাক্‌বো ?'

ন্যায়রত্ন কন্যাকে বিচলিত দেখিয়া কাতর হইলেন ; তাহাকে সান্ত্বনা-দানের জন্য বলিলেন, 'মা, আমার অভাবে তোমার কষ্ট হবে ভেবে কাঁদ্‌চো ; কিন্তু কেঁদে ত নিয়তির গতি রোধ করা যায় না, মা ! জন্ম হ'লে মৃত্যুও হবে ; জন্মের সঙ্গে মৃত্যুর

নিত্য-সম্বন্ধ। কারও অল্প বয়সে মৃত্যু হয়, কেহ প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে; কিন্তু কাল পূর্ণ হ'লে কাহাকেও ধরে রাখ্‌বার উপায় নেই। আমার কাল পূর্ণ হয়েছে, শীঘ্রই আমাকে ইহ-লোক থেকে বিদায় নিতে হবে। তুমি কিছু দিনের জন্য সংসারে একা পড়বে, তোমার কিছু কষ্ট হবে, তা বুঝ্‌তে পারচি; কিন্তু সে কত দিনের জন্য? তার পর যেখানে তোমার মা গিয়েছেন, আমিও যাচ্ছি, সেইখানে তোমাকেও যেতে হবে। সেখানে আবার আমরা একত্র হব; এক সঙ্গে থাক্‌ব। তখন তোমাকে দুঃখ যন্ত্রণা কিছুই সহ্য করতে হ'বে না। তুমি দুঃখ করো না, মা!'

কিন্তু সুমতি তাঁহার কথায় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিল না; তাহার মন বুঝিল না। সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পিতাকে বলিল, 'আমার দশা কি হবে বাবা! আমি যে তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানি নে বাবা! এ সংসারে আর যে আমার কেউ নেই!'

ন্যায়রত্ন কিছু কাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আমাকে ভিন্ন তুমি আর কাহাকেও জান না, তা আমি জানি; কিন্তু তোমার ভয় কি? তোমার মা জগদম্বাই আছেন; বিপদে আপদে তাঁকেই প্রাণ ভরে ডেকো; কাতরপ্রাণে তাঁকে ডাক্‌লে তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন।'

সুমতি বলিল, 'আমি মাকে জানি নে, আমি জানি তুমি বাবা, তুমিই মা। আমি ধর্ম্ম জানি নে অধর্ম্মও জানি নে; আমি

জানি তুমি ধর্ম্ম, তুমিই স্বর্গ। আমি দেবতা জানি নে, তুমিই আমার জীবন্ত দেবতা; তোমার সেবা করতে হয়, তাই জানি। এত দিন তোমারই সেবা করে এসেছি। তুমি চলে গেলে আমি কার কাছে দাঁড়াব, কার সেবা করব?'

ন্যায়রত্নের হৃদয় কন্যার কথায় বিচলিত হইল। পুনর্ব্বার তিনি মায়া-মোহে আচ্ছন্ন হইলেন, বুঝিলেন, এই মায়া-পাশ ছিন্ন করা কত কঠিন! তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর অতিকষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, 'দেখ মা, শোক দুঃখ ছায়ার মত সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। পৃথিবীতে এমন লোক নেই, যাকে কখনও কোনও রকম শোক দুঃখ পেতে না হয়। এমন কোনও পরিবার নাই, যেখানে মৃত্যু এসে ভক্তির বা স্নেহের পাত্রকে কেড়ে নিয়ে না গিয়েছে। দুঃখ দুর্দ্দিনে ভগবানের উপর আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন শান্তিলাভের কোনই উপায় নেই মা! আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে; বেলা শেষ হ'লে, সূর্য্য পাটে বস্‌লে যেমন তাঁকে ধরে রাখা যায় না, সেই রকম আমার এই জীবন-সন্ধ্যায় আমাকে ধরে রাখা আমার এই জরাজীর্ণ দেহের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাকে বিদায় দিতেই হবে। আমি তোমাকে একা এ সংসারে রেখে যাচ্ছি। তোমার কি দশা হবে, তা জানি নে; কিন্তু এ কথা মা স্থির জেনো যে, এখন যেমন তোমার কাছেই আছি, তোমাকে ছেড়ে গেলেও তেমনই তোমার কাছেই থাক্‌বো।

কেবল আমার এই জড় দেহ তোমাকে ছেড়ে যাবে, তাই আমাকে তুমি দেখতে পাবে না; কিন্তু আমি তোমাকে সর্ব্বক্ষণই দেখ্‌তে পাব। এখন তুমি কোনও অপ্রীতিকর কাজ করলে যেমন আমি মনে বেদনা পাই, তখনও সেই রকম বেদনা পাব। আমার এই কথাগুলি মনে রেখে তুমি জীবনের পথে চল্‌বে।'

রোগের কোনও প্রতীকার হইল না। কবিরাজ পূর্ব্বে যেমন প্রতি দিন আসিতেছিলেন, সেইরূপই প্রতি দিন আসিয়া সযত্নে তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাঁহার দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ প্রয়োগে ন্যায়রত্নের রোগক্লান্ত জীর্ণ দেহে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও রোগের উপশম না হইয়া প্রতিদিন তাহা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত হইল; তাঁহার জীর্ণ দেহ যেন শয্যায় মিশিয়া গেল! সুমতির উদরে অন্ন নাই, নয়নে নিদ্রা নাই; সে দিবারাত্রি পিতার রোগ-শয্যায় বসিয়া অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কখনও দুধ, কখনও সরবৎ, কখনও একটু পেঁপে, কখনও বা এক টুকরা আক তাঁহার মুখে তুলিয়া দেয়। পিতা কিসে একটু সুস্থ থাকেন, তাহাই যেন তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। এই ভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। ন্যায়রত্ন বুঝিলেন, তাঁহার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই; আসন্ন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনেক দিন পরে ন্যায়রত্ন আজ একটু সচ্ছন্দ বোধ করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া কুশাসনে উপবেশন করিয়াছেন, কিন্তু নিরবলম্বভাবে সোজা হইয়া বসিবার সামর্থ্য নাই; তিনি একখানি কাঠের পিঁড়িতে হেলান দিয়া বসিয়া, সুমতিকে নিকটে বসাইয়া তাহার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন।

সুমতি অনেক দিন তাহার পিতাকে উঠিয়া বসিয়া কথাবর্ত্তা বলিতে দেখে নাই। কঠিন রোগের যন্ত্রণায় তিনি এতই কাতর থাকিতেন যে, সুমতি কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মুখে হাসি দেখিতে পায় নাই। শ্রাবণের আকাশ সর্ব্বদাই গাঢ় মেঘান্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু সহসা যদি কোন দিন অপরাহ্লকালে পশ্চিম গগনপ্রান্ত হইতে সেই নিবিড় জলদজাল অপসারিত হয়—তাহা হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে তপনের বদনমণ্ডল যেমন প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সে দিন পিতার রোগকাতর পাণ্ডুর মুখমণ্ডল সেইরূপ হাস্যোজ্জ্বল দেখিয়া সুমতির উৎকণ্ঠাশঙ্কাকুল হৃদয়ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহাকে সচ্ছন্দভাবে কথা বলিতে শুনিয়া সুমতি কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইল।

ন্যায়রত্ন কন্যার সহিত গল্প করিতেছেন, এমন সময় বলরাম ঘোষ ন্যায়রত্নের শয়ন-কক্ষের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

সে ন্যায়রত্নকে পিঁড়া ঠেস দিয়া বসিতে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল, সোৎসাহে বলিল, "বাবাঠাকুর যে উঠে বস্‌তে পেরেচেন, কি ভাগ্যি! আজ 'শরীল' তবে এট্টু ভালই আছেন!"

ন্যায়রত্ন স্নেহের সহিত বলিলেন, "হাঁ বাবা, আমার যন্ত্রণা ক্রমেই যেন ক'মে আস্‌চে।"

বলরাম ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "খামোকা কম্‌বে না? আল্‌বৎ কম্‌তে হবে, যে বস্তি নাগিয়েচি! বস্তির গুমুদেই ব্যামো আরাম হ'য়ে যাবেন বাবাঠাকুর! সে তো হ'লো, এদিকে যে আর এক কাণ্ড, বাবাঠাকুর! হরেমপুর থেকে কে একজন মস্ত আমীর নোক পাল্কী হেঁকিয়ে আমার বাড়ীর সাম্‌নে আস্যে হাজির! ষোলটা কাহার পাল্কীখানা একিবারে উড়িয়ে এনেচে; পাল্কীর আগে পিছে মাথায় পাক-বাঁদা পাঁচজন বরকন্দাজ; ভারি জবোর 'হেতের' (হাতিয়ার) বাবাঠাকুর! 'কাহার' (বেহারা)-দের হাঁক শুনে আর বরকন্দাজদের হেতের দেখেই আমার আক্কেল গুড়ুম! মনের মদ্দি সন্দো হলো এ কোন 'আজা আজড়া' হবে, পথ ভুলে এ গাঁয়ে আস্তে পড়েচে। পুছ্ করলাম এ গাঁয়ে দরকার কি? পাল্কী থেকে বেরিয়ে আস্তে তিনি বুল্লে তেনার নাম কি ভালো! হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেজায় দত্তো, আপনার সাথে তেনার কি কথা আছে। আমি তেনাকে বসিয়ে রেখে আপনাকে খপর দিতে আলাম।"

বিজয় দত্ত!—সুবিস্তীর্ণ পরগণার তালুকদার প্রবলপ্রতাপ বিজয় দত্ত ন্যায়রত্নের দর্শনপ্রার্থী! তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য

তিনি এই সুদূর পল্লীতে স্বয়ং উপস্থিত! ন্যায়রত্ন এরূপ অসম্ভব কথা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে বলরামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মনে হইল, তিনি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন! কিন্তু বিজয় দত্তের নাম শুনিয়া সুমতির বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল; কি যেন এক অজ্ঞাত ভয়ে সে শিহরিয়া উঠিল, সভয়ে তাহার পিতাকে বলিল, "বিজয় দত্ত তোমার সন্ধানে এখানে এসেছে? আমাদের সর্ব্বস্বান্ত ক'রে, আমাদের পথে দাঁড় করিয়েও তার সাধ মেটে নি? আবার এখানে পর্য্যন্ত তাড়া করে এসেছে! তার মতলবখানা কি বাবা!"

ন্যায়রত্ন সংযতস্বরে বলিলেন, "কিছুই ত বুঝ্‌তে পারছি নে মা! আমি ত এখন পারের যাত্রী, আর কেন?"

সুমতি বলিল, "তোমার এই অন্তিম কালে সেই নরপিশাচ যে, তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে কতকগুলা দুর্ব্বাক্য বল্‌বে, তোমার শান্তিভঙ্গ করবে,—এ আমি সহ্য করতে পার্‌ব না। এখন আর আমরা তার তালুকের প্রজা নই; তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। বলাই দাদা, তাকে বল, বাবাঠাকুর প্রাণসংশয় কাহিল, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না, ফিরে যাক্ সে। যে রকম করে পার, তাকে বিদায় করে দাও। সে বড় লোক আছে—আছেই; আমরা তার মত নরপশুর মুখ দেখ্‌তে চাই নে।"

ন্যায়রত্ন কন্যার কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ও কি কথা মা! তুমি কেন এত বিচলিত হচ্ছ? এ রকম রূঢ় কথা

তোমার মুখে শোভা পায় না। বলরাম, যাও বাবা! তাঁকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসো। তিনি মস্ত মানী লোক—রাজা মানুষ।"

বলরাম বলিল, "যে আজ্ঞে বাবাঠাকুর! পাল্কীর ডাণ্ডাট রূপো দিয়ে মোড়া, তাতে আবার বাঘের মুখ! যে-সে লোক কি অমোন পাল্কীতে চড়তে পারে? আজ্ঞাটা আপনারই শিষ্যি বুঝি?"

বলরাম প্রস্থান করিলে সুমতি বলিল, "আমি কথাটা এমন কি অন্যায় বলেছি বাবা? যে নরাধম আমাদের সঙ্গে পিশাচের মত ব্যবহার করেছে, তার কি মুখ দর্শন করতে আছে? তার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ বাবা! সামান্য পিপ্‌ড়েটাকেও পা দিয়ে মাড়ালে সে কামড়াতে আসে। আর এই বিজয় দত্ত আমাদের লাঞ্ছনার বাকি রেখেছে কি? সে সব কথা ভুলে গিয়ে তার-ই সঙ্গে তুমি দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত! তাকে এখানে নিয়ে আস্‌তে বল্‌লে!"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "দেখ মা, বিজয় দত্ত কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—বুঝ্‌তে পার্‌চি নে; কিন্তু তাঁর মত সম্ভ্রান্ত লোক কষ্ট স্বীকার ক'রে যখন এতদূর এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই তার একটা গুরুতর কারণ আছে। সেই কারণটি কি, তা জানায় দোষ কি? তিনি যে আমার নূতন কোন অনিষ্ট করবেন, সে আশঙ্কা আমার নেই মা! বিশেষতঃ, তিনি এতদূর এসে আমার সঙ্গে দেখা না করে যে চলে যাবেন, এরূপও মনে হয়

না। যদি আমি দেখা করতে সম্মত না হ'তাম, তা হ'লেও তিনি এখানে আমার সম্মুখে আস্‌তেন, তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হ'তো; এ অবস্থায় দেখা করবো না বলায় অশিষ্টতা প্রকাশ করা ভিন্ন কোন ফল নেই। তা তিনি আসুনই না, কি বলেন শোনা যাক্।"

ন্যায়রত্নের কথা শেষ হইতে না হইতেই বিজয় দত্ত তাঁহার শয়ন-গৃহের বহির্দ্দেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু ন্যায়রত্নের অনুমতি না লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন নাই। বলরাম দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া ইঙ্গিতে তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানাইলে ন্যায়রত্ন ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "দত্ত মহাশয়, বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন কেন? আসুন, ভিতরে আসুন। আমি যে উঠিয়া আপনার অভ্যর্থনা করিব—সে শক্তি আমার নাই।"

ন্যায়রত্নের আহ্বানে বিজয় দত্ত তাঁহার নাগোরা জুতা দ্বারপ্রান্তে খুলিয়া রাখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং ন্যায়রত্নের পদতলে বসিয়া পড়িয়া উভয় হস্তে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন; ন্যায়রত্ন তালুকদারের এই বিচিত্র ব্যবহারে কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া বাধাদানের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। বিজয় দত্ত তাঁহার চরণ ধরিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "ঠাকুর, আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধী, আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই! আমি আপনাদের মিথ্যা চোর অপবাদ দিয়া অপদস্থ করিয়াছি, পৈশাচিক উৎপীড়ন করিয়া পৈতৃক বাস্তুভিটা হইতে বিতাড়িত করিয়াছি, আপনার ভূসম্পত্তি অপহরণ করিয়া

আপনাকে কন্যাসহ গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছি ; এখন কোন মুখে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব ? আমার-মত মহাপাপিষ্ঠ নির্লজ্জেরও আপনার মুখের দিকে চাহিতে লজ্জা হইতেছে !"

ন্যায়রত্ন মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আমার ন্যায় হতভাগ্য, নিরাশ্রয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের পদতলে এ ভাবে বসিয়া থাকা আপনার ন্যায় প্রবলপ্রতাপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতির পক্ষে অত্যন্ত অশোভন, এ ভাবে আপনার পদ-গৌরবের ও বৈভবের অপমান করিবেন না ; পা ছাড়ুন।"

বিজয় দত্ত বলিলেন,—"আমি জানি—আমি আপনার ক্ষমা লাভের যোগ্য নহি ; কিন্তু আপনার অভিসম্পাত দুষ্ট প্রেতের মত দিবারাত্রি আমার পশ্চাতে ঘুরিতেছে ! আমার মনে সুখ নাই, শান্তি নাই, দিবারাত্রি আমি অশান্তির আগুণে দগ্ধ হইতেছি ; শত সহস্র বৃশ্চিকের দংশন-জ্বালা আমি দিবারাত্রি অনুভব করিতেছি ; আমার আহারে রুচি নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, অনেক কষ্টে নিদ্রাকর্ষণ হইলে উৎকট দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠি ; আমার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি আপনার দাসানুদাস, আমার অপরাধ মার্জ্জনা না করিলে আপনার চরণ ত্যাগ করিব না।"

বিজয় দত্ত ন্যায়রত্নের উভয় চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া পড়িয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইয়া ন্যায়রত্নের সর্ব্বজনবন্দনীয় চরণদ্বয় সিক্ত করিল। বিজয় দত্তের বাহুপাশ হইতে পদদ্বয় মুক্ত করা ন্যায়রত্নের অসাধ্য হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিজয় দত্তকে অনুতপ্ত দেখিয়া ন্যায়রত্নের উদার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "চোর সন্দেহে আপনারা আমাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। অপরাধীর দণ্ডবিধান বিচারকের অবশ্যকর্ত্তব্য, যে বিচারক তাহাতে পরাঙ্মুখ হন—তাঁহাকে কর্ত্তব্যলঙ্ঘনজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। কাজি সাহেব কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাদের শাস্তি দিয়াছেন, সে জন্য আপনাকে দোষী করিতে পারি না; ইহাতে তাঁহারও দোষ নাই। মানুষের দুর্ব্বল হৃদয় শাস্তি পাইলে স্বভাবতঃই শাস্তিদাতার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠে; কিন্তু আমাদের শাস্তি যতই কঠোর হউক, সে জন্য আমি কোন দিন আপনাকে বা তাঁহাকে অভিসম্পাত করি নাই। তবে কেন বলিতেছেন, আমার অভিসম্পাতে আপনি অহর্নিশি মনঃকষ্ট পাইতেছেন? আপনার এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য আমি আন্তরিক বেদনা পাইলাম।"

বিজয় দত্ত ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "হাঁ, বিচারকের কর্ত্তব্য আমরা আঠার আনা পালন করিয়াছি! আপনি সকল কথা জানিয়া যদি এ কথা বলিতেন, তাহা হইলে আপনার এই উক্তি শ্লেষ ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারিতাম না! কিন্তু প্রকৃত রহস্য আপনার অবিদিত। সেই বিড়ম্বনার কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে আমার জিহ্বা আড়ষ্ট হইতেছে; কিন্তু অপরাধ করিয়া সে কথা স্বীকার না করা অধিকতর অপরাধের কার্য্য। সত্যবালার ফিতাটি হারাইয়াছিল সত্য, কিন্তু ফিতা

চুরী যাওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা না বুঝিয়া—ভ্রমক্রমে আপনার সুশীলা কন্যা সুমতিকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম। সেই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়াই আপনাদের অপমান করিয়াছি, সুমতির নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্কের কালী ঢালিয়া দিয়াছি, আপনাদের উভয়ের প্রতি পৈশাচিক উৎপীড়ন করিয়াছি, আপনাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছি। আপনাদের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছি, মানুষ মানুষের প্রতি তত অত্যাচার করিতে পারে না, বোধ হয় পিশাচেও পারে না; কিন্তু ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পরাজয় চিরকালই আছে। এত দিন পরে সেই ফিতাটি পাওয়া গিয়াছে!"

ন্যায়রত্ন বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বিজয় দত্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার বাক্যস্ফূরণ হইল না। সুমতি অদূরে অবগুণ্ঠনাবৃত মস্তকে অবনত মুখে বসিয়া রহিল; অশ্রুরাশি তাহার উভয় গণ্ড প্লাবিত করিতে লাগিল।

বিজয় দত্ত বলিলেন, "আপনার স্মরণ থাকিতে পারে আমার বাসার কাছে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল; সেই গাছের উচ্চশাখায় কাকে বাসা করিয়াছিল! কয়েক দিন পূর্ব্বে রাত্রিকালে প্রচণ্ড ঝড় হইয়াছিল; সেই ঝড়ে বট গাছটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কাকের বাসায় কোকিলের ছানা থাকে শুনিয়া সত্যবালা একজন দাসীকে সঙ্গে লইয়া সেই ভাঙ্গা গাছের কাছে গিয়া দেখিতে পায়, তাহার সেই জরীর ফিতাটি কাকের বাসার খড়কুটার সঙ্গে জড়াইয়া আছে! সত্যবালা দীর্ঘকাল পরে ফিতাটির সন্ধান পাইয়া অত্যন্ত

ভীত ও বিস্মিত হইয়া আমাকে ডাকিতে লাগিল! তাহার উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য করিয়া আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভাঙ্গা বট-গাছের তলায় উপস্থিত হইলাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক সেখানে আসিয়া জুটিল। গাছের ডাল হইতে কাকের বাসাটি ভাঙ্গিয়া দেখা গেল, কাক সেই ফিতে, খড়কুটা, ছেঁড়া নেকড়া, পাখীর পালক, গাছের পাতা প্রভৃতির সংযোগে সেই বাসাটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। বুঝিলাম কাক অন্যের অলক্ষ্যে ফিতেটা লইয়া গিয়া এই কাজ করিয়াছে!

"আরও বুঝিলাম, অন্যায় সন্দেহে কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! আমি তৎক্ষণাৎ আমার সেই দাসী—রমণীকে সেই স্থানে আনাইতে লোক পাঠাইলাম। আপনারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার পর রমণী পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হইয়া একেবারে উত্থানশক্তি-রহিত হইয়াছিল; তাহার দুর্গতির সীমা ছিল না! আমার বাসা হইতে তাহাকে গাড়ী করিয়া সেই গাছ-তলায় আনিতে হইল! ইতিমধ্যে সেই অদ্ভুত কথা গ্রামে প্রচারিত হওয়ায় গ্রামের সমস্ত লোক গাছের চারিদিকে আসিয়া জুটিল। সকলেই ফিতেটা দেখিবার আগ্রহে সেই ভিড়ের মধ্যে আসিয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল; ইত্যবসরে কয়েকজন লোক দৌড়াইয়া গিয়া কাজি সাহেবকে সেখানে ডাকিয়া আনিল।

" রমণীকে লইয়া গরুর গাড়ী সেখানে আসিবামাত্র তিন চারি জন লোক তাহাকে গাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করিল; তাহারই চক্রান্তে একটি ব্রাহ্মণ-পরিবারের সর্ব্বনাশ

হইয়াছে বুঝিয়া উত্তেজিত গ্রামবাসীরা তাহাকে কদর্য্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল। কেহ কেহ এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল! আমি অনেক কষ্টে তাহাদিগকে থামাইয়া রমণীকে বলিলাম,'তুই বলিয়াছিলি ন্যায়রত্ন-ঠাকুরের মেয়ে এই ফিতে চুরি করিয়াছিল, কিন্তু এখন কাকের বাসায় ইহা পাওয়া গেল; তুই নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিয়াছিলি। এমন দুষ্কর্ম্ম কেন করিয়াছিলি বল্। আবার যদি মিথ্যা কথা বলিস্—তাহা হইলে এখানকার এই সকল লোক তোকে টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে, তোর হাড় গুঁড়া হইবে; আমি তোকে রক্ষা করিতে পারিব না। যদি তোর প্রাণের মায়া থাকে, তবে সব কথা খুলিয়া বল। মিথ্যা কথা বলিলে এবার তোর রক্ষা নাই'।

"আমার কথা শুনিয়া রমণী কাঁদিয়া বলিল, 'বাবা, আমার আর্ বাঁচবের ইচ্ছে একটুও নেই, এখন মরণ হ'লেই বাঁচি; এ যাতনা আমার আর সহ্জি হচ্ছে না। সেই বামুন ঠাকুরের শাঁপ আমার হাডে হাড়ে নেগেচে। সুমতি ঠাক্‌রুণ ফিতে চুরি করে নি বাবা! আমিই তাকে জব্দ করবার নেগে মিছে কথা বুলেলাম। সতু দিদির গায়ের একখানা পুরোনো ভাল আলুয়ান ছেল, সেখানা আমারই পাবার পিত্যেশ ছেল; তা আমার কপালে ছাই পড়লো—সতু দিদি একদিন সেই আলুয়ানখানা সুমতি ঠাক্‌রুণের গায়ে জড়িয়ে দিলো। তা দেখে রাগে হিংসেয় আমার সর্ব্বোশরীল জ্বলে গ্যালো, সুমতি ঠাক্‌রুণের ওপর মা

ঠাকৃরুণের 'চিত্তির' কি করে বিগ্‌ড়েনো যায়, তাই ভাব্‌তে নাগ্‌নু। শেষে ফিতে চুরির বদনাম তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিনু। তার আর তার বুড়ো বাপের চুড়োন্ত নাকাল হলো। মনের সুখে আমি হাততালি দিয়ে নাচ্‌তে লাগ্‌নু। আমি যে ধম্ম-খাওয়া কাজ কন্নু—তা আপনারা কেউই জান্‌তে পারলে না, কিন্তু মাতার ওপর থেকে একজন ত দেখ্‌তে পেয়েলো, তার চোকে ত ধূলো দিতে পেরেলাম না। এখনও দিনের পর আত হচ্চে; চন্দোর সুয্যি আকাশে উঠ্‌চে। ধম্মে সইবে ক্যানো? ভগবান্ আমাকে যে সাজা দিলেন—তা আপনারা দেখ্‌চো। আমি এখন মলেই বাঁচি; আমার 'পাপের প্রাচিত্তির, ত হচ্ছেই, কিন্তুক আপনার আর ঐ (কাজি সাহেবকে দেখাইয়া) নেড়ে হাকিমডার চোক ছরত যে আজও বজায় আছে এই আশ্চয্যি!'—এই কথা বলিয়া সেই হতভাগিনী সেই স্থানে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার কথা শুনিয়া সমস্ত লোক স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর অসঙ্কোচে আমাকে ধিক্কার দিতে দিতে প্রস্থান করিল। আমি বুঝিলাম বিধাতার বিচারে পক্ষপাত নাই, রমণী তাহার দুষ্কর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছে। বিধাতার অভিসম্পাত বজ্রের ন্যায় আমারও মস্তকের উপর উদ্যত থাকিয়া আমার জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করিতেছে! আমি আপনার চরণ ধারণ করিয়া আপনার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিব—এই আশায় কত স্থানে আপনার অনুসন্ধান করিয়াছি, অবশেষে আপনি এখানে বাস করিতেছেন, সংবাদ পাইয়া আপনার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছি—আপনি—"

ন্যায়রত্নের নিয়তি

বিজয় দত্তের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ন্যায়রত্ন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবেগ কম্পিতস্বরে বলিলেন, "হরি হে ! তোমার খেলা তুমিই জান, তোমার রাজ্যে সত্য কখন মিথ্যা হয় না। সত্য চিরদিন গোপন থাকে না। আজ হোক, কাল হোক, আর দশদিন পরে হোক—যদি ইহলোকে না হয়, পরলোকেও সত্যের জয় হইবেই। ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব আমি, তোমার অপার লীলা কি বুঝিব, হরি ?"

ন্যায়রত্নের মুখ হইতে আর কোন কথা নিঃসারিত হইল না। এইরূপ অচিন্ত্য উপায়ে তাঁহাদের কলঙ্কক্ষালন হওয়ায় আনন্দে ও আকস্মিক উত্তেজনায় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। তাঁহার কোটরগত দীপ্তিহীন চক্ষুতারকা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার নয়নপ্রান্ত হইতে অস্থিসার বিবর্ণ গণ্ডে গড়াইয়া পড়িল ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তকটি হঠাৎ পিঁড়ির পাশে ঢলিয়া পড়িল, তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল ! তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বিজয় দত্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন ; সুমতি লজ্জা ত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পর বিজয় দত্ত ও সুমতি ন্যায়রত্নের সংজ্ঞাহীন দেহ ধরাধরি করিয়া অতি সাবধানে শয্যায় স্থাপন করিলেন, এবং তাঁহার চেতনা-সঞ্চারের জন্য উভয়েই তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই মুহূর্ত্তে কবিরাজ ন্যায়রত্নের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কবিরাজ মহাশয় বলরাম ঘোষের বাড়ীর নিকট দিয়া আসিবার সময় পাল্কী, বেহারা ও সশস্ত্র বরকন্দাজবর্গকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়াছিলেন। বলরাম তখন বিজয় দত্তকে ন্যায়রত্নের গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। সে বিজয় দত্তের প্রকৃত পরিচয় জানিত না, তবে বরকন্দাজদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল—তিনি একটি সুবিস্তীর্ণ পরগণার তালুকদার, রাজা বলাও চলে! সে বিজয় দত্তকে ন্যায়রত্নের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেও দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহার ধারণা হইয়াছিল, তিনি বাবাঠাকুরের একজন ভক্ত শিষ্য; বাবাঠাকুরের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তিনি তাঁহার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কবিরাজ বলরামকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিজয় দত্তের সেই পরিচয়ই জানিতে পারিলেন; কিন্তু পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে, কবিরাজ মহাশয় কয়েকদিন পূর্ব্বে কথাপ্রসঙ্গে ন্যায়রত্নকে তাঁহার অজ্ঞাতবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ন্যায়রত্ন কোন কথা গোপন না করিয়া তাঁহার প্রতি বিজয় দত্তের দুর্ব্ব্যবহারসংক্রান্ত সকল কথাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় বিজয় দত্ত কি উদ্দেশ্যে ন্যায়রত্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে

না পারিয়া কবিরাজ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এতবড় পাষণ্ড অত্যাচারীকে ন্যায়রত্নের শিষ্য বলিয়াই বা বলরামের ধারণা হইল কেন ? কবিরাজ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সন্দেহা-কুলচিত্তে ন্যায়রত্নের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পিতৃভক্ত পুত্র যেরূপ আন্তরিক যত্ন ও আগ্রহের সহিত পীড়িত পিতার পরিচর্য্যা করে, বিজয় দত্ত সেই ভাবে ন্যায়রত্নের সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন, তাঁহার চেতনাসঞ্চারের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন ; ইহা দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় সমধিক বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু তিনি বিজয় দত্ত বা সুমতিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাঁহাদিগকে সরিয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিয়া স্বয়ং ন্যায়রত্নের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শুশ্রূষায় ন্যায়রত্ন অবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিলেন ; তিনি চক্ষু উন্মিলন করিয়া স্থিরদৃষ্টিতে কবিরাজের মুখের দিকে চাহিলেন, পরে ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "তুমি কখন এলে ? বোসো !"

কবিরাজ তাঁহার পাশে বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই একটু আগে এসেছি—এসেই দেখি আপনার মূর্চ্ছা হয়েছে। এখনও আপনার নাড়ী বড় ক্ষীণ ; আপনি স্থিরভাবে বিশ্রাম করুন। এখন বেশী কথা বল্‌বেন না।"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "বিজয় কোথায় ?"

বিজয় দত্ত অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এই যে আমি এখানেই আছি ঠাকুর ! আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "না, আমি মোটেই ব্যস্ত হই নাই, তবে তোমার কথা শুনিয়া হঠাৎ একটু উত্তেজিত হইয়াছিলাম বটে! দুর্ব্বল দেহে আকস্মিক উত্তেজনা সহ্য হয় নাই, তাই মোহ হইয়াছিল। এখন বেশ সুস্থ হইয়াছি। কবিরাজ, বিজয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় নাই; তোমাদের পরিচয় করাইয়া দিই।"

কবিরাজ অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "না থাক, পরিচয়ের আবশ্যক নাই; আপনার নিকট পূর্ব্বেই ত উহঁার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি! তাহা শুনিয়া আর অধিক পরিচয় জানিবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই! তবে এ সময়ে উনি 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দিতে না আসিলেই ভাল হইত। এই পরম ভগবত, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি প্রজারঞ্জক রাজার যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কিছুই যিনি বাকি রাখেন নাই, তিনি এখন এই সুদূর পল্লীতে জীবনের প্রান্তোপনীত মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের শান্তিভঙ্গ করিতে কেন আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া একটু বিস্মিত হইয়াছি, একথা অবশ্যই স্বীকার করিব।"

বিজয় দত্তের প্রতি কবিরাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ন্যায়রত্ন ক্ষুণ্ণ হইলেন, তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "কবিরাজ, বিজয় অনুতপ্ত; উনি আমাদের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা একটি গুরুতর ভ্রমের ফল। মানুষ মাত্রই ভ্রমপ্রমাদের অধীন; ভ্রমের বশে কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া যিনি সরলভাবে ত্রুটি স্বীকার করেন, তিনি প্রকৃতই মহাশয় ব্যক্তি। বিজয় তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ত্রুটি স্বীকার করিবার জন্য কষ্ট করিয়া এতদূর আসিয়াছেন, এ অবস্থায় পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া

উঁহাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করা, বা উঁহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-ধারণা পোষণ করা সঙ্গত নহে ; তুমি আর উঁহাকে লজ্জা দিও না, ইহাই আমার অনুরোধ।"

বিজয় দত্ত বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়, আপনি বোধ হয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট উঁহার প্রতি আমার পৈশাচিক ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কোন কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু আমি কতদূর স্বার্থপর লোভী ইতর নিষ্ঠুর নরাধম, তাহা উনি আপনাকে বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ ; কারণ উনি ক্ষমা-শীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু ব্যক্তি ; উনি কাহারও নিন্দা করেন না, পরচর্চ্চা উঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। আমি মহাপাপিষ্ঠ, নিতান্ত ঘৃণিত জীব। কিন্তু নিজের প্রতি আমার যেরূপ ঘৃণা হইয়াছে, আপনি আমাকে ততদূর ঘৃণা করিতে পারিবেন না। যে অনুশোচনার অনলে দিবারাত্রি আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, তীব্র শ্লেষ, কঠোর বাক্যবাণ তাহার তুলনায় তুচ্ছ! শুনিয়াছি নিজের পাপের কথা মুক্তকণ্ঠে অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে পাপের গুরুত্ব হ্রাস হয়। আমার অপরাধ কিরূপ গুরুতর, তাহা আমার মুখেই শ্রবণ করুন ; তাহা হইলে আপনি বুঝিতে পারিবেন, আমি কিরূপ নরপিশাচ!"

অনন্তর বিজয় দত্ত ন্যায়রত্নের প্রতি তাঁহার আক্রোশের কারণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কন্যার কিতার অন্তর্দ্ধান ও তাহার পুনঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার কথা সবিস্তার কবিরাজের গোচর করিলেন। কবিরাজ স্তম্ভিতহৃদয়ে নির্ব্বাক্‌ভাবে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ সেই বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করিলেন।

বিজয় দত্ত নিজের কুকীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সবিষাদে বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়, আমি যে মহাপাপ করিয়াছি, তাহার বিবরণ শুনিলেন; আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এ জীবনে যে পুনর্ব্বার শান্তি লাভ করিব—তাহারও আশা নাই। তবে যদি ঠাকুরের হাতে পায়ে ধরিয়া পুনর্ব্বার উঁহাকে উঁহার পিতৃভিটায় সংস্থাপিত করিতে পারি, তাহা হইলে বুঝিব উনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।—সেই আশায় উঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। ঠাকুর, আপনার চরণাশ্রিত অনুতপ্ত হতভাগ্যকে নিরাশ করিয়া তাহার মানসিক যন্ত্রণা ও অশান্তি বর্দ্ধিত করিবেন না।"

ন্যায়রত্ন কোন উত্তর করিলেন না; মুক্ত বাতায়নপথে অনন্ত নীলাম্বরে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া নিস্পন্দভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন। সুমতি অদূরে বসিয়া বিজয় দত্তের সকল কথা শুনিতেছিল, পূর্ব্ব-কথা স্মরণ হওয়ায় তাহার হৃদয় শত চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল; তাহার পর বিজয় দত্ত যখন কথাপ্রসঙ্গে সত্যবালার কথা উত্থাপিত করিলেন, চিরদুঃখিনী ভাগ্যবিড়ম্বিতা সখী সুমতিকে দেখিবার জন্য সে কিরূপ আশা ও আগ্রহের সহিত তাঁহাদের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে—তাহার উল্লেখ করিলেন, তখন সুমতি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না; তাহার উভয় চক্ষু হইতে ঝর-ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া তাহার বক্ষের বসন সিক্ত করিল। অবশেষে সে চক্ষু মুছিয়া অবনতমস্তকে ধীরে ধীরে তালুকদারকে বলিল, "সত্য এখনও আমাকে ভুলিতে পারে নাই; সে আমাকে কত ভালবাসে, তা আমিই জানি।

জীবনে আবার তাহাকে দেখিতে পাইব, সে আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম। এ বিদেশে আমরা আশার অতিরিক্ত আদর যত্ন পাইয়াছি। বলাই দাদার নিঃস্বার্থ ভালবাসা, তাহার সেবা কখন ভুলিতে পারিব না; কিন্তু তবু যেন মনে হয় এখানে আমার আপনার জন কেহ নাই! পিতৃপিতামহের ভিটার কি আকর্ষণ আছে, তাহার তুলনায় স্বর্গসুখও তুচ্ছ মনে হয়! বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বাবার যাহাতে মত হয়, আপনি সেজন্য চেষ্টা করুন। সত্যর জন্য আমার বড়ই মন কেমন করিতেছে।"

সুমতির মনের কথা শুনিয়া ন্যায়রত্ন তালুকদারের ম্লান মুখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "বিজয়, আমার শরীরের অবস্থা দেখিতেছ ত? আমি উত্থানশক্তি-রহিত; কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে—আমার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবার অধিক বিলম্ব নাই। এ জীবনে আর যে আমার জন্মভূমি দেখিতে পাইব সে আশা নাই।"—এই কথা বলিতে বলিতে ন্যায়রত্নের নয়নপ্রান্ত সজল হইয়া উঠিল।

পিতার জীবন শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, এ কথা শুনিয়া সুমতি মনে অত্যন্ত বেদনা পাইল। সে জানিত ইহা ধ্রুব সত্য, পিতার অবস্থা দেখিয়া এই কঠোর সত্য সে উপলব্ধিও করিত; তথাপি মিথ্যা আশার আবরণে এই সত্য ঢাকিয়া রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। পিতার কথা শুনিয়া সে আবেগের সহিত বলিল, "কি কুক্ষণে যে বাড়ী হইতে পা বাড়াইয়াছিলাম, বিপদের পর বিপদ আসিয়া আমাদের আচ্ছন্ন করিতেছে।

এক দিনও সুখশান্তির মুখ দেখিতে পাইলাম না। বাবা! এখানে আসিয়া অবধি তোমার শরীর একটি দিনের জন্যও ভাল দেখিলাম না, একটা-না-একটা অসুখ লাগিয়াই আছে। গ্রামে দশজন আত্মীয় স্বজন আছে, আমার মুখের দিকে চাহিবার পাঁচজন আত্মীয়াও আছে। এখানে আমি যদি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ি—তোমার মুখে একটু জল দেয় এমন কেহ নাই। পাঁচ ক্রোশের মধ্যে এক ঘর ব্রাহ্মণ নাই! এইরকম শরীর লইয়া কোন্ ভরসায় তুমি এখানে থাকিতে চাহিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। তালুকদার মহাশয় না আসিলে আমাদিগকে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, এখানেই পড়িয়া থাকিতে হইত; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বোধ হয় অন্যরূপ! নতুবা তালুকদার মহাশয় আমাদের জন্য কষ্ট করিয়া এতদূর আসিতেন না। মা জগদম্বার করুণায় নির্ভর করিয়া চল বাবা, বাড়ী যাই। বাড়ী গেলেই তোমার এ ব্যারাম সারিয়া যাইবে।"

ন্যায়রত্ন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, এ আরোগ্য হইবার মতই ব্যাধি বটে! সে যাহাই হউক, আমার শরীরের এই অবস্থায় এই দূর দেশ হইতে কি করিয়া আমাকে বাড়ী লইয়া যাইবে—তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?"

ন্যায়রত্নের অন্য কোন আপত্তি নাই বুঝিয়া বিজয় দত্ত উৎসাহভরে বলিলেন, "আপনি ত পাল্কীতে চড়িবেন না; কিন্তু সে জন্য অসুবিধা হইবে না, আপনাকে নৌকায় করিয়া লইয়া যাইব। এখান হইতে নৌকায় কিছু দূর গিয়া আমরা গঙ্গায় পড়িব। গঙ্গার বাতাসে আপনার শরীরও অনেকটা সুস্থ হইবে।"

ন্যায়রত্ন নৈরাশ্য-বিজড়িত স্বরে বলিলেন,' 'আর সুস্থ হইয়াছি! এ জীবনে গঙ্গাদর্শন আমার ভাগ্যে নাই। কবিরাজ, তুমি কি বল?"

কবিরাজ বলিলেন, "আপনি একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলে আর কি বলিব? দীর্ঘকালব্যাপী রোগে ঔষধ ফলপ্রদ না হইলে দেখিয়াছি স্থানপরিবর্ত্তনে ফল পাওয়া যায়। আপনারও ইহাতে উপকার হওয়াই সম্ভব।"

সুমতি বলিল, "কবিরাজ মহাশয়! যে উপায়ে হউক—আপনি বাবাকে বাড়ী পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন; আপনার মত হইলে উনি আর আপত্তি করিবেন না।"

বিজয় দত্ত বলিলেন, "দেখুন ন্যায়রত্ন মহাশয়, এতক্ষণ আমি নিজের কথা লইয়াই আপনার সময় নষ্ট করিয়াছি; আসল কথাটা এখনও আপনাকে বলা হয় নাই। আপনি আমার সঙ্গে বাড়ী যাইতে অসম্মত হইলেও আপনাকে বাড়ী যাইতেই হইবে; নবাব বাহাদুরের আদেশ আপনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।"

বিজয় দত্তের এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ন্যায়রত্ন সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "বিজয়, আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না! কাজি সাহেবের আদেশে আমি নির্ব্বাসিত হইয়াছি; এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আমি নবাব-দরবারে প্রতীকারপ্রার্থী হই নাই। মা জগদম্বার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া বিচারক-প্রদত্ত দণ্ডই নতশিরে গ্রহণ করিয়াছি; এ অবস্থায় নবাব বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত

হইয়া বিচারক-প্রদত্ত দণ্ড রহিত করিবেন, আমাকে বাড়ী লইয়া যাইবার আদেশ দিবেন, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না।"

বিজয় দত্ত বলিলেন, "নবাব বাহাদুর একজন সাধারণ প্রজার হিতের জন্য ব্যস্ত হইয়া আপনার গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের পরোয়ানা বাহির করিবার আদেশ দিয়াছেন, এরূপ মনে করিবেন না। নবাব বাহাদুর কেবল যে সাহিত্য ও সঙ্গীতেরই পক্ষপাতী এরূপ নহে, প্রত্নতত্ত্বেও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ আছে—ইহাও বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নহে; কারণ আপনার স্মরণ থাকিতে পারে—অনেক পূর্ব্বে গৌড়ের ভগ্নস্তূপের মধ্যে একখানি জীর্ণ শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহার পাঠোদ্ধারের ভার আপনার উপরেই পড়িয়াছিল।"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "হাঁ, আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে; সে অনেক দিনের কথা, আমাদের পরগণা তখনও তুমি ইজারা-বন্দোবস্ত করিয়া লও নাই। আমি নবাব বাহাদুরের আদেশে সেই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছিলাম; এমন কি, আমার পরিশ্রমে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাকে পুরস্কৃত করিবারও প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি পুরস্কারের লোভে উহা করি নাই, এ কথা তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে জানাইয়াছিলেন, আমার কথা তাঁহার স্মরণ থাকিবে। এই ঘটনার কিছুকাল পরে তুমি যখন আমাদের তালুকের মালিক হইলে, এবং আমার ভাগ্যদোষে কাজি সাহেবের

প্রতিকূলতায় আমি সর্ব্বস্বান্ত হইলাম, উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া জন্মভিটা হইতে বিতাড়িত হইলাম ;—তখন একবার আমার মনে হইয়াছিল নবাব বাহাদুরকে আমার বিপদের কথা আদ্যোপান্ত জানাইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করি। নবাব বাহাদুর হয় ত কৃপাপরবশ হইয়া শরণাগত আশ্রিতকে রক্ষা করিতেন ; কিন্তু তাহাতে তোমার ও কাজি সাহেবের অনিষ্ট হইতে পারে, বিশেষতঃ, প্রবলপ্রতাপ তালুকদার ও নবাব বাহাদুরের প্রতিনিধি-স্থলাভিষিক্ত কাজি সাহেবের বিপক্ষতাচরণ আমার ন্যায় দুর্ব্বল নিঃস্ব প্রজার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র—মনে করিয়া আমি সেই অভিপ্রায় ত্যাগ করি।—নবাব বাহাদুরের শরণাগত না হইয়া নবাবের যিনি নবাব, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি মালিক, তাঁহারই শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সুতরাং বুঝিয়াছ সেই দিনই আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম! এতদিন পরে সেই শিলালিপির পাঠোদ্ধার-প্রসঙ্গে নবাব বাহাদুর কি জন্য এই অকিঞ্চন বৃদ্ধকে স্মরণ করিয়াছেন ?”

ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া বিজয় দত্ত ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর বিনীতভাবে বলিলেন, “ন্যায়রত্ন মহাশয়, আপনার ক্ষমাশীলতার তুলনা নাই, এই স্বার্থপরতাপূর্ণ পৃথিবীর বহু ঊর্দ্ধে আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত। আপনার প্রতি নবাব বাহাদুরের যেরূপ শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয় আমার হস্তে আপনার নিগ্রহের কথা তাঁহার গোচর করিলে আমাকে অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। আমি লোকবল

ও অর্থবলের সাহায্যে আত্মসমর্থনের চেষ্টা করিতাম; হয় ত আপনাকে রাজদ্বারে অপরাধী প্রতিপন্ন করিতে পারিতাম, কিন্তু বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাব আইন-কানুন বা সাক্ষী-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সকল বিচার সম্পন্ন করেন না, অনেক সময় নিজের দুর্দ্দমনীয় হৃদয়াবেগেরই অনুসরণ করেন। আপনার প্রতি তিনি প্রসন্ন; আমি আপনার অনিষ্ট করিয়াছি, এ বিশ্বাস সহজেই তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইত; আমার সহস্র সাক্ষী, প্রমাণ, অগণিত অর্থ তাঁহার সেই ধারণা বিচলিত করিতে পারিত না। তিনি যাঁহার নিকট উপকৃত ও কৃতজ্ঞ, তাঁহারই আমি অশেষ অনিষ্ট করিয়াছি, নবাবের একবার এ ধারণা হইলে আমার আর রক্ষা ছিল না! ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দুর্ব্বল ব্যক্তি অনেক সময় প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হয় না, শত্রুকে ক্ষমা করে;—কিন্তু সেই ক্ষমা 'ক্ষমা' নামের যোগ্য নহে, তাহা নিরুপায়ের অক্ষমতামাত্র; কিন্তু যিনি প্রতীকারের উপায় সত্ত্বেও শত্রুর অনিষ্টাশঙ্কায় প্রতীকারের চেষ্টা করেন নাই, তিনিই প্রকৃত ক্ষমাশীল, তিনি দেবতা। আপনার এই ক্ষমাশীলতা পৃথিবীতে দুর্লভ। কিন্তু কথায় কথায় অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি, আসল কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে; তাহাই বলি শুনুন;—আপনি সেই জীর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিলে অন্যান্য পণ্ডিতকে তাহার যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে দেওয়া হয়; তাঁহারা আপনার মতাবলম্বী হইলেন না, শিলালিপির-উৎকীর্ণ শ্লোকগুলির যে পাঠোদ্ধার করিলেন, তাহা ভিন্নার্থ-বাচক! ইহাতে নবাব বাহাদুরের সন্দেহভঞ্জন না হওয়ায়

তিনি কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা উহার পাঠোদ্ধারের জন্য শিলা-লিপিখানি অযোধ্যাপ্রদেশের নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। কাশীনরেশ অযোধ্যার নবাবের অধীন তালুকদার মাত্র; অযোধ্যার নবাবের আদেশে কাশীর নরপতি সেখানকার প্রধান প্রধান পণ্ডিত দ্বারা উহার পাঠোদ্ধার করাইয়া শিলালিপি ফেরত পাঠাইয়াছেন; এবং আপনার পাঠই নির্ভুল প্রতিপন্ন হইয়াছে; ইহাতে এক নিগূঢ় ঐতিহাসিক রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। নবাব বাহাদুরের রাজ্যমধ্যে—এই বঙ্গদেশে আপনার ন্যায় মহাপণ্ডিত আছেন, ইহা তিনি গৌরবের বিষয় মনে করিয়াছেন; এবং আপনাকে সম্মানিত করা রাজধর্ম্মানুসারে অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, আপনাকে খেতাব ও খেলাত প্রদানের জন্য তাঁহার কারকুনকে পাঠাইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন; কারকুন মহাশয়ের অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি না হয়, এই মর্ম্মে আমি সম্প্রতি নবাব সরকার হইতে এক পরোয়ানা পাইয়াছি।"

কবিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ, বুঝা গিয়াছে! এই জন্যই ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ভিটাছাড়া করিয়া আপনার এত অনুশোচনা হইয়াছে যে, আপনি নিজেই উঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন; পাছে নবাবের কারকুন আসিয়া. আপনার ষড়যন্ত্রেই উনি উদ্বাস্তু ও নির্ব্বাসিত হইয়াছেন—শুনিয়া ক্রুদ্ধ হন, এবং মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার গুণের কথা নবাব বাহাদুরের গোচর করেন!"

কবিরাজের এই তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে বিজয় দত্ত মর্ম্মাহত হইলেন; কিন্তু কোন কথা না বলিয়া ম্লানমুখে মস্তক অবনত করিলেন। কে বলিবে ইনিই সেই সুবিস্তীর্ণ পরগণার অসংখ্য প্রজার ভাগ্যবিধাতা দস্তের অবতার প্রবলপ্রতাপ তালুকদার বিজয় দত্ত—যাঁহার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জলপান করে?

ন্যায়রত্ন বিজয় দত্তের মনঃক্ষোভ বুঝিতে পারিয়া অসংযতবাক্ কবিরাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন; তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "দেখ কবিরাজ,তোমার এই রূঢ় কথা শুনিয়া আমি মনে বড় বেদনা পাইলাম; তুমি কি জান না 'সত্যং ব্রুয়াৎ,প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'—ইহাই নীতিশাস্ত্রকারের উপদেশ? অপ্রিয় কথা সত্য হইলেও বলিতে নাই; সেইরূপ কথায় বন্ধুও বিরক্ত হন—পর ত পরের কথা! বিশেষতঃ তোমার কথা সত্যও নহে; অপ্রিয় অসত্য কথায় কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া গুরুতর অপরাধ। বিজয় প্রকৃতই অনুতপ্ত হন নাই, ইহা তুমি কিরূপে বুঝিলে? কারকুনের ক্রোধের কথা বলিতেছ? তিনি নবাবের বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র; আমার নির্ব্বাসনের জন্য বিজয়ই দায়ী, এই ধারণাই যদি তাঁহার মনে বদ্ধমূল হয়, আর সে জন্য বিজয়ের প্রতি তিনি অসন্তুষ্টই হন,—তাহা হইলে তাঁহার মুখ বন্ধ করা কি বিজয়ের অসাধ্য বলিয়া তুমি মনে কর? ছিঃ—এ রকম অশ্রদ্ধেয় কথা বলিতে নাই। ঐরূপ শোচনীয় ভ্রমের জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত না হইলে বিজয় কখনই বিপন্নের

মত এখানে আসিতেন না, ষোড়শোপচারে কারকুনের পূজার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকিতেন। কতখানি অনুতাপের ফলে বিজয়ের মত ধনবান্ ও মহাসম্মানিত ব্যক্তি একজন চিরদরিদ্র নগণ্য নির্ব্বাসিত বৃদ্ধের অন্বেষণে বহু দূরবর্ত্তী অজ্ঞাত পল্লীতে— একজন সামান্য গোয়ালার কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা কি তোমার বুঝিবার শক্তি আছে? না, বিজয়! কবিরাজের প্রগল্‌ভতায় দুঃখিত হইও না; আমি তোমার অনুতাপের গভীরতা বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার অনুশোচনা যে আন্তরিক—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার মনে হয় নবাব আমাকে সম্মানিত করিবার অভিপ্রায়ে কারকুনকে অনর্থক পাঠাইতেছেন; আমি যে-রাজ্যের পথিক হইয়াছি—মানুষের প্রদত্ত খেতাব ও খেলাত সেখানে সঙ্গে লইয়া যাইবার উপায় নাই! আর যদি আমার তাহা ভোগ করিবার সময়ও থাকিত, তাহা হইলেও আমি তাহার লোভ করিতাম না। দাতা সদাশয়তার বশবর্ত্তী হইয়া যাহা দান করেন, গৃহীতার তাহা গ্রহণের যোগ্যতা আছে কি না তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। খেতাবের অর্থ উপাধি; আমার মনে হয় উপাধি গ্রহণ নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও গুণপণার বিজ্ঞাপনপ্রচার মাত্র; নিজেকে এই ভাবে জাহির করা কি অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যের পরিচায়ক নহে? প্রথম যৌবনে আমি যখন টোল হইতে বাহির হইয়া আসি, তখন আমার গুরু-দেব আমাকে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি দিয়াছিলেন; কিন্তু যে শাস্ত্রের পারদর্শিতার নিদর্শনস্বরূপ আমাকে এই উপাধি দেওয়া হইল,

সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও অপরিমেয় সেই ন্যায়শাস্ত্রের আমি জানিই বা কি, আর বুঝিই বা কতটুকু? ক্ষুদ্র পিপীলিকা চিনির পাহাড়ে গিয়াছিল, সে চিনির একটি ক্ষুদ্র কণিকামাত্র মুখে করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় মনে করিয়াছিল—পাহাড়ের সমস্ত চিনি সে আয়ত্ত করিয়াছে! আমিও সেইরূপ কয়েক দিন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার কণামাত্র আয়ত্ত করিতে পারিলাম কি না সন্দেহ; কিন্তু 'ন্যায়রত্ন' হইয়া দাঁড়াইলাম! এই উপাধি গ্রহণ করা আমার পক্ষে কতদূর ধৃষ্টতার কার্য্য হইয়াছিল—ইহা বুঝিয়া ন্যায়রত্ন বলিয়া পরিচয় দিতে আমি আন্তরিক সঙ্কোচ অনুভব করি; কিন্তু কি করিব, অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকে আমাকে ন্যায়রত্ন বলিয়াই জানিয়াছে—কাজেই আর তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।"

কবিরাজ বলিলেন, "টোলের অধ্যাপকের প্রদত্ত উপাধি ও নবাব বাহাদুরের প্রদত্ত উপাধিতে অনেক প্রভেদ। নবাব বাহাদুর আপনাকে কোন উপাধি দিলে আপনি কি তাহা গ্রহণ করিবেন না?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "নিশ্চয়ই; এই সকল অসার উপাধির কোন স্বার্থকতা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। কিন্তু দিন দিন দেশের লোকের মতি গতি কি শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে! বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, কিন্তু সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, সকলেই উপাধিলাভের জন্য ব্যস্ত; নামের সঙ্গে একটা উপাধি জুড়িতে পারিলেই সকলে কৃতার্থ! যে জ্ঞানানুরাগ, নিস্পৃহতা ও আড়ম্বরে অরুচি যুগ যুগ ধরিয়া ব্রাহ্মণের চরিত্রগত বিশেষত্ব

ছিল, গৌরবের নিদর্শন ছিল, তাহা দিন দিন উপেক্ষিত হইতেছে; সে কালের মত প্রগাঢ় পণ্ডিত এখন খুঁজিয়া পাইবে না, অথচ বিদ্যালঙ্কার, স্মার্ত্তশিরোমণি, ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি উপাধি-ব্যাধি-মণ্ডিত পাণ্ডিত্যাভিমানী যত্র-তত্র দেখিতে পাইবে। ইহা কি সামান্য ক্ষোভের ও লজ্জার বিষয়?"

বিজয় দত্ত বলিলেন, "খেতাব না হয় গ্রহণ না-ই করিলেন; কিন্তু নবাব বাহাদুর যদি আপনাকে কোন খেলাত বা জায়গীর দান করেন, তাহাও কি আপনি প্রত্যাখ্যান করিবেন? আপনার ভরণপোষণের জন্য নবাব সরকার হইতে একশত বিঘা লাখরাজ দান করা হইবে, নবাব দরবারে না কি এইরূপ একটি প্রস্তাব উঠিয়াছে; রাজধানীর অনেক সংবাদই আমি শুনিতে পাই, এই সংবাদটিও জানিতে পারিয়াছি।"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "নবাব বাহাদুর অনুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ আমাকে যাহা দান করিবেন, সেই রাজপ্রসাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন আমি সঙ্গত মনে করি না; সুতরাং সেই দান আমাকে অগত্যা মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে।"

কবিরাজ বলিলেন, "ম্লেচ্ছের দানটা ভোজন-হস্তে গ্রহণ করিবেন! ইহা কি আপনার ন্যায় শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য হইবে?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "রাজা ক্ষত্রিয়ই হউন, আর ম্লেচ্ছই হউন, প্রজার পিতৃস্থানীয়; রাজদত্ত পুরস্কার সাধারণ দানের সহিত

তুলনীয় নহে। কিন্তু আমার জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য রাজদত্ত খেলাত বা জায়গীরের প্রয়োজন নাই। নবাব বাহাদুর রাজ-প্রসাদস্বরূপ আমাকে যদি সত্যই কিছু নিষ্কর ভূমি দান করেন, তাহা আমি বিজয়ের হস্তেই সমর্পণ করিয়া যাইব। উনি উক্ত লাখরাজ সম্পত্তির আয় হইতে প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিন দীন-দুঃখীদের অন্নবস্ত্র বিতরণ করিবেন। ইহাতে বহু অনাথের উপকার হইবে; বুভুক্ষিত দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় নবাব বাহাদুরের দান সার্থক হইবে; দরিদ্রের এই প্রকার হিতের তুলনায় শত শত উপাধি, খেতাব বা খেলাত নিতান্তই তুচ্ছ।"

সুমতি বলিল, "ওসব কথা এখন থাক্ বাবা! আগে ত নবাব বাহাদুরের হুকুম বাহির হউক, তাহার পর যে ব্যবস্থা করিতে হয় করিও! এখন শীঘ্র যাহাতে আমরা বাড়ী রওনা হইতে পারি তাহারই উপায় স্থির কর, আমার মন বাড়ীর জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। বাড়ী ফিরিতে না পাইলে আমার মনের কষ্ট দূর হইবে না।"

ন্যায়রত্ন কন্যার অধীরতায় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "মা, এত তাড়াতাড়ি করিলে কি চলে? আমার এই ভগ্ন দেহে পথের কষ্ট সহ্য হইবে কি না বিবেচনা করিয়া দেখি; যাহারা এই নিরাশ্রয় বিপন্ন পরিবারকে আশ্রয় দান করিয়া পরম আদর যত্নে এত দিন প্রতিপালন করিল, তাহাদেরই বা অভিপ্রায় কি, তাহাও ত জানা আবশ্যক। তাহার পর যেরূপ ব্যবস্থা সঙ্গত বোধ হয়—তাহাই করা যাইবে। বিজয় আমাদের অতিথি, বাড়ী যাইবার উৎসাহে

তুমি অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলে ত চলিবে না মা! আমরা নিতান্ত দরিদ্র, বিজয়ের মত মহাসম্ভ্রান্ত অতিথির উপযোগী পানভোজনের ব্যবস্থা করিবার শক্তি আমাদের নাই, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বিদুরের ক্ষুদকুড়ায় তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন, দরিদ্র বিদুর সামান্য শাকান্ন দ্বারা ভগবানের সেবা করিতেও লজ্জা বোধ করেন নাই; আমাদেরও লজ্জিত হইবার কারণ নাই। তুমি যাও উঁহার আহারের আয়োজন কর। আজ মধ্যাহ্নে নিয়মিত সময়ে বোধ হয় উঁহার আহার হয় নাই।"

পিতার আদেশে সুমতি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেল।

সুমতি প্রস্থান করিলে ন্যায়রত্ন তালুকদারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যিনি আমাদিগকে গৃহহীন করিয়াছেন, যাঁহার ইচ্ছায় আমরা নির্ব্বাসিত হইয়াছি, তিনি যদি এত দিন পরে আমাদিগকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বাড়ী যাইতেই হইবে। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন তোমার আমার ইচ্ছায় কিছুই হইবে না। তাঁহার ইচ্ছায় মূক বাক্‌শক্তি লাভ করে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে; সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা হইলে আমার বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া যে অসম্ভব—ইহা আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু এখন আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমি যে এ জীবনে আমার জন্মভিটা পুনর্ব্বার দেখিতে পাইব, ইহা দুরাশা বলিয়াই মনে হইতেছে। আমার বিশ্বাস—এই কুটীরেই আমার ইহলীলার অবসান হইবে; সেই অন্তিম মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষাতেই আমি কালাতিপাত করিতেছি। আমি শীঘ্রই

নিন্দাপ্রশংসার গণ্ডী অতিক্রম করিব, তথাপি তোমার কন্যার অপহৃত ফিতাটি যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে পুনঃ-প্রাপ্ত হইয়াছ —জীবনদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে এই সংবাদটি শুনিতে পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। আমার মনে আর ক্ষোভ নাই ; এখন আমি সুখে মরিতে পারিব। সুমতি কলঙ্কমুক্তা হইয়া গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারিবে ; নতুবা গ্রামে ফিরিয়া সে আত্মীয় স্বজনগণকে মুখ দেখাইতে পারিত না। তাহার পরিণামচিন্তায় আমার অন্তিমমুহূর্ত্ত অশান্তিপূর্ণ হইত। দেখ বিজয়, সংসারে আমার আর কোন বন্ধন নাই, কেবল সুমতিই সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন। পৃথিবীতে তাহার মুখের দিকে চাহিবার আর কেহ নাই ; কিন্তু তোমার সুশীলা কন্যা তাহাকে বড়ই স্নেহ করে, সুমতিও তাহার অনুরাগিণী। সুমতি বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছে—তাহার কারণ সত্যবালার স্নেহের আকর্ষণ। সে সত্যবালার ভালবাসার, তোমার স্নেহের অযোগ্যা নহে—ইহার প্রমাণ ত তুমি পাইয়াছ ; আমি তোমার হাতেই সুমতিকে সমর্পণ করিলাম। আমি ইহলোক ত্যাগ করিলে সে নিরাশ্রয় হইবে, আমার অভাবে ব্যাকুল হইবে ;—এই জন্য আমার অনুরোধ, তুমি তাহাকে আশ্রয় দিও, তোমার সত্যবালার ন্যায় তাহারও প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিও।"

ন্যায়রত্নের কণ্ঠরোধ হইল, তাঁহার কোটরগত চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া উপাধান সিক্ত করিল ; বিজয় দত্তের চক্ষুর

পাতাও ভিজিয়া উঠিল,—মরুভূমি করুণার প্লাবনে ভাসিয়া গেল! তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলেন।

ন্যায়রত্ন ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, তালুকদারের উভয় হস্ত স্বীয় শীর্ণ বিবর্ণ হস্তদ্বয়ে পরিবেষ্টিত করিয়া আবেগকম্পিতস্বরে বলিলেন, "বল, আমার সুমতির ভার গ্রহণ করিলে। বিজয়, মরণাহত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই অন্তিম প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

তালুকদার বলিলেন, "আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি, সুমতির সকল ভারই আমি গ্রহণ করিলাম। আমার সত্যবালা ও আপনার সুমতিকে আমি ভিন্ন চক্ষে দেখিব না; তাহাকে সুখী করিতে পারিব, সে আশা নাই, বিধাতা যে দিন তাহাকে বিধবা করিয়াছেন—সেই দিন তাহার সকল সুখ হরণ করিয়াছেন; তবে সে যাহাতে শান্তিলাভ করে—তদ্রূপ ব্যবস্থার ক্রটী হইবে না, আমার এই অঙ্গীকারে আপনি নির্ভর করিতে পারেন।"—বিজয় দত্ত ন্যায়রত্নের চরণ স্পর্শ করিয়া এই অঙ্গীকার করিলেন।

ন্যায়রত্ন তাঁহার দক্ষিণ করতল বিজয় দত্তের মস্তকে রাখিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "বাবা, তুমি চিরসুখী হও; মা কমলা তোমার সংসারে অচলা হউন।—আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্নকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাইবার আশায় তালুকদার বিজয় দত্ত অষ্টাহ কাল তাঁহার বাড়ীতেই বসিয়া রহিলেন; তিনি পাল্কী বেহারা বিদায় করিয়া নৌকারও বন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু ন্যায়রত্নকে স্থানান্তরিত করিবার সুযোগ পাইলেন না। কবিরাজ বলিলেন, তাঁহার শরীর একটু সুস্থ না হইলে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা সঙ্গত হইবে না, সামান্য পরিশ্রমও তাঁহার পক্ষে সাংঘাতিক হইতে পারে; কিন্তু আট দিন বসিয়া থাকিয়াও বিজয় দত্ত ন্যায়রত্নের রোগোপশমের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না! তৈলহীন প্রদীপের আলোকশিখার ন্যায় ন্যায়রত্নের জীবন-প্রদীপ ক্রমেই নিষ্প্রভ হইতে লাগিল। কবিরাজের চিকিৎসাকৌশল, সুমতি ও বিজয় দত্তের প্রাণপণ চেষ্টা যত্ন ও সেবা শুশ্রূষা সমস্তই ব্যর্থ হইল।

এই ভাবে আট দিন অতীত হইলে, নবম দিন প্রভাতে ন্যায়রত্ন কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। সে দিন তাঁহার রোগযন্ত্রণার অনেকটা উপশম বোধ হইতেছিল। তাঁহার আদেশে সুমতি তাঁহার বিশীর্ণ কণ্ঠ হরিনামের মালায় পরিবেষ্টিত করিল, এবং একখানি নামাবলী দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া দিল। তখন তিনি এতই দুর্ব্বল যে, হাত পা নাড়িবারও শক্তি ছিল না; কিন্তু বাক্‌শক্তি রহিত হয় নাই; কণ্ঠস্বর ক্ষীণ

হইলেও তিনি স্বাভাবিকভাবেই কথা কহিতে পারিতেছিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি প্রাবৃটের অপরাহ্ণের অস্তোন্মুখ তপনের ন্যায় নিষ্প্রভ, কিন্তু অত্যন্ত স্থির ও গম্ভীর; ঝটিকারম্ভের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেরূপ প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, সেইরূপ প্রশান্ত।

ন্যায়রত্ন বিজয় দত্তের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্য সম্বন্ধে কি আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় কবিরাজ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি ন্যায়রত্নকে সেই ভাবে শয্যায় উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; কিন্তু এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিজ্ঞ কবিরাজ আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ইহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ন্যায়রত্নের শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিয়া তাঁহার ধমনীর বেগ পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

ন্যায়রত্ন কবিরাজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি দেখিলে কবিরাজ! আর কত বিলম্ব?"

কবিরাজ অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন; দীপনির্ব্বাণের আর অধিক বিলম্ব নাই—এ কথা তাহার মুখে উচ্চারিত হইল না; অথচ সত্য গোপন করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

ন্যায়রত্ন বোধ হয় তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি না বল, কিন্তু আমি বুঝিয়াছি আমার জীবনতরী ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে! হাঁ, কূলে ভিড়িয়াছে।"

কবিরাজ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "সত্যই যদি সেরূপ অবস্থা আসিয়া থাকে—তাহা হইলে—"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ন্যায়রত্ন কবিরাজের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আমার বাড়ীর পথ খুব নিকট। ঝটিকাসংক্ষুব্ধ উত্তালতরঙ্গময়ী বিশালকায়া নদী পার হইয়া তরণী কূলে আসিলে, অচিরে অদূরবর্ত্তী স্বগৃহে উপস্থিত হইতে পারিবে মনে করিয়া, প্রবাসীর মনে কিরূপ পরিতৃপ্তির সঞ্চার হয়, তাহা কখন অনুভব করিয়াছ কি? যদি কখন সেই তৃপ্তিসুখ অনুভব করিয়া থাক, তাহা হইলে আমারও মনের ভাব তুমি কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। আমার এই তৃপ্তি ও শান্তির যে টুকু বিঘ্ন ছিল, বিজয়ের অনুগ্রহে তাহা দূর হইয়াছে; এখন কেবল আনন্দ। আনন্দময়ের সান্নিধ্য যেন আমি সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতেছি!"

কবিরাজ প্রশংসমান-নেত্রে ন্যায়রত্নের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখুন ন্যায়রত্ন মহাশয়, চিকিৎসা-ব্যবসায়ে আমি নূতন ব্রতী নহি; এই ব্যবসায়েই আমি চুল পাকাইলাম! চিকিৎসা উপলক্ষে আমাকে অনেক রোগীরই মৃত্যুশয্যাপ্রান্তে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছে; অনেকের অন্তিম দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়াছি; কিন্তু মৃত্যুকালে ভয় বা দুশ্চিন্তায় কাতর হয় নাই, এরূপ লোক কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না!"

ন্যায়রত্ন ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সংসারে আসিয়া দীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন প্রকৃতির বহুলোকের সংস্রবে আসিয়াছি; তাহাদের রুচি, প্রবৃত্তি, সংস্কার ও বিশ্বাসেরও যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি; কিন্তু দেখিয়াছি অধিকাংশ লোকেরই ভগবানে আন্তরিক ভক্তি বা কায়মনোবাক্যে নির্ভর করিবার শক্তি নাই,

পরলোকেও বিশ্বাস নাই। অনেকে তাঁহাকে মানে, এবং বিপদরাশি যখন প্রলয়ের মেঘের মত তাহাদের মাথার উপর ঘনাইয়া আসিয়া তাহাদের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করে—তখন তাহারা তাঁহাকে ডাকে, প্রাণ ভরিয়াই ডাকে ;—কিন্তু সে কিরূপ ডাক ? আমরা নৌকা হইতে জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরিবার ভয়ে নৌকার মাঝির সাহায্যপ্রার্থনায় যে ভাবে তাহাকে ডাকি, ইহাও সেইরূপ ! কিন্তু পশুরাও ত বিপন্ন হইয়া উদ্ধারলাভের আশায় কাতরভাবে আর্তনাদ করে ; যাহাকে তাহারা রক্ষক বলিয়া বুঝিতে পারে—ব্যাকুল প্রাণে সকরুণ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে !—এই পশুধর্ম্মই কি ভগবানে ভক্তি ও নির্ভরতার নামান্তর ? আমরা মৃত্যুকালে আতঙ্কে ও উৎকণ্ঠায় অধীর হই কেন, জান ? একে ত আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবানে নির্ভর করিতে পারি না ; জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে শয়ন করিয়া শিশু যেমন নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত থাকে—বিশ্বজননীর ক্রোড়ও আমাদের পক্ষে সেইরূপ নিরাপদ ও শান্তিপ্রদ, ইহা আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারি না; তাহার উপর—আমাদের এই নশ্বর দেহ এখানে ফেলিয়া রাখিয়া একদিন চলিয়া যাইতে হইবে, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক পৃথিবীর সহিত এই ভৌতিক দেহের সকল সম্বন্ধ একদিন বিচ্ছিন্ন হইবে—একথাও আমরা চিন্তা করি না।—এই জন্য মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, কি একটা অঘটন ঘটিল ভাবিয়া আমরা ত্রাসে উদ্বেগে চারিদিকে অন্ধকার দেখি ! কোথায় যাইতেছি, না জানি সেখানে কি যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, এই চিন্তায় আমাদের

অন্তিমমুহূর্ত্ত অতীব কষ্টদায়ক হইয়া উঠে, তাহার উপরই দুশ্ছেদ্য মায়াপাশ! স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনবর্গের মায়া, দেহের মমতা, বিষয়সম্পত্তির আকর্ষণ আমাদিগকে বিব্রত করিয়া তোলে। সম্মুখে শত সহস্র সুখ সুবিধা, আশা, আনন্দ, ভোগ ও তৃপ্তির আধার এই লোকালোকপূর্ণ বসুন্ধরা; পশ্চাতে বিস্মৃতিতমসাচ্ছন্ন, অনিশ্চিত, অপরিচিত অজ্ঞাত মৃত্যু-পারাবার! কিন্তু যদি আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতাম যে, আমরা ভাল করি বা মন্দ করি, পাপ করি আর পুণ্যই করি—কর্ম্মফল ভোগের জন্য পরলোক আছে, তাহার প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ আমাদের সাধ্যাতীত,—তাহা হইলে আমাদের জীবন সুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত হইত; মৃত্যুকে শিয়রে উপস্থিত দেখিলে ভয়ের কোন কারণ থাকিত না। উহা ত জীবনের আবশ্যম্ভাবী অবস্থান্তর মাত্র। হাঁ, সত্যই পরলোকে লোকের আস্থা নাই; এই জন্য ধর্ম্ম অন্তরের সামগ্রী না হইয়া পোষাকে পরিণত হইয়াছে; অনেকের উহা জীবিকার অবলম্বন! অনেকেরই ইহা সাংসারিক প্রতিষ্ঠার জয়-পত্র। যে যত উচ্চৈঃস্বরে হরিনামে কীর্ত্তন করে, সমারোহে দুর্গোৎসব করে, ধর্ম্মের নামে গোড়ামীর পরাকাষ্ঠা দেখায়,—সে তত ধার্ম্মিক! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম বিশ্বাসের সামগ্রী, ইহা জীবনের অবলম্বন; এবং সংশয়সঙ্কুল সংসারসমুদ্রে মানবকে দিগ্‌ভ্রান্ত হইতে না দিয়া ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় ইহা যে মহাপারাবারের পরপারের সুনিশ্চিত গন্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করিতেছে—তাহারই নাম মৃত্যু।"

কবিরাজ জীবনোপান্তোপনীত বৃদ্ধের এই অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ

শ্রবণ করিয়া মোহিত হইলেন ; মুগ্ধহৃদয়ে বলিলেন, "কিন্তু ঠাকুর, এই সংসারে আপনার ন্যায় ধর্ম্মবিশ্বাস কয়জনের আছে ?

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "না, না, ওকথা বলিও না। আমি ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই বুঝি না ; অতি অকিঞ্চন, অজ্ঞান আমি ! যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস যুগ যুগ ধরিয়া আর্য্য ঋষি ও তপস্বিগণের এই সুপবিত্র তপোবনকে অধর্ম্মের মহাপ্লাবন হইতে রক্ষা করিয়াছে—সেই বিশ্বাসের যদি কণামাত্র লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এ জীবন সফল মনে করিতাম ; কিন্তু আমি সেরূপ সুকৃতি কোথায় পাইব ? আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝিও না। আমি আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া যে কর্ম্ম করিতে গিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিতে না পারিয়া, হে ভগবান ! তোমারই নিকট শক্তি ভিক্ষা করিয়াছি, এবং তোমার নাম করিয়া, তোমার শরণাপন্ন হইয়া আরব্ধ কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু অনাদিকাল-সঞ্চিত সংস্কার আসিয়া পদে পদে আমাকে বাধা দিয়াছে ! বিষয়বাসনা ও ভোগলালসা অজ্ঞাতসারে আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াছে। আমি সেই ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য কতবার আত্মবিস্মৃত হইয়াছি। এই বিষয়বাসনাই আমাদের সকল দুঃখের মূল। স্পৃহা হইতে অভিনব স্পৃহার উৎপত্তি, তাহাই প্রবৃত্তির উৎসধারা প্রবল করিয়া তোলে ; কিন্তু এই ভোগ-বিলাসের পরিণাম কি ? কেবল অশান্তি ভিন্ন তাহাতে আর কি লাভ হয় ? আর আমাদের কয়টি ইচ্ছাই বা ফলবতী হয় ? বাসনা পূর্ণ না হইলে দুঃখ, আবার বাসনার অনুরূপ

ফললাভ করিয়া তাহা রক্ষা করিতে না পারিলে, তাহাতেও অনিত্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় বাসনার তীব্র জালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া যখন বুঝিয়াছিলাম বাসনার ক্ষয় ব্যতীত মানসিক সন্তোষ ও শান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন হইতেই আমি সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া 'ভগবান তুমি যা' কর, তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাতেই কি শান্তিলাভ করিয়াছি? সে পথেও নিত্য কত বাধা, কত বিঘ্ন আমার শান্তি নষ্ট করিয়াছে! আমাকে রোগে শোকে কত কষ্টই না পাইতে হইয়াছে। আমার মাথার উপর দিয়া যত বিপদের ঝড় বহিয়া গিয়াছে—তত বিপদ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। রোগের যন্ত্রণায়, শোকের তাড়নায়, নূতন নূতন বিপদের আক্রমণে আমি অভিভূত হইয়া পড়িতাম; কুমতি সেই সুযোগে আমার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিত; আমাকে বুঝাইতে চাহিত—এ সকল ভগবানের নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক; এতদূর নিষ্ঠুর যিনি, তাঁহাকে কি ভক্তি বিশ্বাস করিতে আছে? তাঁহার শরণাগত হইয়া লাভ কি? যে সকল কারণে মানুষ সংশয়বাদী, অবিশ্বাসী ও ভগবানে ভক্তিহীন হয়—আমার জীবনে কখন তাহার অভাব হয় নাই। কিন্তু এই অকৃতি অধম সন্তানের প্রতি তাঁহার করুণার সীমা নাই! তাঁহার কৃপায় আমি আমার চরিত্রের দুর্ব্বলতা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তিনি যাহা করেন,—তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন; তিনি কি গূঢ় উদ্দেশ্যে আমাদিগকে নিয়ত

কঠোর পরীক্ষার অনলে নিক্ষেপ করেন—ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব আমরা তাহা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব ?—এইরূপ চিন্তা করিয়া হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিতাম। তাঁহার অপার করুণাবলে সকল বিপদে তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়াছি ; কঠোর পরীক্ষানলে অঙ্গারের ন্যায় নিয়ত দগ্ধ হইয়াও দুর্গতিহারিণী বিপত্তারিণী মা জগদম্বাকে মনে প্রাণে ডাকিয়াছি ; বিপদ্ভঞ্জন হরি, সর্ব্বসন্তাপহারী শ্রীমধুসূদনের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমার প্রতি ভগবানের যে কত দয়া, তাহা সেই সময়েই স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম। তাঁহারই কৃপাকটাক্ষে নিত্য নূতন বিপদের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াও ভস্মে পরিণত হই নাই ; সকল কুপ্রবৃত্তিকে জয় করিয়া—আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত করিয়াছি। এতদিনে পরলোক হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে, আমি এখন সুখে ও শান্তিতে এই জীর্ণ দেহের বোঝা নামাইয়া রাখিয়া তাঁহারই আদেশ পালন করিতে যাইতেছি। ইহা কি আমার অল্প সৌভাগ্যের কথা ? সৌভাগ্য কি ভয়ের বিষয় কবিরাজ !”

কবিরাজ বলিলেন, “পরলোকে আপনার প্রগাঢ় বিশ্বাস ; কিন্তু ইহা কি সংস্কারমাত্র নহে ? পরলোক সত্যই যদি থাকে—তাহা হইলে তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না কেন ? প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন দুগ্ধপোষ্য শিশুও কোন কথা বিশ্বাস করিতে চাহে না।”

ন্যায়রত্ন ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, “দুগ্ধপোষ্য শিশু চাক্ষুষ প্রমাণ ভিন্ন যাহা বিশ্বাস করে না, চাক্ষুষ প্রমাণ নাই বলিয়া তুমিও

তাহা অবিশ্বাস করিবে? জড়বাদী নাস্তিকের ন্যায় পরলোক নাই বলিয়া উড়াইয়া দিবে? আমরা যাহা চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ না করিব—তাহারই অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে হইলে জগতের অনেক ধ্রুবসত্যই অবিশ্বাস করিতে হয়! আত্মা তুমি দেখিতে পাও না; তবে কি বলিবে আমাদের দেহে আত্মার অস্তিত্ব নাই? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইব! একমুষ্টি ভস্মই কি দুর্লভ মানবজীবনের একমাত্র পরিণাম?"

কবিরাজ বলিলেন, "অনেকেরই এইরূপ বিশ্বাস।"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "অত্যন্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস। পৃথিবীতে কিছুই ধ্বংস হয় না, কেবল রূপান্তর প্রাপ্ত হয় মাত্র। মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইলেও দেহে যে চৈতন্যস্বরূপ নিত্যপদার্থ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার ধ্বংস নাই। রাত্রি না থাকিলে যেমন দিন হইত না, সেইরূপ পরলোক ভিন্ন ইহলোকের অস্তিত্বও সম্ভব হইত না। অন্য যুক্তি তর্কে আবশ্যক কি? শ্রীভগবান্‌ই স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥" (২২)

তোমার ন্যায় সংস্কৃতভাষাবিৎ পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।—আত্মা এই জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নব কলেবর ধারণ করিবে। জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ দেহ অবশ্য-পরিত্যাজ্য।"

কবিরাজ বলিলেন, "কিন্তু জীর্ণ বস্ত্রে ও জীর্ণদেহে আকাশ

পাতাল প্রভেদ। একটির পরিবর্ত্তন আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, অপরটীর পরিবর্ত্তনের কর্ত্তা আমরা নহি। কিন্তু সে সকল তর্ক এখন থাক ; আমার কেবল এই কথা জানিবার আগ্রহ হইতেছে যে, আজীবনের সুখদুঃখের আধার, চিরজীবনের শিক্ষা ও সাধানার ক্ষেত্র এই দেহ—হউক জীর্ণ, তথাপি ইহা ত্যাগ করিতে আপনার মনে কি দুঃখকষ্ট বা ক্ষোভ উপস্থিত হইবে না? জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগের ন্যায় আপনি ইহা অবিচলিতচিত্তে ত্যাগ করিতে পারিবেন?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র ধারণ করিতে কি তোমার মন বিচলিত হয়? এই পরিবর্ত্তনে দুঃখের কোন কারণ আছে কি?"

কবিরাজ বলিলেন, "এই তুলনা কতদূর সঙ্গত বুঝিতে পারিতেছি না। জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে সকলেরই আগ্রহ হয় বটে, কিন্তু দেহ জরাজীর্ণ ও দুর্ব্বল হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে কাহারও আগ্রহ হয়—একথা পূর্ব্বে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না ; তবে রোগে শোকে মানুষ মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা পাইলে মৃত্যু প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু সেই প্রার্থনা আন্তরিক কি না সন্দেহ।"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "সে কথা সত্য। দেহী মাত্রেরই দেহের প্রতি আন্তরিক একটা মমতা আছে ; বরং যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধেরই এই মমতা অধিক। প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে না পারায় মরণোন্মুখ বৃদ্ধেরও সংসারের প্রতি আসক্তি-মমতা এতই

অধিক হইয়া থাকে যে, যুবকদেরও ততখানি দেখা যায় না! শমনকে শিয়রে দণ্ডায়মান দেখিয়াও অশীতিপর পলিতকেশ বৃদ্ধ এক কাঠা জমীর জন্য জ্ঞাতির সহিত বিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হয় না! আমার এই দেহখানিকে যথেষ্ট ভালবাসি বলিয়াই ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু এই জীর্ণ কুটীরের চালের খড় পচিয়া গিয়াছে—খুঁটিগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পতনোন্মুখ হইয়াছে, আর তালি চলে না; ইহা সংস্কারের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। পরলোকে গিয়া কেবল যে নূতন দেহ পাইব এরূপ নহে, আমার যে সকল পরমাত্মীয় পূর্ব্বেই আমাকে ত্যাগ করিয়া সেই পথের পথিক হইয়াছেন, তাঁহাদের দেখা পাইব। তাঁহাদের সহিত আমার পুনর্ম্মিলন হইবে!"

ন্যায়রত্নের মুখমণ্ডল সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাঁহার কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষু উজ্জ্বল হইল; সঙ্গে সঙ্গে দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার নয়নকোণে লক্ষিত হইল। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল—তাহা আনন্দাশ্রু। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সুমতিকে ডাকিলেন; সুমতি তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলে তিনি দক্ষিণ হস্ত তাহার মস্তকে রাখিয়া হাত বুলাইয়া বলিলেন, "মা, তোমাকে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা সমস্তই বলিয়াছি। ভবিষ্যতে তোমাকে যেভাবে চলিতে হইবে, তাহাও তুমি শুনিয়াছ। আমার দেহান্তে তুমি আমার উপদেশ অনুসারে চলিবে। তোমাকে যে গীতাখানি দিয়াছি, তাহা দু'সন্ধ্যা পাঠ করিবে, গীতার উপদেশেই তোমার জীবন পরিচালিত

করিবে। তালুকদার বিজয় দত্ত নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন; অনুশোচনায় উঁহার হৃদয় পবিত্র হইয়াছে; উনি তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উঁহার এই অঙ্গীকার মৌখিক নহে, তুমি কুণ্ঠা ত্যাগ করিয়া উঁহার সহিত হরিরামপুরে ফিরিয়া যাইবে; উঁহারই আশ্রয়ে বাস করিবে। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার অবশিষ্ট জীবন শান্তিতেই কাটিবে।"

সুমতি কোন কথা বলিতে পারিল না। দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইয়া তাহার অঞ্চল সিক্ত করিল।

ন্যায়রত্ন চক্ষু মুদিত করিয়া অনেক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার ইষ্ট মন্ত্র জপ করিলেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে হরি, হে পতিতপাবন মধুসূদন! এ জীবনে জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞতাবশতঃ কত অপরাধ করিয়াছি, তাহা মার্জ্জনা করিয়া তোমার অভয় চরণে আমাকে স্থান দাও; সুমতি যেন তোমার আশ্রয়ে বঞ্চিত না হয়, তাহাকে তুমি সর্ব্বদা রক্ষা করিও। তোমার শ্রীচরণে যেন তাহার মতি স্থির থাকে।"

ন্যায়রত্ন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, বলরাম, তাহার স্ত্রী-পুত্রেরা এবং গ্রামের অনেক লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে।

ন্যায়রত্ন কবিরাজের হাত দুইখানি উভয় হস্তে ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমাকে পাইয়া আমার জীবনের কয়দিন বড় আনন্দেই কাটাইয়াছি। তুমি আমার জীবন রক্ষা করিবার জন্য

যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছ, সেবা-শুশ্রূষারও ত্রুটি কর নাই ; তুমি আমার জন্য যাহা করিয়াছ—পিতার বা পিতৃকল্প জ্যেষ্ঠ সহোদরের জন্য কেহ তাহার অধিক করিতে পারে না। তোমার ঋণ পরিশোধ আমার সাধ্যাতীত ; আর বলরাম, উহার গুণের কথা আর কি বলিব ? বলরাম আমার জীবনদাতা ; পূর্ব্বজন্মে বলরাম বোধ হয় আমার কোন পরমাত্মীয় ছিল—"

ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া বলরাম হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, সে ললাটে করাঘাত করিয়া কাতরস্বরে বলিল, "বাবাঠাকুর, সত্তি তুমি আমাদের ছেড়ে যাবা ! এত করেও তোমাকে বাঁচাতে পাল্লাম না, বাবাঠাকুর ! তুমি যে আমাদের গাঁয়ের দেবতা, বাবাঠকুর, তোমাকে ছেড়ে আমরা কি নিয়ে থাক্‌বো ? আমাদের ছুরাদেষ্ট না হলে কি তোমাকে হারাই বাবাঠাকুর !"

বলরাম তাঁহার পদপ্রান্তে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল ; ন্যায়রত্ন মিষ্টবাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন ; তাহাকে এবং গ্রামস্থ নরনারীগণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলেরই চক্ষু অশ্রুময়, সকলেরই হৃদয় হাহাকারে পূর্ণ।

ন্যায়রত্ন কবিরাজের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আমাকে আঙ্গিনায় লইয়া গিয়া তুলসীমঞ্চের নিকট শয়ন করাও, ভাই !"

কবিরাজ ন্যায়রত্নের হাত ধরিয়া দেখিলেন, তাঁহার ধমনীর গতি রোধ হইয়াছে ! ন্যায়রত্নকে তিনি ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা

করিলে ন্যায়রত্ন মাথা নাড়িয়া নিষেধ করিলেন; স্বয়ং তাঁহার স্কন্ধে ভর দিয়া ও সুমতির বাহু অবলম্বন করিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন, এবং তুলসীমঞ্চের সম্মুখে আসিয়া শয়ন করিলেন, মস্তকটি তুলসী তলায় রাখিলেন।

ন্যায়রত্ন চক্ষু মুদিয়া মনশ্চক্ষে দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী কল্যাণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; কিন্তু কল্যাণী একা নহেন, আরও কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে আছেন। তাঁহাদের দেহ জ্যোতির্ম্ময়, সে জ্যোতিঃ স্বর্গীয়! ন্যায়রত্নের মুখ প্রফুল্ল হইল। সেই পবিত্রহৃদয়, সংযতমনা সাধু পুরুষের তখন অতীন্দ্রিয় দর্শন ও শ্রবণশক্তি বিকশিত হইয়াছিল।

ন্যায়রত্ন মুদিতনেত্রে অস্ফুটস্বরে তাঁহার পরলোকগতা পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতে লাগিলেন; যেন সেই সাধ্বীর প্রেতাত্মার নিকট হইতে তিনিও অনেক কথা শুনিতেছিলেন। তখন অনেক লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল; তাহাদের ধারণা হইল, মরণাহত ন্যায়রত্ন প্রলাপ বকিতেছেন! ন্যায়রত্নের কথাগুলি যে প্রলাপ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে,—এ সম্ভাবনা তাহাদের মনে স্থান পাইল না।

কিছুকাল পরে ন্যায়রত্ন চক্ষু মেলিয়া সম্মুখে চাহিলেন, তিনি সমাগত গ্রামবাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ উত্তোলন-পূর্ব্বক ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "তোমরা সকলে একবার হরি বল।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে জড়তার লেশমাত্র ছিল না! তাঁহার আদেশে সকলে সমস্বরে বলিল, "হরি বোল, হরি বোল!"—

হরিধ্বনিতে ন্যায়রত্নের গৃহ-প্রাঙ্গণ পুনঃপুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, ন্যায়রত্ন সেই স্বরে স্বর মিলাইয়া প্রেমোদ্বেলিত-স্বরে বলিলেন,—হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল !”

হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার উভয় নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল ; কবিরাজ তাঁহার মুখের উপর মস্তক অবনত করিয়া আবেগভরে বলিলেন,—“হরে মুরারে মধুকৈটভারে !”

তারকব্রহ্ম নাম শ্রবণ করিতে করিতে ন্যায়রত্নের জীবাত্মা নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে প্রস্থান করিল। সুমতি তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, “বাবা গো বাবা ! আমাকে ফেলে রেখে তুমি তোমার কোন্ বাড়ীতে চলে গেলে ?”

(উপসংহার)

ন্যায়রত্নের মৃতদেহ নদীতীরে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য বিজয় দত্ত ব্রাহ্মণের সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই পল্লীতে একঘর ব্রাহ্মণেরও বাস ছিল না। তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-সংগ্রহে বিফলমনোরথ দেখিয়া কবিরাজ বলিলেন, তাঁহাদের গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ আছেন, চেষ্টা করিলে এই বিপদে তাঁহাদের সহায়তা লাভ করা যাইতে পারে। বিজয় দত্ত তৎক্ষণাৎ কবিরাজের সঙ্গে কয়েকজন লোক পাঠাইলেন। কবিরাজের চেষ্টায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ সংগৃহীত হইল! তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া এক প্রহরের মধ্যে ন্যায়রত্নের গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা গঙ্গাতীরে ন্যায়রত্নের মৃতদেহ বহিয়া লইয়া চলিল; গ্রামের সমস্ত লোক খোল বাজাইয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাদের অনুসরণ করিল। বিজয় দত্ত নগ্নপদে একবস্ত্রে সর্ব্বাগ্রে চলিলেন,—যেন তিনি নদী-জলে দেবমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছেন!

মৃতদেহের সৎকারের পর সুমতি তাহার পিতার দেহভস্ম ও একখণ্ড অস্থি মাথায় করিয়া গৃহে ফিরিল, এবং বিজয় দত্তের সহিত নৌকাযোগে হরিরামপুরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাহাদের গৃহপ্রাঙ্গনে সেই চিতাভস্ম ও অস্থি সমাহিত করিল। তালুকদার যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া অতি অল্পদিনেই সেই স্থানে একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

সুমতি এই সমাধিমন্দিরটী দেবমন্দির অপেক্ষাও পবিত্র মনে করিত। বিজয় দত্ত তাঁহার অঙ্গীকার বিস্মৃত হন নাই, তিনি সুমতিকে কন্যার ন্যায় পরম যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সত্যবালার স্নেহে, আদরে তাহার হৃদয়-বেদনার লাঘব হইল; স্নেহময়ী সখীর সাহচর্য্যে তাহার জীবনের দিনগুলি শান্তিতেই কাটিতে লাগিল; সত্যবালা সধবা হইয়াও যে পতিবিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতেছে—এই দুঃখই সুমতিকে মধ্যে মধ্যে কাতর করিয়া তুলিত।

সুমতি প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া—তাহার পিতার সমাধিমন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগ ও বহির্ভাগ সযত্নে ধৌত করিত, এবং তাহা মুছিয়া তালুকদারের বাগানের প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি দ্বারা সুসজ্জিত করিত। মধ্যাহ্নে স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া ভোগের মত তাহা মন্দিরমধ্যে সাজাইয়া রাখিত, এবং ভক্ত যেমন ভক্তিভরে গৃহদেবতাকে ভোগ নিবেদন করে—সে সেইভাবেই তাহা তাহার পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিত। সন্ধ্যার সময় সে সেই মন্দিরে দীপ জ্বালিয়া ধূপ দিত। ধূপের সৌরভে মন্দির পরিপূর্ণ হইত।

নবাব বাহাদুর ন্যায়রত্নকে একশত বিঘা জমি পুরস্কার দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; ন্যায়রত্নের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াও তিনি তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করেন নাই। তালুকদার বিজয় দত্তের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে সেই জমি হইতে যথেষ্ট আয় হইত। সেই অর্থে প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিন

দীনদুঃখী ও অন্ধ আতুরগণকে মন্দিরপ্রাঙ্গণে সমবেত করিয়া অন্ন বস্ত্র দানে পরিতৃপ্ত করা হইত। সুমতি পিতার নামে তাহা স্বহস্তে বিতরণ করিত; এবং সে প্রত্যহ প্রত্যুষে ও শয়নকালে একখানি কুশাসনে এই মন্দিরমধ্যে উপবেশন করিয়া পবিত্র মনে গীতা পাঠ করিত; পাঠ সাঙ্গ হইলে, সে গীতাখানি বন্ধ করিয়া পিতার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভক্তিভরে বলিত—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥"

হায় মা বঙ্গভূমি! এমন পিতা, এমন কন্যা আর কি এ যুগে তোমার ক্রোড়ে দেখিতে পাইব?

সমাপ্ত।